সন্ধ্যামণি

শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক
সম্পাদিত





এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৫

মূল্য টা. ৫.৫০ ন. প মাত্র

প্রচ্ছদপট
অরূপ গুহঠাকুরতা

মুদ্রাকর
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড আর্ট প্রেস
২৫বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা-১২

দিল্লীপ্রবাসী কবিবন্ধু

শ্রীযুক্ত উমানাথ ভট্টাচার্য

সুহৃদ্‌বরেষু

অকূল আকাশে অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে,
পরাণ ভরিছে ত্রাসে।
নিষ্প্রভ আঁখি নিখিলে নিরখে কালী,
মন রে আমার সাজা তুই বৈকালী—
সন্ধ্যামণির ডালি।

সত্যেন্দ্রনাথ

সম্পাদকের নিবেদন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় মহাশয়ের কাব্যসংকলন-গ্রন্থ 'সন্ধ্যামণি' প্রকাশিত হ'ল। এতে কবির কাব্যজীবনের দুই পর্যায়ের কবিতা স্থান পেয়েছে —১৯১১ থেকে ১৯৫০ সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের মধ্যে রচিত যে-সকল রচনা তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে উপনিবদ্ধ আছে, সে-সকলের একটি সুনির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন এই গ্রন্থের পূর্বভাগ। উত্তরভাগে আছে ১৯৫১ সন থেকে এ যাবৎ রচিত, কিন্তু গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতার একটি বাছাই-করা সংগ্রহ। তার অর্থ, কিঞ্চিন্ন্যূন অর্ধ-শতাব্দীতে বিকীর্ণ এক বিশিষ্ট কবির ভাবজীবনকে এই গ্রন্থে পরিচায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কবির আরও দুটি সংকলনগ্রন্থ আছে—'আহরণ' ও 'আহরণী'। কিন্তু এই গ্রন্থে সে দুটি থেকে তিন-চারিটির বেশী কবিতা গ্রহণ করা হয় নি। 'সন্ধ্যামণি' সম্পূর্ণই একটি নূতন এবং পূর্ণাঙ্গ সংকলন। কবিশেখরকে পূর্বাপর অবিচ্ছিন্ন ভাবে জানতে ও অখণ্ডভাবে বুঝতে হলে এই 'সন্ধ্যামণি' গ্রন্থখানি অপরিহার্য ব'লে মনে করি।

'আহরণে'র মত এই গ্রন্থে কবিতাগুলিকে বিষয়ওয়ারী Group বেঁধে সাজানো হয় নি ; বিষয়গত বিন্যাসের দায়িত্ব পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে কবিতা-গুলিকে এখানে মোটামুটি কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো হ'ল। রসান্বেষী পাঠক নিজেই কবিতার শ্রেণী ও প্রকৃতি নির্ধারণ করুন; আমরা এখানে শুধু কবিজীবনের ঐতিহাসিক ক্রমটির নির্দেশ দিলাম।

এই ক্রম ১৯১১ সনে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'ভারত-বন্দনা' থেকে শুরু ক'রে অধুনারচিত 'বিজ্ঞানের বল' কবিতা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন আছে, তারপর শেষাংশে পরম্পরায় কিছু এদিক-ওদিক হয়ে থাকবে। মোট কথা, 'সন্ধ্যামণি' কবির মানসজীবনের বিবর্তন ও বিকাশের একটি নির্ভরযোগ্য দিঙ্‌নির্দেশক ; ঐতিহাসিকতার দিক্ থেকে এই গ্রন্থটির মূল্য সবিশেষ।

কবিশেখর আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ একাগ্র নিষ্ঠায় অনলস ভাবে কাব্য-সরস্বতীর সাধনা ক'রে আসছেন। আমরা যখন ভূমিষ্ঠ হই নি, তখন থেকেই তিনি কাব্যচর্চায় নিয়োজিত আছেন এবং অদ্যাবধি তাঁর এই নিষ্ঠা

অক্ষুণ্ণ আছে। মনে পড়ে আমাদের যখন কৈশোর-কাল, আমরা যখন স্কুলের ছাত্র, তখনও তাঁর কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং এখনও তাঁর কবিতা আমাদের সমান আনন্দ দিয়ে চলেছে। এই সর্বব্যাপী শৈথিল্য ও সারস্বত তপস্যার বিরলতার দেশে এই ঐকান্তিক সাধন-প্রযত্ন একটি মহৎ দৃষ্টান্ত; কাব্যধর্মকে কত প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে এমনতর নিষ্ঠায় দীর্ঘকাল যাবৎ অচলপ্রতিষ্ঠ থাকা যায়, তা সহজেই অনুমেয়। আজ কবিশেখর বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর সাধনার আবেগ বা বেগ এতটুকুও মন্দীভূত হয় নি।

কবিশেখরের কবি-মানস অনুধাবন করতে গিয়ে আমরা আমাদের বয়সের ইঙ্গিত করেছি। এর একটি তাৎপর্য আছে। আজকালকার বাংলা কাব্য-আলোচনায় দেখতে পাই, অগ্রজ কবিদের কাব্যসাধনার সমৃদ্ধ ফলশ্রুতিকে অস্বীকার করবার একটা প্রবণতা যেন অধিকাংশ আলোচনাকেই আবিষ্ট করে রেখেছে। এটি খুবই বেদনাদায়ক ব্যাপার। বয়সে অপ্রবীণ ও সমসাময়িক সহযোগীদের মত এ যুগের বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণা ও জীবনাদর্শের আবেষ্টনীর মধ্যে বর্ধিত হলেও অগ্রজদের সাহিত্যসৃষ্টিকে আমরা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখেই দেখি। আমাদের মত যাঁরা বয়ঃক্রমের বিচারে নবীন ও প্রবীণের মধ্যে সেতুস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা বোধ হয় কাব্যাদর্শের দুই বিপরীত প্রান্তীয় অভিজ্ঞতার মধ্যবর্তী থেকে এক-জাতীয় মানসিক ভারসাম্যের অধিকারী। নবীনের প্রতি যেমন তাঁদের বিমুখতা নেই, তেমনি প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধেও তাঁদের কার্পণ্য নেই। কবিশেখরের কাব্য-কৃতিকে অবলম্বন ক'রে আমরা এখানে আমাদের সেই শ্রদ্ধাকে চিহ্নিত করতে চাই। বাংলা দেশের অসংখ্য পাঠক তাঁর কবিতা পড়ে বিমল আনন্দ লাভ করেছেন, এখনও লাভ করছেন, এবং সেই পাঠকশ্রেণীর মধ্যে সকলেই যে প্রবীণবয়সী বা প্রাচীনপন্থী এমন মনে করবার আদৌ কোন হেতু নেই।

কবিহিসাবে কবিশেখর কেন একালের কাব্যামোদী পাঠকের বিশেষ মনোযোগ দাবি করতে পারেন সেটি একটু বিশ্লেষণসাপেক্ষ। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যসাহিত্যে ক্লাসিকাল ধারার অনুবর্তী হয়ে কাব্যসাধনার উদাহরণ অতি বিরল। যে স্বল্পসংখ্যক কবি তাঁদের রচনায় এই ধ্রুপদী ধারাটিকে অব্যভিচারী ভাবে আঁকড়ে ছিলেন বা আছেন, কবিশেখরকে তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি

বলা যায়। তিনি যেন উনবিংশ-শতকীয় ধ্রুপদী কবিদের উত্তরসাধনার স্রোতোধারার পথ বেয়ে আধুনিক বাংলা কাব্য-সংসারে তাঁদের কাব্যাদর্শটিকেই পাঠক-মনে অভিনব ভঙ্গীতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করেছেন। এই পথে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এঁরা কাব্যে অস্পষ্টতা ও আকার-হীনতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বিশেষতঃ মোহিতলাল কাব্যে উদাত্তগম্ভীর সুসংহত ও সংযমনিয়ন্ত্রিত প্রকাশভঙ্গিমার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন।

কবিশেখরও এই একই পথের পথিক। তিনি শব্দনির্বাচনে ও পদপ্রয়োগে সংস্কৃত কাব্যসুলভ ধ্বনিময়তার পক্ষপাতী হয়েও পরিচ্ছন্ন প্রকাশের রীতিকে কোথাও বর্জন করেন নি। তাঁর কবিতার আঙ্গিক সুসংহত ও স্বচ্ছন্দ, শব্দনির্বাচন সচেতন মননের পরিচায়ক। তাঁর রচনার শব্দসম্ভার ও পদবিন্যাস অনুধাবন করলেই বোঝা যায়, কবির মন বিশেষভাবে সুকর্ষিত ও বৈদগ্ধ্য-শাসিত। সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিদের কাব্য-ধারার ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই কবিকে আমাদের কবিকুলের মধ্যে যথার্থই একজন সুপণ্ডিত কবিতে পরিণত করেছে। কবিত্ব-বিবর্জিত পাণ্ডিত্য অবশ্য কাব্যক্ষেত্রে কিছু নয়, কিন্তু যেখানে খাঁটি কাব্যানুভূতির সঙ্গে পাণ্ডিত্য বা বৈদগ্ধ্যের পরিণয় ঘটেছে, সেখানে এই সমন্বয়কে একটি উচ্চ পর্যায়ের কৃতিত্ব ব'লে অভিনন্দন জানাতেই হয়।

কবিশেখরের কবিতার মধ্যে এই শ্রেণীর সমন্বয়ের সার্থক দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। বিমূর্ত আকারহীনতার চেয়ে সুস্পষ্ট অর্থব্যক্তিযুক্ত ও সুচিহ্নিত অবয়ববিশিষ্ট রূপ ও ভাবের প্রকাশ অনেকগুণে স্পৃহণীয়। এতে অন্যান্য গুণের আস্বাদনের তারতম্য যা-ই ঘটুক, ওই সুনির্দিষ্ট আকৃতির কবিতায় যে যাথাযথ্য ও শৃঙ্খলাবোধের দ্যোতনা বর্তমান, তার মূল্য প্রভূত। প্রত্যেক কাব্যপাঠকের ব্যক্তিত্বের ভিতর একটি সহজাত শৃঙ্খলানিষ্ঠ মন থাকে, ওই মন অসংবদ্ধতার দ্বারা, শিথিলবদ্ধতার দ্বারা প্রতি পদে পীড়িত হয়। অর্থের বিভ্রান্তিতে ওই মনের সহজ রসগ্রহণের ক্ষমতা বিপর্যস্ত হয়। কবিতারও যে নিজস্ব logic আছে, কবিতায় সেই logic-এর সন্ধান পেলে শৃঙ্খলানিষ্ঠ মন পরিতৃপ্ত হয়।

কবিশেখরের কবিতায় কাব্যপাঠকের যাথাযথ্যবোধের পরিতৃপ্তির একটা

বিপুল আশ্বাস রয়েছে বলে তা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই যাথাযথ্য অবশ্য কাব্যেরই যাথাযথ্য, গদ্যের নয়। কিন্তু এইটেই তাঁর কাব্যশিল্পের একমাত্র পরিচয় নয়। তা যদি হ'ত তা হলে অন্যান্য দশজন verse-maker-এর মত তাঁকে নিছক verse-maker আখ্যা দেওয়া যেত। কিন্তু এ-রকম ভাসা-ভাসা বিশ্লেষণের দ্বারা আর যাই হোক, কাব্যবিচার চলে না। এ-জাতীয় বিশ্লেষণের মধ্যে পল্লবগ্রাহিতারই শুধু পরিচয় মেলে, যথার্থ কাব্যবোধের নিশানা কিছু মেলে না।

যাঁরা কবিশেখরের কাব্যসৃষ্টিকে ওই দিক্ থেকে বিচার করবার চেষ্টা করেন, তাঁরা শুধু তাঁর বহিরঙ্গীয় কাব্যবৈশিষ্ট্যের উপরই তাঁদের অনিশ্চিত কম্পিত হস্ত রক্ষা করেন, তাঁরা তাঁর কাব্যের অন্তরে প্রবেশ করতে পারেন না। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, কবিশেখর তাঁর কাব্যে শুধু আঙ্গিকের সুছাঁদ বিন্যাস আর ভাবের পরিচ্ছন্ন প্রকাশের উপরই তাঁর সকল মনোযোগ নিঃশেষ করেন নি; সেই সঙ্গে তাঁর কাব্যের একটি বিশিষ্ট ভাব-পরিমণ্ডলও রয়েছে। এই পরিমণ্ডলের মধ্যে সশ্রদ্ধ অন্তরে বিনীতবেশে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাব, কবি বাংলা দেশের খাঁটি জলহাওয়া, আকাশ, মাটীর স্বাদগন্ধে তাঁর কাব্যকে উপাদেয় ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর কবিতায় যে স্নিগ্ধ-কমনীয় বৈষ্ণবভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটেছে তার মূল্যও বড় কম নয়। একই কালে তিনি তাঁর একাধিক কবিতায় প্রাচীন ভারত ও তার অতীত সংস্কৃতির একটি স্বপ্নমোহময় রূপ ("দৃষ্টি মোর তৃপ্তি খোঁজে অতীতের ছায়াচ্ছন্ন পথে"—'অতীত') একালের নানাবিধ অসার চাকচিক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত আধুনিক পাঠকের মনশ্চক্ষুর সামনে প্রকট ক'রে তুলেছেন। হ'তে পারে তাঁর কবিতায় গৃহগতপ্রাণতার (nostalgia) সুর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মাত্রায় ধ্বনিত হয়েছে, কিংবা তাঁর কাব্যকল্পনা অতীতাশ্রয়ী মনোভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে আছে, কিন্তু সেই গৃহগতপ্রাণতা ও অতীতাশ্রয়িতা এই সর্বপ্রকার মূল্যবোধের বিপর্যয়ের যুগের ধ্যান-ধারণা অপেক্ষা কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে অপকৃষ্ট কোন্ যুক্তিতে, কোন্ মাপকাঠির নিরিখে? এর ভিতর অব্যাহতিবাদ নেই, আছে শ্রেষ্ঠতর মূল্যবোধের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল চিত্তের গভীর প্রত্যয়ের দ্যোতনা। গৃহের শান্তিকে একপাশে সরিয়ে রেখে হাটের মাঝখানে বাসা বেঁধে, অতীতের মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে এ-যুগের

অসার ধ্যান-ধারণার ভজনা ক'রে আমরা কোন্ চতুর্বর্গ ফল লাভ করেছি? কবিশেখরের কবিতায় ফেলে-আসা অতীত, ভুলে-যাওয়া সংস্কৃতি, ছেড়ে-আসা গ্রামের জন্য যে বেদনাকরুণ দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই, তার মধ্যে একটা শূন্যতার হাহাকার মিশে আছে। আধুনিক নাগরিক জীবনের সর্ববিধ কৃত্রিমতা, ছলাকলা, হৃদয়হীনতা ও ক্রূরতা কবির মনে এই শূন্যতার আর্তি সৃষ্টি করেছে। নিছক বহিরঙ্গবিচারের মাপকাঠি দিয়ে এই শূন্যতার পরিমাপ করা যায় না, তার জন্য স্বয়ং কবি হয়ে কবির অন্তরে প্রবেশ করতে হয়।

কবি তাঁর শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে রচিত 'মাটি' কবিতায় আক্ষেপ করেছেন—

"কবিতারও সাথে আজ নাই মাটি-মা-টির সংযোগ।"

আধুনিক কাব্য-সংসারে চির-চেনা বাংলা দেশের একজন খাঁটি কবি-প্রতিনিধির পক্ষে এই আক্ষেপ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। স্মৃতি দিয়ে ঘেরা প্রাচীন বাংলার একটা রসময় রূপ কবির কাব্যদর্পণে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। এই রূপ যেমন সুন্দর, তেমনি প্রাণের শক্তিবর্ধক। একমাত্র কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের কবিতা ছাড়া একালের কাব্যে আর কোথাও মৃন্ময়ী বাংলা মায়ের এমন নিখুঁত চিত্র চোখে পড়ে না। পল্লীজীবন ও পল্লীপ্রকৃতি আমাদের চিরপরিচিত, তাই মনে হয় পল্লীকবিতাও বুঝি সেকেলে ও মামুলী। কিন্তু এই দুই কবির আগে আসল পল্লীকবিতা কি রচিত হয়েছে? এই দুই বর্ষীয়ান্ কবিই বাংলা দেশের পল্লীপ্রকৃতির শ্যামল শষ্পাস্তীর্ণ পল্লবঘন বিহগকূজিত মোহন রূপটিকে তাঁদের রচনায় ধ'রে রেখেছেন, যেমন ধ'রে রেখেছেন গদ্যে বিভূতিভূষণ তাঁর 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের মধ্যে। অগণ্য স্মৃতির সুষমায় মণ্ডিত খাঁটী গ্রামীণ বাংলার স্বপ্নময় অনবদ্য রূপটিকে ধ্যান করতে হ'লে এই তিন জনের রচনার আশ্রয় লওয়া ব্যতীত বোধ হয় গত্যন্তর নেই। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, কবিশেখরের গৃহগতপ্রাণতা, অতীত সংস্কার-মন্থন ও স্মৃতি রোমন্থন, তাঁর কাব্যের একটি প্রধান গুণবাচক বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে বেসুর কোথাও নেই, কালবারিত দোষ কোথাও ঘটে নি; বরং এই বৈশিষ্ট্যটির দ্বারাই তাঁর কাব্য আঙ্গিকনৈপুণ্যে ছন্দঃপারিপাট্যে আর বৈদগ্ধ্যের ঔজ্জ্বল্যে একান্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়েও একটা বিশেষ স্বকীয়তা প্রাপ্ত হয়েছে, একটি অভিনব ভাবলাবণ্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তরুণ কবিশেখরের কবিতা

সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে একদিন তাঁকে সম্বোধন ক'রে যথার্থ মন্তব্যই করেছিলেন—"তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা, সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্যকানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।" কবিগুরুর এই মন্তব্য থেকেই কবিশেখরের কবিসত্তার ও কবিতার যথার্থ বৈশিষ্ট্য-লক্ষণটির হদিস মেলে।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কালিদাস রায়ের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও অলঙ্কার-প্রীতি যেমন সংস্কৃতের অনুরূপ, তেমনি সরল অকপট অনুভূতির সহিত অর্থগৌরব মিলিয়া তাঁহার কাব্যে খাঁটি classical ভঙ্গি ফুটিয়াছে।" আমরা মোহিতলালের সহিত সম্পূর্ণ একমত। শিল্পকর্মে আঙ্গিক সৌষ্ঠব ও অঙ্গ-সজ্জার প্রতি সযত্ন অবধান রোমান্টিক ভাবাকুলতার আতিশয্যজনিত অস্পষ্টতা ও আকারহীনতার প্রতিক্রিয়ামুখেই সাধারণতঃ এসে থাকে, form-এর প্রতি সবিশেষ যত্নশীল মনোভাবের এই প্রতিক্রিয়া একান্ত প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক, অবধারিতও বলা চলে। কাব্যজগতের বিবর্তনের ধারা এই বিশেষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, thesis-antithesis-এর নিয়ম অনুসরণ ক'রেই সাধারণতঃ অগ্রসর হয়ে থাকে। ইংরেজী সাহিত্যে ষোড়শ শতকের প্রবল রোমান্টিক মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্লাসিকালধর্মী কাব্য-সংস্কারের সবিশেষ প্রাবল্য ঘটে; তারপরেই আবার উনিশ শতকের গোড়ার দিকে চাকা ঘুরে গেলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কোলরীজ বায়রন শেলী কীটস প্রমুখ বিশিষ্ট কবিবৃন্দের লেখনীমুখে romantic reaction-এর সূচনা হয়। পরবর্তী কালের টেনিসন ও ব্রাউনিঙের কাব্যে ক্লাসিক ও রোমান্টিক প্রবণতার মধ্যে একটা সমন্বয়ের (synthesis) চেষ্টা দেখা যায়। অন্যপক্ষে, ফরাসী কাব্যে ভিক্তর হুগো, গতিয়ার প্রমুখ রোমান্টিক কবিকুলের আবেগোচ্ছলতার বিরুদ্ধে পরবর্তী যুগে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হয় এবং কবিতায় বুদ্ধিবাদ ও মননশীলতাকে বিশেষ মর্যাদার স্থান ছেড়ে দেওয়া হয়। ফরাসী কাব্য-সংসারে Symbolist আন্দোলনের এইভাবেই উদ্ভব। বোদলেয়ার এই

আন্দোলনের পথিকৃৎ, পরে মালার্মে, পল ভালেরি-প্রমুখ বুদ্ধিবাদী কবিবৃন্দ এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা রূপে পরিগণিত হন। উভয়তই দেখতে পাচ্ছি, রোমান্টিক ও ক্লাসিক প্রবণতা যেন পরম্পরার সূত্রে একটি আরেকটির পিছু পিছু চলেছে। দিনের পরে যেমন রাত্রি, রাত্রির পর দিন, তেমনি এই দুই মনোভাবের মধ্যেও বাহ্যতঃ অচ্ছেদ্য বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক।

বাংলা কাব্যেও ঠিক এই জিনিসটিই ঘটেছে। রবীন্দ্রোত্তর অধ্যায়ে মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ স্বল্পসংখ্যক বিশিষ্ট কবিগণ যে ক্লাসিকাল ভঙ্গিমার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তাঁদের কাব্যে, তা অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালের গীতিকবিতার আত্যন্তিক আত্মকেন্দ্রিক (Ego-centric) ভাবোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারই পরিণামফল মাত্র। এই-জন্যই এঁরা রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতটি মনে না রাখলে আমরা এঁদের কবিতার সম্যক্ বিচার করতে পারব না।

কবিশেখরের কবিতাবলীর মধ্যে খাঁটী রোমান্টিক কবিতার উদাহরণেরও আদৌ অসদ্ভাব নেই। কবির পর্ণপুট, ব্রজবেণু, ক্ষুদকুঁড়া, হৈমন্তী, বৈকালী ইত্যাদি কাব্যের অধিকাংশই রোমান্টিক কবিতা। এই গ্রন্থে সংকলিত হেমন্তে, কালোরূপ, যৌবনের আবেদন, প্রেম ও পূজা, বর্ষারাতে, উর্বশী ও পুরূরবা, বিল্বফল, মৃগ, কীর্তন, প্রেম ও পূজা, সুপ্তিভঙ্গে, ফুলের গন্ধে প্রভৃতি বহু রোমান্টিক কবিতার নাম করা যেতে পারে। তবে তাঁর মূল কবিমেজাজটি যে ক্লাসিকালধর্মী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ রকম মেজাজ তৈরি হওয়ার একটা ঐতিহাসিক কার্যকারণ রয়েছে, তার আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। বাংলা কাব্যে রোমান্টিক মেজাজেরই প্রাধান্য। বিশেষতঃ বিহারীলালের পর থেকে, এই মেজাজেরই সমধিক চর্চা হয়েছে গত আশি-নব্বই বছরের বাংলা কাব্যে। অধুনা বাংলা দেশে নবীন প্রবীণ যে দু-একজন কবি ক্লাসিকাল ধারায় কাব্যচর্চায় নিরত আছেন তাঁরা মূল প্রবাহের ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত। এই ব্যতিক্রমের ধারাটি এখনও বিশেষ জোরালো হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু বাংলা কবিতার প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস এবং তজ্জনিত আঙ্গিক ও ভাষাগত শৈথিল্যকে প্রতিহত করবার জন্য আঙ্গিকনিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট অর্থাঢ্য কাব্যরচনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। ক্লাসিকাল ভঙ্গীর

কবিতার মধ্যে যে একটা বিশিষ্ট গুণ আছে, রোমান্টিক কবিতার মধ্যে তা পাওয়া যাবে না।

কবির উদাত্তভাবের প্রশস্তিমূলক কবিতাগুলির মধ্যে ভারত-বন্দনা, আদিত্য-মঙ্গল, বেদ, প্রভঞ্জন, বিবেকানন্দ, ব্রাউনিং, শেলী প্রভৃতি এবং আহরণ আহরণীর বৈশ্বানর, বরুণ, সোম, গঙ্গা, হিমাদ্রি, বজ্র, অন্ধকার, অশ্বত্থ ইত্যাদি কবিতায় বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, সংস্কৃত বেদপুরাণকাব্যাদির প্রতি অনুরাগ ও উদাত্ত-ধ্বনির সঙ্গে প্রকাশের গাঢ়বন্ধতা, পরিচ্ছন্নতা, পারিপাট্য এবং অর্থের প্রাঞ্জলতা ও অর্থগৌরবের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে। বিদেশী Ode-জাতীয় লিরিক রচনার সঙ্গে এইগুলির শ্রেণীগত মিল থাকলেও প্রকৃতিগত মিল অর্থাৎ ভাবের দিক্ দিয়ে মিল আমাদের প্রাচীন ঋষিকবিদের প্রশস্তিগাথার সঙ্গেই বেশী।

কবির বিখ্যাত সুদীর্ঘ রচনা 'নিদাঘ'-এর মূল সুরটি রোমান্টিক হলেও তার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, অলঙ্করণ, চিত্রাঙ্কন, শব্দচয়ন ও পদক্রম, সংস্কৃত কাব্যসুলভ চিত্রকল্পের বহুল প্রয়োগ, সমাসবদ্ধ পদের ঘনপিনদ্ধ বিন্যাস বারে বারেই ক্লাসিকাল সংস্কারের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই ধারার সযত্ন অনুশীলনে আনন্দও আছে, একপ্রকারের শিক্ষানুশাসনও আছে। এই অনুশাসনের সবিশেষ প্রয়োজন আত্যন্তিক রোমান্টিক ভাবাকুলতার অসংবদ্ধতা ও অসংলগ্নতাকে প্রতিরোধ করবার জন্য। আনন্দ আছে সুগ্রথিত পরিচ্ছন্ন অর্থযুক্ত ভাবপরম্পরার অনুসরণে। ক্লাসিকাল ধারার কবিতায় শুধুই অঙ্গসজ্জা আছে কাব্য নেই—এ শুধু তাঁরাই বলেন, যাঁদের মন স্বতই রোমান্টিকতার প্রতি অত্যাসক্ত ও তাতেই একান্ত ভাবে নিবিষ্ট। কোন কিছু পরিচ্ছন্ন করে ভাববার ও অনুভব করবার ক্ষমতা নেই যাঁদের বোধ হয় তাঁরাই সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্ন প্রকাশের বিরোধী।

পোপ ও ড্রাইডেনের কবিতা সম্বন্ধে একদা ইংরেজী কাব্য সমালোচকদের মনোভাব প্রতিকূল ছিল; এই কবিদ্বয়ের রচনায় বক্তব্যের যাথাযথ্য, সুস্পষ্ট অর্থব্যক্তি ও আঙ্গিকের পরিচ্ছন্নতাকে তাঁদের বিরুদ্ধে আয়ুধ রূপে প্রয়োগ ক'রে এক সময় সমালোচকের দল এঁদের একপাশে সরিয়ে রেখে তাঁদের গোটা পক্ষপাতটাই ন্যস্ত করেছিলেন রোমান্টিক ধারার কবিদের উপর। কিন্তু এখন ইংরেজী কাব্য-সমালোচনার হাওয়া ঘুরে গেছে। পোপ ড্রাইডেনের কবিতায় যেসব গুণ সমালোচকেরা এত কাল দেখতে পান নি, সেই-সব গুণ এখন তাঁদের রচনায় আবিষ্কৃত হচ্ছে। বিশেষতঃ আলেকজাণ্ডার পোপও

একজন প্রকৃত শক্তিবিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন এই তথ্য আজ প্রায় সর্বসম্মত স্বীকৃতি লাভ করেছে বললেও চলে। পোপের কাব্যের এই পুনরুজ্জীবিত খ্যাতির জোরটুকু নিহিত আছে তাঁর classicism-এর মধ্যে। ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক মেজাজের পার্থক্যটি ধরতে না পারলে এবং উল্লিখিত প্রকারের মূল্যবোধের উন্মেষ না ঘটলে অদীক্ষিতের নিকট কবিশেখরের কাব্য কিয়ৎপরিমাণে অ-ধরা হয়েই থাকবে।

'অভিনন্দন' কবিতায় কবি সরস ভঙ্গীতে কৌশলে তাঁর রচনার বিষয়-বৈচিত্র্যের একটা নির্ঘণ্ট দিয়েছেন। কবি নানা শ্রেণীর কবিতা রচনা করেছেন—তন্মধ্যে রোমাণ্টিক, প্রেমমূলক, তত্ত্বমূলক, স্মৃতিধর্মী, পৌরাণিক, আত্মকথামূলক, চিত্রাত্মক, ভাবাত্মক, শ্লেষাত্মক ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণ ও গোত্রের কবিতা আছে। এর থেকে কবির বিচিত্র রসসন্ধানী ও বহুমুখী মনটির নিঃসংশয় পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাগুলির প্রকৃতি অনুধাবন করলে বোঝা যায়, একদিকে কবির চিত্ত প্রাচীন ভারতের জ্ঞানতপশ্চর্যা ও ত্যাগধর্মের আলোকে দীপ্ত মহান জীবনাদর্শের গরিমা ব্যাখ্যানে সার্থকতার তৃপ্তি লাভ করেছে, অন্যদিকে গ্রামীণ বাংলার কমনীয় স্নিগ্ধ রূপটি তাঁর কবিতায় পরিমূর্ত হয়ে উঠেছে। স্মৃতি, স্বপ্ন বিলাস ও অতীত যুগের প্রতি প্রেম—কবির কাব্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

স্মৃতিচিত্রমূলক কবিতাগুলির মধ্যে ত্রিপথ, স্মৃতির মিছিল, মধু মুদি, বাল্যস্মৃতি, জন্মদিনে ইত্যাদি রচনাগুলির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কবি তত্ত্বমূলক কবিতা লিখেছেন অনেক, এর সঙ্গে যদি ভাবপ্রধান কবিতাগুলিকে যোগ করা যায় তা হলে তাঁর এ-জাতীয় রচনার পরিমাণ বিপুলায়তন হয়ে দাঁড়াবে। তত্ত্বমূলক কবিতার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নমুনা—জীবন-সংগ্রাম, স্বভাবধর্ম, প্রেম ও শিল্প, গুরুশিষ্য, দুই কবি, অতনুর প্রতি, ব্যবধান ও শ্মশানোৎসব। ভাবপ্রধান রচনা—পুরাতন পত্র, ব্যর্থতার সার্থকতা, সৌন্দর্যবিচার, ঘড়ি, বিজ্ঞানের বল প্রভৃতি। আত্মকথাজাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য—আষাঢ়ের কবি, ত্রিপথ, রেলপথে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, গানের বিদায়, বসন্তের পাখী, অতীত, সংসারচিত্র, ফুলের দৌত্য, অভিনন্দন ইত্যাদি। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, কবিতায় কবি লিখেছেন—এখানে অর্থাৎ নগরের বাইরে এসে আমার—'চিত্ত উঠে গান গেয়ে।'

যেন সে বিদেশ থেকে, মনে হয়, ফিরিল ভারতে,
কারাগার থেকে যেন মুক্ত হয়ে এলো রাজপথে।
গঞ্জ থেকে কুঞ্জে যেন, খাঁচা থেকে যুঁইয়ের মাচায়,
গন্ধ হতে পদ্মে এসে ফিরিতে না চায়।
ঝি-র কোল থেকে যেন মা'র কোলে বাড়ায় সে হাত—
এই ত স্বদেশ মোর, নগর ত নকল বিলাত।
এরি পাঠশালে মোর বিদ্যা হ'ল সুরু,
এরই গান গাহিবার দীক্ষা মোরে দিল কবিগুরু।

এই ছত্র কয়টির মধ্যে কবির আসল মনোভঙ্গীটির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির আদরের দুলালী যে আসল বঙ্গভূমি, তারই রূপের ধ্যান ও মহিমা কীর্তনেই যে কবির চিত্তের সহজ স্ফূর্তি, নগর সভ্যতার পরিমণ্ডলের ভিতর তাঁর প্রাণ ক্লিষ্ট ও সংকুচিত হয়, এই ভাবটি তিনি আলোচ্য কবিতায় অকপটে ব্যক্ত করেছেন। 'মধু মুদি' কবিতার ভিতরও ভিন্ন প্রসঙ্গে একই ভাবের ছায়াপাত ঘটেছে। এ কালের বহিরঙ্গ-সর্বস্বতাকে কবি ধিক্কার দিয়েছেন এই ব'লে—

মন্দিরই দেবতা হ'ল আজ,
দেবতারে ভুলে গেছে আজিকার পূজারীসমাজ। (দেহাত্মবাদ)

জীবন-সংগ্রাম নামক উদাত্তগম্ভীর কবিতাটিতে কবি জীবনের জয়গান করেছেন এইভাবে—

শ্মশানের চর্ম-শৃঙ্গ-স্নায়ু-শিরা-করোটি কঙ্কালে,
জীবন সঙ্গীত রচে, জীবলোক নাচে তালে তালে।
কীটের শ্মশান হ'তে আনি সূক্ষ্ম কোষ-সূত্রজাল,
অলক্ত রুধিরধারা, আনি শঙ্খ, প্রবাল-কঙ্কাল
সমুদ্রশ্মশান হ'তে, নারীরে সে করে শোভাবতী,
মরণের অর্ঘ্যে সেজে হিন্দু সতী হ'ল আয়ুষ্মতী।
মৃগের শ্মশান হ'তে মৃগমদ করি আহরণ,
কস্তুরী-ভৈরব রসে মরণেরে জিনিল জীবন।
তুলসীকঙ্কালে ভক্ত ধরে কণ্ঠে মরণের স্মৃতি,
হরিনাম ধ্বনি তায় জয় করে তার মৃত্যু-ভীতি।

অন্য পক্ষে, গম্ভীরভাববাহী অনুরূপ আর একটি কবিতায় কবি স্বভাব-ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

"কেবল সাধনালভ্য ব্রহ্মতৃষ্ণা সুসভ্যেরই মনে,
আমার বর্বর-চিত্ত এ প্রলাপ মানিবে কেমনে ?
শিশু যথা পিতা চিনে, সভ্য চিনে তোমারে তেমনি,
বর্বর চিনিল যথা শিশু চিনে আপন জননী।
তোমারে পাইতে হ'লে পূর্ণরূপে, কহে জ্ঞানিগণ,
চাই দ্বিধাক্লেদশূন্য অকপট বর্বরের মন।
তোমার সন্ধানে ভক্ত সভ্যতার সর্ব সমারোহ
বিসর্জি, বিজয় করি ভোগ-সুখ ধনজন-মোহ,
চীরবাসে ফিরে হয় গুহাগর্ভে আবার বর্বর,
হে ব্রহ্ম, কেমনে কই সে বর্বরে কর অনাদর ?
অপরা বিদ্যায় দৃপ্ত সভ্য নর আর্য অভিমানে,
রসহীন গ্রন্থে মগ্ন বৃথা রসব্রহ্মের সন্ধানে।"

এই কবিতাটির মধ্যে কবি সহজিয়া সাধনার তত্ত্বটি অতি চমৎকার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপ সংস্কারমুক্ত মননের পরিচয় আরও কতিপয় কবিতায় বিকীর্ণ হয়ে আছে।

কবির রোমান্টিক কবিতাগুলির মধ্যে সুপ্তিভঙ্গে ও হেমন্তে কবিতা দুটির তুলনা হয় না। সুপ্তিভঙ্গের কয়েকটি চরণ—

ঘুমঘোরের আবেশভরা নয়নে আজ দেখছি চেয়ে
সৃষ্টি চাহে আমার পানে নবীন কলেবরটি পেয়ে।
ঘুম ভেঙে আজ ঘুমের স্বপন মন হ'তে কি বাইরে এসে
প্রাচীন ধরায় অভ্র দিয়ে আড়াল ক'রে বেড়ায় ভেসে ?
দণ্ড কয়েক অকাল ঘুমের ব্যবধানের মধ্যখানে,
সৃষ্টি এমন বদলে যাবে, হয় না মনে—হয় না মানে।

কবির প্রেমকবিতাগুলির মধ্যে আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে বর্ষারাতে, প্রিয়ার কৈশোর, কুণ্ঠাহরণ, মানসী, আধ্যাত্মিক কবিতা, অমৃতক্ষণ ইত্যাদি। বর্ষারাতের একটি প্রেমস্নিগ্ধ স্মৃতিচিত্রের শেষ কয়টি চরণ—

লাগত বাদলারাত মধুর বড়
করত নিভৃত গৃহ নিভৃততর।
আকাশ বাতাস মেঘ মাতত রাতে,
জোরে জোরে কথা বলা চলত তাতে।
চমকাত বিদ্যুৎ, ধমকাত মেঘ,
নিকটে আনত তোমা সভয় আবেগ।
মেঘের ডাকের কী যে আসল মানে,
নবদম্পতী ছাড়া কেই বা জানে?
মনে হ'ত এ বরষা হোক না অশেষ!
নওল প্রেমের এ যে খাঁটি পরিবেশ।'

পূর্বেই বলেছি, কবির হৃদয় বৈষ্ণবভাবরসের দ্বারা আবাল্য পুষ্ট হয়েছে, সেই কারণে তাঁর রচনায় ভক্তিভাব ও মাধুর্যভাবের যে রূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, বর্তমান বৈষম্যমূলক সামাজিক ও আর্থনীতিক ব্যবস্থার নানাবিধ অত্যাচার, অবিচার, অসংগতি ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদাত্মক মনোভঙ্গীর সেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে কবি বর্তমান সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত মৌলিক অসাম্যের বিষয়ে সচেতন ন'ন। একাধিক কবিতায় কবির সহজ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীটুকু ফুটে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাঘরে, সাপুড়িয়া, মুদ্দফরাস, নরদেব, স্বর্গের সন্তান, ব্যথিত বিচার, প্রাণাচার্য ইত্যাদি কবিতাগুলির নামোল্লেখ করতে পারি। এসব রচনায় কাপট্য, ভণ্ডামি ও শাঠ্যের প্রতি রোষ ও ন্যায়ের প্রতি সহজ অনুরাগ ফুটে উঠেছে। অগ্রগতিশীল মনোভাব যে সকল কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষ করে ব্যবধান, সৃষ্টিমেধ, বিরহিণী, শরণ্যের প্রতি ও শোকসভা উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, আর দুটি সংকলনে বহু দৃষ্টান্ত মিলবে। শেষোক্ত কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধার করা যেতে পারে—

একের সাধিল ইষ্ট বিঁধিয়া বহুর বক্ষে শূল,
কৃপা করিবার স্পর্ধা রাখিত যে সমগ্র ধরারে,
ধন-মান-পদ-গর্বে বিধাতার কথা অহঙ্কারে
ভুলেও ভাবে নি যেবা, শোক-সভা তারি লাগি হবে?

কাহারা করিবে শোক ? যারা নিঃস্ব অকিঞ্চন ভবে
লাঞ্ছিত বঞ্চিত যারা ? জোটেনিক যাদের কপালে
এ বিশ্বের কোন ভোগ্য কোন তৃপ্তি হায় কোন কালে
তারাই করিবে শোক ?

কবির শ্লেষাত্মক রচনা, যথা—মাটি, শেকস্‌পীয়ার, ব্যবধান ইত্যাদি এবং বল্লরীকুসুমের ও 'শ্লেষের সুরে' পর্যায়ের কয়েকটি ছোটছোট কবিতার মধ্যেও কবির সমাজসচেতন মননের পরিচয় বিশেষভাবেই পাওয়া যায়।

তবে কবির মনটি যে বৈষ্ণব ভাবধারার অভিসেচনেই সমধিক লালিত ও পুষ্ট হয়েছে তা তাঁর সমগ্র কাব্যপরিমণ্ডলের প্রকৃতি অনুধাবন করলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে। যেখানে প্রেমই জীবনাদর্শের মূল নিয়ন্তা, সেখানে সমালোচনী বক্রদৃষ্টি খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। প্রেমের যাদুস্পর্শে সমালোচনা, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের উদ্যত কঠোর দণ্ড স্বতই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। কবির কাব্যাদর্শ সম্পর্কেও এই কথা খাটে। তিনি কবিতায় প্রেম, বাৎসল্য ও কারুণ্যভাবেরই অনুশীলন করেছেন বেশী; ফলে আধুনিক সমাজচিন্তার খাতবাহিত বিদ্রোহী মনোভঙ্গী তাঁর রচনায় স্বতই খুব অল্প জায়গা জুড়ে আছে। এজন্য অবশ্য আমাদের মনে কোন আক্ষেপ নেই। কারণ, তাঁর কবিতায় হৃদয়ের উত্তাপের স্পর্শ আমাদের অন্যবিধ প্রত্যাশাকে বিগলিত ক'রে দিয়েছে। তিনি দুহাতে আমাদের প্রেমামৃত পরিবেষণ করেছেন, কবির এই কল্যাণময় রূপটির জন্যই তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে সুদীর্ঘকাল স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। কবির বৈষ্ণবভাবোদ্দীপক ও অতীত স্মৃতিচিত্রমূলক কবিতাগুলির মধ্যে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির স্তন্যরসপুষ্ট একটি বিশেষ সুকর্ষিত ও পরিশীলিত মনের পরিচয় পেয়েছি; এই মনের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই। আজকের দিনের সর্বব্যাপী শ্রদ্ধাহীনতার আবহাওয়ার মধ্যে বাস ক'রেও অস্তিত্বের গ্লানিকর মালিন্য অগ্রাহ্য ক'রে যিনি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের বাণী শোনাতে পারেন, তাঁর প্রতি আমাদের ঋণের শেষ নেই।

নারায়ণ চৌধুরী, সম্পাদক

গ্রন্থকারের নিবেদন

পঞ্চাশ বৎসর আগে **কুন্দে** যে খেয়ালের সূত্রপাত হয়েছিল **সন্ধ্যামণিতে** বোধহয় তার শেষ হ'ল। ফুলে সুরু, ফুলেই সারা ; ভাবিওনি ফলের কথা।

গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে সুরু করেছিলাম যাত্রা, কিন্তু তাঁর চলার পথে আগাতে পারিনি। তাঁর পদাঙ্ক-পরম্পরা খুঁজেও পাই নি। জানি না তিনি তাঁর পদাঙ্ক মুছে মুছে চ'লে গিয়েছেন কিনা। তবে তিনি যে বলেছিলেন—'একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা।' সেই একতারা বাজাতে বাজাতে এত দূর এগিয়ে এসেছি, যুগযাত্রার পথে নয়, জীবনের যাত্রার পথে। যেরূপ দ্রুত গতিতে যুগের পরিবর্তন হয়েছে—তাতে যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সঞ্জাত কবির পক্ষে সম্ভব নয়। একতারাও এযুগে অচল।

আমি কোন পরিকল্পনা নিয়ে কাব্যসাধনা করিনি, যখন যে ভাব মনে এসেছে তাই ছন্দে প্রকাশ করেছি। আমার কাব্য-সাধনার মূলে আছে বেদনা, ব্যথিতের কথাই বেশী লিখেছি, তবে আমি আমার ঘনিষ্ঠ কবিবন্ধুর মত দুঃখবাদী হইনি। ব্যথার সান্ত্বনা খুঁজেছি কবিতায়। তা অবশ্য পেয়েছি।

আজকালকার সমালোচকরা কবির কাব্যে কোন একটা মতবাদ খোঁজেন, আমি কোন মতবাদের চারিপাশে ঘুরপাক খাইনি—তাত্ত্বিকতা আমার লক্ষ্য নয়, সাত্ত্বিকতাই আমার লক্ষ্য। আমার বিশ্বাস, কবিতায় সরসতা যদি হয় ফুল, তবে তাত্ত্বিকতা তার ফল। মতবাদকে আমি কাব্যের অন্যতম উপাদান ব'লেই জানি। কাব্যের এই উপাদানকেই যাঁরা বৈশিষ্ট্য ব'লে মনে করেন, পৃথক পৃথক কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা না ক'রে তাঁরা সব জড়িয়ে প্রচণ্ড প্রয়াসে একটা তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেন। আমি জানি রচনারীতির বৈশিষ্ট্যই কবির আসল বৈশিষ্ট্য। কারো, এমন কি কবিগুরুর রচনারীতিরও আমি জ্ঞাতসারে অনুকরণ করিনি,—জানি না রচনারীতির বৈশিষ্ট্য আমার কিছু আছে কি না। এই সংকলনে দীর্ঘ জীবনের প্রত্যেক সোপানের রচনার নিদর্শন ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল, অনুরাগী পাঠক যদি কেউ থাকেন, তিনি তার বিচার করবেন। আমার আর কিছু বলবার নেই।

কুঞ্চিকা

ভারত-বন্দনা—(পৃঃ ১) তিত্তিরি—তিত্তিরিপক্ষিরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যের অনুবর্তী ঋষি, কৃষ্ণযজুর্বেদের প্রচারক। (পৃঃ ২)—মৃগরোচনা—মৃগদেহে জাত পীতবর্ণের গন্ধদ্রব্য। বাজি—'বাজী' হ'বে। (পৃঃ ৩) মহোদয়শ্রী—৭ম শতাব্দীতে অসামান্য শ্রীগৌরবের জন্য কনৌজকে মহোদয় বলা হ'ত। শ্রীবিজয়কেতু—৪র্থ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত পূর্বদ্বীপপুঞ্জের হিন্দুরাজ্য। (পৃঃ ৪)—ডামর—কোলাহলময়। (পৃঃ ৫)—সুরুচি ধ্রুবের বিমাতা, উত্তম বিমাতার পুত্র।

বিশ্বামিত্র—(পৃঃ ৯) মাতৃঘ্ন—পরশুরাম। অতিবলা—যে বিদ্যার দ্বারা শ্রম-ক্লান্তি, ব্যাধি, জরা, নিদ্রা, আলস্য, অবসাদ সমস্ত জয় করতে পারা যায়। রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্র এই বিদ্যা দান করেন।

ব্রজের পথে মীরা—(পৃঃ ৩১)—ভক্তমালের অনুসরণে রচনা করার জন্য কবিতায় ঐতিহাসিক প্রমাদ ঘটেছে। মীরা ছিলেন রাণা সংগ্রামের পুত্র ভোজরাজের বধূ, অল্প বয়সে বিধবা। রাণা কুম্ভের সঙ্গে মীরার কোন সম্পর্ক নেই।

ঋতুলক্ষ্মী—(পৃঃ ৪৩)—পদাঘাত……উপহার—কবি-সময়প্রসিদ্ধি। হস্তে …কদম্বফুল (মেঘদূত)।

নিদাঘ—(পৃঃ ৪৬) অশিথিল পরিরম্ভ—(উঃ রাঃ চঃ) গাঢ় আলিঙ্গন। আজি…বিনিময় (কাদম্বরী)। (পৃঃ ৪৭)—যেন মর্মরসোপানে ··শ্রেণী উঠে—পয়োধরে রোহতি রোহিতশ্রীঃ (নৈষধ)। কুস্তরী—'কস্তূরী' হ'বে। (পৃঃ ৪৯)—মন্দুরা—অশ্বশালা। স্কন্ধাবার—শিবির। (পৃঃ ৫২)—চারুদত্ত—মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়ক। (পৃঃ ৬০)—'অঙ্গ'—লোমপাদ রাজার রাজ্য। (পৃঃ ৬১)—'পিণাক'—পিনাক হ'বে। সূর্যহৃদয়—সূর্যের স্তব বিং। অগস্ত্য এই স্তব শুনাইয়া রামচন্দ্রকে রাবণবধে শক্তিদান করেন। (পৃঃ ৭২)—কৌশিক—বিশ্বামিত্র। (পৃঃ ৮৯)—পঙ্কজে……করিনি শ্রবণ—ভট্টিকাব্য।

তুলসী—(পৃঃ ৯৫)—কাশীর কৃত্তিবাস—তুলসীদাস। শবসাধক—বিল্বমঙ্গল। কুমারহাটি—কুমার হট্ট—ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। খেতুরীর নরোত্তম, সাতগাঁওএর (সপ্তগ্রামের) রঘুনাথ ও গৌড়ের রূপসনাতনের কথা বলা

হয়েছে। (পৃঃ ৯৬)—গজপতি—প্রতাপরুদ্রদেব উৎকলরাজ। তুলসী বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রতীক। (পৃঃ ১০৪)—'দুঃখবাদী কবি' কবিতায়—'মন্দিরের' ও 'চর্বণানন্দ' কথা দুটি ছাপায় ভালো ওঠে নি।

বেদ—(পৃঃ ১০৫)—ঔর্ব—সাগরগর্ভের অগ্নি। নীললোহিত—শিব। পর্জন্য—মেঘবিশেষ। তপঃ, জন, মহঃ সপ্তলোকের তিনটি লোক। (পৃঃ ১০৬) —হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মের যজ্ঞারাধ্য রূপ (কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম)। ওষধিনাথ —চন্দ্র। (পৃঃ ১০৭)—মধুজা—পৃথিবী।

আদিত্যমঙ্গল—(পৃঃ ১০৮)—অশ্বী—অশ্বিনীকুমার (অশ্বিনৌ)। আময়-বারক—চিকিৎসক। (পৃঃ ১০৯)—নির্ঋতি—অলক্ষ্মী। দ্রোণ, আবর্তক, পুষ্কর —মেঘের বিভিন্ন নাম। বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও পুরাণের মধ্য দিয়ে উপনিষদে এসে সূর্যের কথা শেষ করা হয়েছে।

(পৃঃ ১২০)—১ম চরণে 'বর্ণিতে' ছাপায় ওঠে নি। অজ অমূর্ত...হৃদয় তব। (মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।১।২, ৪)। (পৃঃ ১২৪।৩)—'তুষার' ও 'সনাতনী' ছাপায় ভাল ওঠে নি। (পৃঃ ১৫০)—'দগ্ধ হয়'—স্থলে 'ধ্বংস পায়' হ'বে। (পৃঃ ১৫৬)—গীতায় চক্রপাণির উক্তি—চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন। আর্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। (পৃঃ ১৫৭)— দাস্যপ্রেমের পরম সাধক চিকিৎসক মুরারি গুপ্ত, শ্রীচৈতন্য-সহচর। (পৃঃ ১৫৯) —ত্রিপথগা—গঙ্গা। (পৃঃ ১৭৪)—রঙ্কু কোমল লোমের মৃগবিং। (পৃঃ ১৭৬)—বৈশালী—বিশালা বা উজ্জয়িনীর নাগরী। (পৃঃ ১৯৪) বিশালা—উজ্জয়িনী। (পৃঃ ২০১)—বৈভ্রাজ—যক্ষপুরীর উপবন। (পৃঃ ২১২) —শতপত্রমধু—পদ্মমধু। পৃঃ ২১৬—গৃধ্রকূট— রাজগৃহে এই পর্বতে বুদ্ধদেবের ধ্যানের গুম্ফা ছিল। ২১৯।১১—'যুঝি।' স্থলে 'যুঝি', হবে। পৃঃ ২৩২—ম্যামন— ঐহিক ঐশ্বর্যের দেবতা।

(পৃঃ ২৪৩, ১৮ পং) 'ধরিল উৎসব ক্ষেত্রের' স্থলে 'ধরিল উৎসব রূপ'—হ'বে। জনার্দন পণ্ডিত—কবিকঙ্কণ চণ্ডীর শ্রীমন্তের শিক্ষাগুরু। (পৃঃ ২৫৩) —সৌদামিনী এণ্টোনির পত্নী, ব্রাহ্মণবিধবা। ঠাকুর সিং—এণ্টোনির দলের বাঁধনদার। 'ঠাকরো সিংএর বাপের জামাই' এই উক্তিতে দুই জনকেই ভোলা ময়রার গালাগালি।

সূচীপত্র



গ্রন্থকার

সন্ধ্যামণি

ভারত-বন্দনা

হিমগিরি তব পূজামন্দির, সোপান তাহার শৈলমালা,
পাদ্য তোমার নদীর কোশায়, কেদার-কানন অর্ঘ্যথালা।
কুঞ্জ-কূজনে কলগুঞ্জনে নান্দী তোমার নিত্য নব,
মহাসিন্ধুর দুন্দুভিনাদে জীমূতমন্দ্রে আরতি তব।
মণ্ডপতল ভরা আলিপনে, কুণ্ড প্রসাদী ফুলের স্তূপে,
তব ঘাট ভরা কুশাঙ্গুরীতে, তব বাট ভরা দগ্ধ ধূপে।
ধ্যানযোগ জপে জ্ঞানযাগ তপে প্রতি রেণুকণা পবিত্রিত ;
তোমার মাটিতে হাঁটিতে সত্ত্ব-গৌরবে তনু রোমাঞ্চিত।

গোধন তোমারে করেছে পোষণ জিয়ায়ে রেখেছে জীবনযাগ,
পরম ঋদ্ধি, ধাত্রী বলিয়া লভেছে শ্রদ্ধা সেবার ভাগ।
নীবার-দর্ভে তৃপ্ত শ্বাপদ, যজ্ঞ-প্রহরী হয়েছে বনে ;
আশ্রম-শিশু বিক্রমে দমি' যেথা কেশরীর দশন গোণে।
তোমার ব্যজনে লোমশ পুচ্ছ দিয়াছে চমর, চমর-বধূ,
তুচ্ছ জীবন করে সমুচ্চ ষট্‌পদকুল বিতরি মধু।
মৃগমদ-রসগন্ধ-বিনোদে বন্দে তোমারে গন্ধ-সার ;
দ্বিরদ কুম্ভ, শুক্তি মর্ম বিদারি দিয়াছে মুক্তাহার।
হৃদয়তন্তু দিয়া কীট তব বুনেছে চিকন ক্ষৌমপট,
বক্ষোরুধির লাক্ষাধারায় রাতুল করেছে চরণতট।
তিত্তিরি তব তপোবনে কয় উপনিষদের অমৃতবুলি,
ক্রৌঞ্চ তাহার বক্ষের ক্ষতে রামায়ণী ধারা দিয়াছে খুলি।

অটবী পেলেছে ঋষিগণে বট অশোক বিল্ব শমীর ছায়,
হোমধূমে তার নয়ন অরুণ তরুর রক্তকুসুমে ভায়।

যাগের অনলে সমিধ্ যোগায় তরুণগণও যেন যজ্ঞরত ;
জটাবল্কল অক্ষমালিকা ভৃঙ্গার ধরে ঋষিরই মত।
বহে শুভাশিস্ দূর্বার শীষ, মঙ্গলমৃৎ, মৃগরোচনা,
ধান্য তোমার অন্নদা-মার অঞ্চলঝরা কনককণা।
বৈশাখী ঝারা জাহ্নবীধারা পুণ্য তরুর অঙ্গে ঢালে,
তুলসীকুঞ্জ বরাভয়বাণী গুঞ্জরে মহাযাত্রাকালে।
সূত্রে শিলায় কল্পলীলায় কল্পিত তব শিল্পকলা,
সঙ্গীতি তব ভক্ত হিয়ার প্রীতিগদ্‌গদা রসোচ্ছলা।
তব সাহিত্য সতীর, সতের, সত্যশূরের কীর্তি গায়,
ধ্রুব বাণী ছাড়া অন্য বারতা ইতিহাস নাহি বহিতে চায়।

কর্মে তোমার শুধু অধিকার বিভুপদে সঁপি কর্মফল,
মরণ মিথ্যা, অমরাত্মার সে ত নব বাস পরার ছল।
ইন্দ্রিয়াতীত সন্ধান তব, ভোগসুখে জানো ঘৃণিত ক্লেদ,
গৃহদাহে দ্বিজ আর সব ফেলি খুঁজে ত্বরা নিজ যজুর্বেদ।
জানো এ জীবন সাধনার লাগি, অতিথির তরে গৃহীর গেহ,
কর্মবলের লাগি যৌবন, আত্মারই তরে দেহীর দেহ।
তপে কৃশ তব ঋষিশিষ্যের শুধু তর্জনীহেলনভরে
রথীর কিরীট, উদ্ধত বাজি, উদ্যত ধনু নমিয়া পড়ে।
নৃপতি তোমার প্রকৃতির পিতা, জনক শুধুই জন্ম-হেতু,
প্রাসাদ অটবী—এপার-ওপার, মাঝখানে শুধু ত্যাগের সেতু।
আর্তে তারিতে অশিব বারিতে তব বীরগণ আয়ুধ ধরে,
শির হতে সারে বড় গণি, প্রাণ সঁপে প্রাণাধিক ব্রতের তরে।

গৌতম তব শিখালো জগতে প্রথম পঞ্চশীলের ব্রত,
আজিও অর্ধজগৎ যাঁহার চরণাশ্রয়ে শরণাগত।
মৌর্য তোমার শৌর্যের বলে একচ্ছত্র সিংহাসনে
আদর্শ রাজধর্ম পালিল শুভ কূটনীতি-প্রবর্তনে।

ভিক্ষু নৃপতি অশোক সুমতি সন্তানসম পালিল প্রজা,
আজিও উড়িছে প্রতি গিরিশিরে ত্যাগলাঞ্ছিত তাঁহার ধ্বজা।
অসির সঙ্গে বাঁশীর মিলন ঘটাইল তব গুপ্তরাজ,
মহোদয়-শ্রী আবার উজলে, কে করে তাহারে লুপ্ত আজ ?
তুমি এসিয়ার পরম তীর্থ, যাত্রীর ভিড় তোমার দ্বারে,
তব নালন্দা বিক্রমশিলা নব সভ্যতা দিয়াছে তারে।
যুগে যুগে কত দস্যু, কত না লুণ্ঠক দল এসেছে রুখে ;
অনিত্য ধন নিয়ে গেছে তারা, নিত্য ধনেরে রেখেছ বুকে।
শ্যাম, কাম্বোজ, বলি, সুমাত্রা আশ্রয় নিল পক্ষপুটে,
এখনো উড়িছে শ্রীবিজয়কেতু বরভূধরের স্তূপের কূটে।
বিশ্ব যখন আঁধারে মগন ধরাময় যবে গভীর রাতি,
তখনি করিল বিকিরণ তব ষড়্‌দর্শন ব্রাহ্মী ভাতি।
পূর্বগগন রক্তিমাভায় রঞ্জেনি যবে জ্ঞানের রবি,
তখনি গাহিল রবিবন্দনা উষার বিহগ তোমার কবি।

বুদ্ধেরে তুমি অঙ্কে ধরিলে, পয়গম্বরে জানালে নতি,
খ্রীষ্টের ক্রুশে বন্দিলে তুমি, ভেদাভেদহীন তোমার মতি।
সর্বধর্মসমন্বয়ের তুমি যে পরম তত্ত্ব জানো ;
পথ নিয়ে তাই করো না বিবাদ, এক সেই ধ্রুব লক্ষ্যে মানো।
মনুসন্তান যে আছে যেখানে অবারিত গতি তোমার গেহে,
শ্বেত পীত কালো—সকল বর্ণ একাকার তব শুভ্র দেহে।
শিখালে ক্ষমিতে চির বৈরীরে, বীর বৈরীর নমিতে পায়,
বিশ্বপ্রেমের হরিচন্দন মাখাইয়া দিলে সবার গায়।
তোমার অঙ্ক উজল করেছে শত শত বীর, তাপস, কবি,
ধন্য জনম তোমার অঙ্কে জনমি তাঁদের প্রসাদ লভি।

বিশ্বের প্রতি

কে বলে জড় বিশ্ব তুমি ? তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা, একি-এ লীলা-দৃশ্য হেরি দিবসরাত !
জ্যোছনাভাতি, তারকাপাঁতি—বিভূতিভূষা অঙ্গময় ।
কখনও তব কক্ষ'পরে নৃত্যে তাল-ভঙ্গ নয় ।
বারিধি-হ্রদে শারদ নদে ডমরু তুলে ডামর-তান,
দোদুল-জটা-জলদ-ঘটা দামিনী-ছটা-দীপ্যমান ।
ইন্দ্রচাপে সন্ধ্যারাগে কটিতে আঁটা কৃত্তিপট,
ধরেছ পাপ-তামস-তাপ-গরল গলে, রুদ্র নট ।
তোমার পাশে গৌরী হাসে বিতরি জীবে অন্নজল,
শম্ভুশিরে আঁচল উড়ে চরণে ফুরে কমলদল ।
তুমি ত জড় সৃষ্টি নহ—তুমি যে নিজে স্রষ্টা, নাথ,
পাগল ভোলা, একি-এ লীলা-বিলাস হেরি দিবসরাত !
শিশিরকণ-মণিভূষণ বনবিতান-বল্লীচয়
আনতফণ ফণীর মত জড়ায়ে তনু প্রণত রয় ।
নর-করোটি তোমার করে, কণ্ঠে মহাশঙ্খ-হার,
ধবলগিরি-বৃষভ বহে শৃঙ্গে মেঘপঙ্ক-ভার ।
ঈশান, তব পিনাকে ছোটে অশনি-শর কৃশানুময়,
বিষাণ-রবে ঝঞ্ঝা জাগে ঘোষণা করে ভীষণভয় ।
ত্রিশূল তব ত্রিতাপরূপে ত্রিকাল ব্যেপে ঘূর্ণমান,
অট্টহাসি,—তুহিনরাশি তটিনী কোটি করিছে পান ।
রোষ-ভীষণ ভাল-নয়ন,—নিদাঘ ভানু নির্নিমেষ ;
রতিপতিরে ঋতুপতিরে দহিয়া করে ভস্মশেষ ।
তুমি-ত জড় বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা ! একি-এ লীলা, একি-এ খেলা দিবসরাত !

ধ্রুব

উত্তমই যা ভাব্‌ছ মোহের ঘোরে,
বসায়ে আজ আদরে তায় ক্রোড়ে,
তাড়াচ্ছ যে ধ্রুবেরে দূর বনে,
ধ্রুবের সাথে বিদায় নেবে শুভ।
অধ্রুবেরে চিত্তে ভজি ভজি,
সুরুচিতে নিত্য র'য়ে মজি
সুনীতিরে করবে কর দূর ;
দুঃখ কি তার পুত্রটি যার ধ্রুব।

ধ্রুব আপন কঠোর সাধন-বলে
উঠবে জিনে হরির পদতলে।
সুনীতি-ত হবেই শ্রেয়োমাতা
সবার উঁচু পুণ্য ধ্রুবলোকে।
ভোগের মোহে মরীচিকার জালে
মিটবে না ত তৃষ্ণা কোন কালে,
চাইতে হবে ধ্রুবলোকের পানে
অশ্রু-অরুণ আর্ত করুণ চোখে।

ধ্রুবের সেবা ভিন্ন কেবা কবে
বিশ্বে অশোক শাশ্বত লোক লভে ?
ধ্রুবের প্রভা ভিন্ন ভবার্ণবে
নাবিক তুমি হবেই পথহারা,
সুলভ সুখের লোভ লালসা যত,
ক্ষণিকভাতি জোনাকপাঁতির মত ;
নিশান্তে হায় নিভবে তাদের আয়ু,
অনন্তকাল জ্বল্‌বে ধ্রুবতারা।

———

মথুরার দূত

বিদায় চন্দ্রাননে,
এসেছে আজিকে মথুরার দূত আমার বৃন্দাবনে
সাঙ্গ আজিকে বাঁশীরব-গান,
হল ব্রজে কলহাসি অবসান।
শেষ অভিসার, মান-অভিমান, উচ্ছল রসাবেগ।
যদিও যমুনা ভরা টলমল,
নীপনিকুঞ্জ পুলকোচ্ছল
ময়ুর ময়ূরী নৃত্যচপল, গুরু গুরু ডাকে মেঘ,
তবু হায় যেতে হবে,
বারতা বহিয়া মথুরার দূত গোকুলে এসেছে যবে।

বোলো সখাসখীগণে—
এসেছে নিঠুর মথুরার দূত বঁধুর কুঞ্জবনে।
জলকেলি শেষ ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে,
কালীদহে তটবিটপী কাঁপায়ে,
বৃথা বনফলে ভরিছ আঁচল, মিছে গাঁথ মালা আর।
ফুলের ঝুলনা লুটিবে ভূতলে,
ভাবিতে নয়নে সলিল উথলে।
যাই বুকে বহি রসরাস-দোল-ঝুলনের স্মৃতিভার।
মিছে আর মায়াডোর,
ভেসে যাক চ'লে যমুনার জলে সাধের বাঁশরী মোর

বোলো অভাগিনী মায়,
আজিকে তাহার প্রাণের দুলাল বাঁধন কাটিয়া যায়।
কে হরিবে আর ক্ষীর সর ননী ?
কে ধরিবে শিখিপুচ্ছ-পাঁচনি ?
শত আঁচলের গ্রন্থি টুটাতে হিয়া ফেটে শতখান।
বোলো গোপীগণে,—যমুনার ঘাটে,
সাঁঝে নদীতটে, দিনে দধিহাটে,
আজ হ'তে হ'ল যত লাজ জ্বালা যাতনার অবসান।
মিছে ডাকো বারে বারে,
এসেছে আজিকে মথুরার দূত কানুর হৃদয়দ্বারে।

কেমনে হেথায় রহি ?
মথুরার দূত এসেছে নিদয় বিদায়নিদেশ বহি।
ডাকিছে সত্য বিষাণ-বাদনে
জীবন-মরণ-রণ-প্রাঙ্গণে,
ডাকে মথুরার কাতর কাকুতি, আতুরের আঁখিলোর।
পাষাণ-কারার আকুল রোদন
করেছে সুপ্ত তেজের বোধন,
ভাঙিতে হয়েছে রাগের স্বপন, ফাগের রঙীন ঘোর।
মিছে আর আঁখিজল
মথুরার দূত করিয়া দিয়াছে অন্তর চঞ্চল।

———

পাদমেকং ন গচ্ছামি

ব্রজের সখী, ব্রজের সখা, কাঁদছ কেন করুণ রোলে ?
আমার সাধের গোকুল ছেড়ে কোথাও আমি যাইনি চ'লে।
রজের মাঝে পেয়ে আমায় শিহরে ঐ ব্রজের দেহ,
প্রতি হৃদয়স্পন্দে আছি, কেঁদ না আর তোমরা কেহ।
ব্রজের বাটে, ব্রজের ঘাটে, ব্রজের গোঠে, মাঠের মাঝে,
শষ্পলতায় পুষ্পপাতায় আছি হেথায় নানান সাজে।
কাঁদ্‌ছ মিছে, নয়ন মুছে দেখ চেয়ে এই-যে আমি।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।
বরণ আমার বিলীন হ'ল ব্রজের শ্যামল দূর্বাদলে,
শাঙন গগন মগন করি কালিন্দীর ঐ কালো জলে।
ময়ুর-নাচা তমালবনে সংশয়ে চাও মাঝে মাঝে,
ভুল তা'ত নয়, আমার চাঁচর চিকুর চূড়া সেথাই রাজে।
গোপাঙ্গনার অঙ্গতটে উল্লাসিতে উচ্ছলিয়া
গ'লে গ'লে নামলো গিয়ে কালিন্দীতেই আমার হিয়া।
রসাল-শাখার শুক-শারিকা করছে আজো আমার নাম-ই,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।
বেণুর বনে বাজলে বাঁশী চম্‌কে ওঠ,—চেন না কি ?
কালীদহের নীলোৎপলেও দেখনি কি আমার আঁখি ?
কৃষ্ণসারের চরণ-পাতে থম্‌কে দাঁড়াও চাও যে পিছে,
আমার চরণশব্দ সে ত,—একবারে তা নয়ক মিছে।
বন্ধুজীবে রক্ত অধর,—কিসলয়ে নখর-রুচি,
পদ্মদলে চরণ দুলে,—কুন্দফুলে হাস্য শুচি,
চিনি-চিনি চিনতে নারো, চম্‌কে উঠে চাও যে থামি !
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

পাটল অশোক-পলাশবনে ফাল্গুনে মোর রঙের খেলা,
পরাগরাগের হোলির ফাগে উচিত আমায় চিনে ফেলা।
বকুলডালে বেতস-বনে বাদল বায়ে ঝুলন করি,
ব্যাকুল চোখে চেয়েও থাকো, যেন আমায় ফেল্লে ধরি।
দেখছ না ঐ চলছে আমার রাসের লীলা চুপে চুপে,
হাজার ঢেউয়ে পৌর্ণমাসীর পূর্ণ শশীর হাজার রূপে।
উদাস বায়ুর পরশ দিয়ে বিবশ করি দিবসযামী,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

———

বিশ্বামিত্র

দেশে-দেশে ব্রহ্ম-ক্ষত্র বিশ্বহোত্রী বিশ্বামিত্র, তব জাগরণ,
তব ঋক্‌মন্ত্রে, রথি, 'সুপ্রতরা' নদনদী বিজিত ভুবন।
জন্মবলে নহে তব, পুষ্করে দুষ্কর তপে ব্রহ্মপদলাভ,
রাষ্ট্রজাতি নব নব যুগে-যুগে গড়ে তব তপের প্রভাব।
তব যোগভঙ্গফলে চতুঃষষ্টি-কলাশিশু জন্মে কালে কালে,
শিল্পি-শকুন্তেরা যারে বক্ষপুটে স্নেহসারে পক্ষছায়ে পালে।
প্রমূর্ত পুরুষকার, তোমার 'জৃম্ভক' আজো অশিবে তাড়ায়,
তব রাজ-পরীক্ষার বহ্নিকুণ্ড জ্বলে শত মণিকর্ণিকায়।
অভিশপ্তা মুক্তি লভে যজ্ঞদ্রোহী মহাহবে পুড়ে দলে দলে,
দেশবৈরী সৃষ্টিত্রাস মাতৃঘ্নের দর্পনাশ তোমারি কৌশলে।
আজো গায়ত্রীর সহ 'অতিবলা' বিদ্যা কহ তরুণ শ্রবণে,
'সত্য-শিব'—'শূর-সতী'—মিলনের প্রজাপতি রাজর্ষি-ভবনে

———

দুর্বাসা

কোথা যাজ্ঞিক, আজি আনমনে ভুলেছ নিত্যযাগ,
কোথা ঋত্বিক, করনি সাধন বিহিত কর্মভাগ,
কোথায় শিষ্য ভুলেছ ভাষ্য মাধবীর সৌরভে,
দুর্বাসা আসে দুর্বার বেগে, অবহিত হও সবে ।

কোথা ঋষিবালা পুষিছ পরাণে মোহারুণ কামনায়,
অতিথি আসিয়া ফিরে যায় তবু হয় না চেতনা তায়,
তরুলতাগুলি পায় নি পানীয়, হরিণী শষ্পদল,
দুর্বাসা আসে দুর্ভাষা মুখে, কোথায় পাদ্যজল ?

কোথা নরপতি লালসালালিত, পুষ্পবাটিকামাঝে
বিলাসে ব্যসনে আছ সারাবেলা হেলা করি রাজকাজে ?
কোথা শূরবর, ভুলেছ সমর প্রেয়সীর কর ধরি ?
দুর্বাসা আসে, দুর্বলচেতা ! জাগো মোহ পরিহরি' ।

ভুলি দেবদেবীপূজা, ব্রত, নিজ জনমের তিন ঋণ,
কোথা গৃহী হায় শফরীলীলায় বিলসিছ নিশিদিন ?
ভোগলালসার মোহে কে ভুলেছ গৃহলক্ষ্মীর ব্রত ?
দুর্বাসা আসে, নিজ সাধনায় হও সবে সংযত ।

আসিছে মূর্ত রুদ্রশাসন, ভ্রূকুটিকুটিল মুখ,
শিরে জটাবন, নয়নে দহন, শ্মশ্রুগহন বুক ।
সাধনার ভার বহ আপনার, মোহের আঁধার নাশি,
জাগ্রত রহ, উগ্র তাপস কখন পড়িবে আসি' ।

হা-ঘরে

হা-ঘরে ঐ ঘুরে বেড়ায় সঙ্গে ক'রে গৃহস্থালী,
জীবনজোড়া পুঁজি তাহার বাঁকঝুলানো দুটি ডালি,—
কোলের ছেলে, সাপের ঝাঁপি, ভাতের হাঁড়ি, মাটির থালা,
ডুগ্‌ডুগি আর তেলের চোঙা, সবুজ কাচের কণ্ঠমালা।
আশ্‌মানই তার ঘরের চালা রবিশশীর দেউটিজ্বলা,
মাঠ-মরু তার বাড়ীর উঠান, প্রমোদ-ভবন গাছের তলা।
ঝোপের ভিতর জন্ম তাহার, পান করে জল ঘাট আ-ঘাটে,
সেইখানে তার রাতের ডেরা যেথায় রবি বসেন পাটে।
কোনো রাজার নয়কো প্রজা দীনদুনিয়ার মালিক ছাড়া,
রয় না কারো মুখ চেয়ে সে, বেপরোয়া লক্ষ্যহারা,
আজকেরই তার মাত্র পুঁজি ভাবে না তা'ও কাল কি খাবে।
অশ্বমেধের অশ্বসম বিশ্বে আপন বশ্য ভাবে।
যায় না কোনো সদাব্রতে, চায় না কিছু দাতার ঘরে,
তরুতলের অতিথ গাঁয়ে, তাও শুধু এক তিথির তরে।
একটি দিবস গাছের ডালে ঝোলে তাহার ভাতের হাঁড়ি।
ছেলের দলে দেখ্‌তে জমে তারি সেই এক রাতের বাড়ী।
ভালুক তাহার হুকুম পেলে কোঁকোঁ করে জ্বরটি আনে,
সাপটি ফণা নত ক'রে লুকায় ঝাঁপির মধ্যখানে!
জীবিকা তার সাপখেলানো, নানানরকম বাজির খেলা,
মনে পড়ায় বাজির ছলে বিশ্ববাজিকরের মেলা।
কোনো শাসন রুক্ষ ভাষণ পারেনি তায় আনতে বাগে,
সকল আইন হদ্দ হয়ে হা'র মেনেছে তাহার আগে।
পথের সাথীর পতন দেখি থামে না সে যাত্রাপথে,
যুধিষ্ঠিরের মতন চলে নিরুদ্দেশে চরণ-রথে।

বিরহতপের শেষ

সেদিন ফাল্গুনে যবে মদকল পিকরবে
অরণ্য জাগিল, ত্যজি রেণুঘন শ্বাস,
রসাল-মুকুল-মূলে মল্লিকা বকুল ফুলে
ছুটিল করীর কুম্ভে মদিরা উচ্ছ্বাস,
সেদিন এলে না বঁধু, সুরভি করবীমধু
গড়ায়ে পড়িল ঝরি ধরণীর বুকে,
বনশ্রী-কপোল 'পরে বসন্তের বিম্বাধরে
চুম্বন উঠিল ফুটি অশোকে কিংশুকে !
তোমারি আশায় আমি খেলিনু এ অঙ্গে স্বামি
হোলীরঙ্গ দিবাযামী লাবণ্যের ফাগে,
যতনে জ্বালিনু দীপ, পরিনু রতনটিপ,
অধর করিনু রাঙা তাম্বূলের রাগে।
কুসুম-শয়ন পাতি' জাগিনু চাঁদিনী রাতি,
রাখিনু মালিকা গাঁথি নিচোল আঁচলে,
পল্লবিনী বল্লীসমা ফুল্লপীনা মনোরমা,
তরু-আলিঙ্গন মাগি লুটিনু ভূতলে।
যৌবনের ভরা কূলে উদ্বেল তরঙ্গ দুলে,
তনু রোমাঞ্চিত কেলি-কদম্বের প্রায়,
সেদিন এলে না প্রিয়, দেহকান্তি কমনীয়
হ'য়ে নীল হলাহল দহিল আমায়।

* * *

অকস্মাৎ এলে যবে, ভস্ম করি মনোভবে
পুন ধ্যাননিমীলিত রুদ্রের নয়ান,

জীর্ণ পর্ণে মর্মরিত বনহৃদি জর্জরিত
ঝলসিয়া শুষ্ক শার্ণ ধরার বয়ান।
শতগ্রন্থি বেশবাস, ধূসরিত কেশপাশ,
উড়ে যেন গৃধিনীর রুক্ষ পক্ষজাল।
যেন বেলা-বালুকায় নিদাঘতটিনী হায়
ধরি শুধু রাখিয়াছে করোটি কঙ্কাল।
তোমার করুণা লাগি বিরহ-যামিনী জাগি
অরুণ কোটরগত খঞ্জননয়ন।
আশাতৃষা রসাবেশ, ধূপায়িত, পাংশুশেষ,
অঙ্গার করেছে মর্ম মুমূর্র-দহন।
সহসা আসিলে বঁধু, মধুপর্কে নাই মধু,
নাহি কোনো আয়োজন ভাষায় ভূষণে,
গৃহে নাই দীপ জ্বালা গাঁথা নাই বনমালা,
নাহি রসগন্ধডালা তোমার তোষণে।

* * *

বিরহ-তপের শেষ, এস এস হৃদয়েশ,
এস নীলকণ্ঠ মোর, মন্মথমথন,
আজ ভস্ম সবি মম, দহনে উজ্জ্বলতম
শুধু বুকে রাজে প্রেম-হেম-সিংহাসন।

কল্যাণী

কথা তুমি কোন দিনই কহনিক অকারণ, দিয়াছ উত্তর
মিত ভাষে, স্মিতহাসে, প্রণয় প্রলাপে যবে হয়েছি মুখর।
পরম বাগ্মিতা ভরে জটিল সমস্যা যবে করেছি ব্যাখ্যান,
দিয়াছ সংযত কণ্ঠে একটি কথায় তার মন্ত্র-সমাধান।
শুনিনি করিতে তোমা হাস্য-পরিহাস কভু সখীজন সহ,
কখনো কাহারো সাথে কোন ছল অছিলাতে করনি কলহ!
কাহারেও কোন দিন হইয়া মমতাহীন করনি ভৎর্সনা,
নিন্দা শুনি হাসিয়াছ, পরনিন্দা কলঙ্কিত করেনি রসনা।
মুখ ফুটে কোন দিন আপনার সন্তানেও করনি সোহাগ,
মুখপানে চেয়ে চেয়ে বুলায়েছ অঙ্গে তার স্নেহ-অনুরাগ।
ব্যাধিত হয়েছি যবে করিয়াছি আর্তনাদ, হওনি অধীর,
বুলায়েছ পাণিখানি ভুলিয়াছি ব্যথা, তব অঙ্কে রাখি শির।
নিজে যবে রোগশয্যা গ্রহণ করেছ দেবি, রয়েছ নির্বাক,
চাওনিক পরিচর্যা, করেছ অসহ্য ব্যথা ধীরে পরিপাক।
কত দিন লাগিয়াছে বুঝিতে তোমারে, স্মরি আজি লজ্জা হয়,
ভালবাস' কি না বাস' কতবার মূঢ় মনে জেগেছে সংশয়।
তোমার তরল দৃষ্টি, তোমার সরল ভঙ্গী, স্নিগ্ধ স্পর্শখানি
একে একে ঘুচায়েছে সর্বদ্বিধা মুছায়েছে অন্তরের গ্লানি।
তব সেবা-শৃঙ্খলায় প্রসন্ন গভীর ধীর উদার সংযমে,
পরিচ্ছন্ন অবিলাসে ঘটাহীন বেশবাসে চিনিয়াছি ক্রমে।
ক্ষম সব পরমাদ চপলতা অপরাধ, হে মোর ইন্দ্রাণি,
ধন্য আমি তোমা সেবি, কারুণ্য-গম্ভীরা দেবি, হে সতি কল্যাণি।

———

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে

তোমার ফোঁটাটি বিনে
ললাট আমার করে হাহাকার আজি এই শুভদিনে।
এক পরিবারে তোমার আমার জন্ম হয়নি বটে,
পাইলাম তোমা জীবনধারার প্রভাত-শৈল-তটে।
জ্ঞাতিজাতিকুলে কোন যোগ-ডোরী ছিল না তোমার সাথে
তোমারি চিন্তা ললাটের তলে তবু জাগে আজ প্রাতে।
ছিলে—তুমি ত পাড়ার মেয়ে,
বাল্য-জীবনে কেবা ছিল তবু 'আপন' তোমার চেয়ে?

আজিকে তোমারে স্মরি
স্বপ্নে বিভোর দু'নয়ন মোর অশ্রুতে আসে ভরি।
তোমার সাথে যে মনে পড়ে মোর পল্লী-জীবনখানি,
হাসিভরা চোখে সঙ্গীরা পুন দেয় মোরে হাতসানি।
উপায় থাকিলে ফিরিয়া যেতাম মিলিতে তাদের সনে,
বটতরুমূলে, অজয়ের কূলে, সন্ধ্যার অঙ্গনে।
আজি—একটি ফোঁটার প্রীতি
জাগায় এ মনে গোটা পল্লী ও সারা বাল্যের স্মৃতি।

আজি হায় অকারণে
কত না তুচ্ছ বাল্যবিনোদ একে একে পড়ে মনে।
মনে পড়ে বুড়ী দিদিমার ঘরে কুলের আচার চুরি,
লাটায়ের সূতা তুমি মেজে দিতে আমি উড়াতাম ঘুড়ি।
পুতুলের বিয়ে ভেঙে দিয়েছিনু—সে দিন কী তব শোক!
মনে পড়ে সেই কাতর চাহনি তব ছলছল চোখ।

আমি—পাড়িতাম যবে ফল,
গাছের তলায় কুড়াইতে তুমি ভরিতে নালাঞ্চল।

টানিতে কুয়ার দড়ি
কত বার তুমি এলায়ে পড়েছ—আমি গিয়ে শেষে ধরি।
মনে পড়ে তব নোলক দুলায়ে মুখখানি ভার-করা,
বিজয়ার রাতে নমিতে আমায় হাসিয়া লুটায়ে পড়া।
প্রথম যেদিন রাঁধিতে শিখিলে আমারে খাওয়ালে ডেকে,
এক দিন পাকা নোনা আতা পেয়ে আনিলে আঁচলে ঢেকে
আরো—এমনি কতই ছবি
ললাটের তলে জাগে দলে দলে সহসা মুক্তি লভি।

সব চেয়ে পড়ে মনে,
আজিকার দিনে যে ফোঁটা কপালে দিতে চুয়া-চন্দনে
শুচিতায় ভরা নব বাস পরা এলায়ে আর্দ্র চুল,
ভঙ্গী তোমার মম শ্যামাঙ্গী পল্লীরই সমতুল।
নাহি তারল্য, নাহি চাপল্য, সহসা শান্তরূপ—
অন্তরে তব দহিত সুরভি কল্যাণকাম ধূপ—
তারি—ধূম-সৌরভ-ভার
ঘন হয়ে তব আঙুলে এ ভাল পরশিত তিনবার।

স্মরি যে ভগিনী মোর,
আমি যোগাতাম মালিকার ফুল তুমি যোগাইতে ডোর।
কোন ডোর আজি বাঁধে না তোমায় বাল্যজীবন সনে?
মুকুলের স্মৃতি একেবারে গেল পরিণত ফল-বনে?

সারা বৎসর ভুলে থাক বোন, ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই—
আজিকার দিনে স্মরিবে না—আরো ছিল যে একটি ভাই ?
এই—বারো বছরের সাথী
কেউ নয় তব ?—মিথ্যা স্বপ্ন বাল্যের খেলা-পাতি ?

এ কেমন বোন, রীতি,
গোত্র-বদলে ভুলে যেতে হবে মৈত্রী-লোকের প্রীতি ?
মিছে দ্বিধা ভয়—ভগিনী-হৃদয় হবে কি কঠোর অত ?
দুহিতারা তব মুকুলিত স্মৃতি জাগাইছে অবিরত।
যেখানেই থাক, দ্বার-দেহলীতে ফোঁটা দিও মোর নামে,
স্মরণ-সরণী ধরিয়া সে ফোঁটা পৌঁছিবে যথাধামে।
তব—চুয়ার পরশ স্মরি'
এ ললাট-মরু করে হাহাকার, হে স্বপ্ন-সহচরি !

———

গ্রাম-পথে

কোন' কাজে মন লাগে না, জ্বর আসে আজ কাজের নামে,
নগর ছেড়ে গেলাম চ'লে বেড়াতে তাই একটি গ্রামে।
পথে যেতে শুনতে পেলাম ছাতপিটানো ধ্বনির সাথে,
গলা ছেড়ে গান গেয়ে সব রাজ-রেজারা হর্ষে মাতে।
এগিয়ে যেতে ডাইনে দেখি ধুলোমাখা ক'জন কুলী,
'হেঁইয়ো জোয়ান' গান ক'রে কী ভারী জিনিস ঠেলছে তুলি'।
বাঁয়ে দেখি ঘাঘরা-পরা মেয়েগুলো ঘুরোয় জাঁতা,
গান ধরেছে সমস্বরে, তালে তালে দুলায় মাথা।
গঙ্গাতীরে এলাম ক্রমে দেখতে দেখতে কাণ্ড হেন,
ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে গায়ে মনটা হ'ল হাল্‌কা যেন।

নিলাম আসন ছইএর 'পরে তক্ষনি এক নৌকা ডেকে,
খেয়াল হ'ল আজ বিকালে ঘুরে আসি ফল্‌তা থেকে।
নেচে নেচে হেলে দুলে চলল সে না' নদীর 'পরে,
গান ধরিল মনের সুখে দাঁড়ি মাঝি সমস্বরে।
করাতীরা কাঠ চিরিছে নদীর ধারে গাছের তলে,
মনে হ'ল নাচছে তারা উল্লাসে কাঠ চেরার ছলে।
গ্রামে ঢুকেই দেখি কে ঐ নেচে নেচে সান্‌ছে কাদা,
নেইক শরম, পাঁচিল 'পরে হয়ত ব'সে হাস্‌ছে দাদা।
এগিয়ে গিয়ে ডাইনে দেখি, কামারশালে বাপবেটাতে
লোহা পেটায়, পেটাক তারা, নাচছে কেন মুগুর হাতে?
বাঁয়ে দেখি বেড়ার ফাঁকে নাচ্‌ছে বধূ ঢেঁকির 'পরে,
কাজ আজি তার লাজ হরেছে, গোট দোলে তায় তার কোমরে।
নাচের তালে বারবারই তার ঘোমটাখানি পড়ছে খ'সে,
পথের লোকে যাচ্ছে দেখে, শাশুড়ী তার সাম্‌নে ব'সে।
পথের বাঁকে দেখছি কাঁখে ভরা কলস কাঁকণ-বাজা
পল্লী-বধূ চলছে নেচে ঘোমটা মাথায়, দুলছে মাজা।
মাঠে গেলাম, সেথাও দেখি নেইক তফাৎ একটুখানি,
দুনীর 'পরে নাচ্‌ছে চাষী, সিনী হাতে তার কৃষাণী।
এ সব দেখে হ'ল মনে—কর্ম শুধু ঘর্ম তো নয়।
বিশ্বকর্মা বেজায় রসিক, তাঁয় বেরসিক মূর্খেরা কয়।
শ্রমের বুকে প্রেম নাচে গায়, কর্মেরো প্রাণ-ধর্ম আছে,
কেবলি সে ঘামায় না-ক, গাওয়ায় গাহে, নাচায় নাচে।
বিশাইঠাকুর, শুধাই তোমায়—সবার বেলায় রসিক হেন,
আমার কাজকে বেতালা আর বেসুরো হায় কর্‌লে কেন?

———

বল্লরী-কুসুম

মরণ-গৌরব

তপনের মত মোর সগৌরব মরণের লোভ,
ব্যোমলোক উজলিয়া সন্ধ্যারাগে হাসিতে হাসিতে,
এ ধরার পরমায়ু হোক ক্ষীণ,—তা'তে নাই ক্ষোভ,
হোক বিড়ম্বনা-ভোগ, বার বার যাইতে আসিতে।
চাহি না মরণ আমি, মহাকাল, চন্দ্রমার মত,
পক্ষ ধরি' বক্ষে ধরি' তিল তিল ক্ষয়ের যন্ত্রণা,
কি হবে জীবন দীর্ঘ যদি তাহা মেঘশয্যাগত ?
চাহি না ঘেরিয়া মোরে সারারাত তারার বন্দনা।

পুষ্পিত কাল

শতেক কিরণ-ধারায় ফুটিছে 'ঊষা' কমলের শতদলে,
সন্ধ্যামণির পীতিমায় ফুটে নিতি 'সায়াহ্ন' পরিমলে।
কুপিত অরুণ জবায় বিকশে 'মধ্য-দিবস' রাঙা হ'য়ে,
'সন্ধ্যা' ফুটিছে কুমুদের দলে জ্যোছনাগলানো সুধা ল'য়ে
আঁধার 'নিশীথ' বিকাশ লভিছে অপরাজিতায় থরে থরে,
'শেষ রজনী'র করুণ বিদায় বনশেফালিতে ফুটে ঝরে।
পুষ্পিত হয়ে চলিতেছে কাল ফুটিছে ঝরিছে ক্ষণে ক্ষণে,
আলো-আঁধারের লীলা চলে কিবা ফুলের সুপ্তিজাগরণে

সত্যসাধনা

সত্য, সাধনার ফল—তরুর রুধিরে পুষ্ট, কঠোর মধুর,
নহে সে অলস ফুল রঙীন কামনাকুল লতিকা-বধূর।
নহে কুলক্রমাগত, ছলজিত, বলহৃত রাজ-সিংহাসন,
ক্ষত-বক্ষে এ যে জয় হারাইয়া ধর্মরণে সন্ততি-স্বজন।

গিরি-গাত্রে স্বতঃস্রুত ঋতুর প্রভাবে দ্রুত উৎস-ধারা নয়,
এ যে খননের ফল, গভীর কূপের জল—অমল অক্ষয়।
শীতল চন্দ্রিকা নয়, এ যে দীর্ণ-ঘন-বক্ষে চপলা প্রখর,
স্নেহের আশিস্ নয়, কাননে কান্তারে তপে অর্জিত এ বর।

সঙ্গীত ও মাধুরী

শাখিশাখে পাখী গাহি' সুমধুর গান
ফলের সুরসে মাধুরী করিল দান।
কুসুমের বনে গাহি' গুঞ্জনে গীতি—
অলি ফুল-মধু মধুর করিছে নিতি।
গুন-গুন গানে গাহিয়া দোহন-কালে
গোপের দুহিতা গোরসে মাধুরী ঢালে
যুগ যুগ ধরি গাহিয়া প্রেমের সুর
করিয়াছে কবি প্রেমে এত সুমধুর।

শিশির

শিশির রে, তুই স্বপ্ন ক্ষণিক, আঁধারসাগর-সেঁচা মাণিক,
জহুরী—নয়ন এ মোর এ মন-বণিক তোর মাধুরী-শোভায় ধনী।
তৃণ-বালার নাকের নোলক, কিরণ-বালার মুকুর-ফলক,
সায়রে—কমলিনীর হাস্য-পুলক,—কুমুদিনীর অশ্রু-মণি।
অরুণ-বাজীর কেশর-ঝরা স্বেদকণা তুই তিতাস্ ধরা,
তমসায়—স্নানের পরে গড়িয়ে-পড়া উষাসতীর অলক-বারি।
জাগ্‌রে শিশির চোখের পাতায়, জাগ্‌রে আমার শোকের গাথায়
আমার এ—কল্পনাগের হাজার মাথায় সাজ্ রে তুই নিধির সারি।



শূন্যরথ

কোন’ সাধুর মুণ্ডিতশির, কারো বোঝাই জটে,
কেউ বা চলেন তীর্থ-পথে, কেউ বা থাকেন মঠে।
কেউ বা জপেন তস্‌বি মালা, কেউ বা জ্বালেন ধুনী,
তত্ত্ব-কথায় বাগ্মী কেহ, কেউ বা থাকেন মুনি।
কেউ বা বাঘা, কেউ বা নাগা, কারো হাজার চেলা,
সবই আছে, শূন্য কেবল পরম ধনের বেলা।
রথ চলেছে সমারোহে বাজছে শানাই ঢোল,
উড়ছে নিশান, বাজছে বিষাণ, উঠছে কলরোল,
হুলু দিয়ে পুরাঙ্গনা—লাজ বরিষে পথে,
কবীর বলেন, রথের ঠাকুর নেইক শুধু রথে।

অনুতাপ ও অশ্রু

যবে অনুতাপ সব গ্লানি পাপ করিল ভস্মচূর্ণ,
অশ্রু-গঙ্গা ভাসাইল তায় দূরদূরান্তে তূর্ণ।
অনুতাপ যবে হল-কর্ষণে কোমল করিল চিত্তে,
অশ্রু ভূষিল খর বর্ষণে শ্যামল-শস্য বিত্তে।
অনুতাপ যবে পাপেরে জিনিয়া ফিরিল শিবির-কক্ষে,
অশ্রুহীরক-বিজয়-মাল্য তুলিল তাহার বক্ষে।
নারায়ণ যবে অনুতাপরূপে অবতরিলেন মর্ত্তে,
লক্ষ্মী তখন অশ্রুধারায় মিলিলেন আঁখি-বর্ত্মে।

দূর্বা

অকিঞ্চন তুচ্ছ আমি, জনমেছি পদতলে ধরিত্রীর বুকে।
দাও সবে পদধূলি তৃণ-জন্ম ধন্য হোক, ম’রে যাই সুখে।
মম দৈন্যে ক্ষুণ্ন হ’য়ে কেন মোরে রচ’ বন্ধু অর্ঘ্য দেবতার ?
তৃণায়িত দাস্য আমি, কাড়িয়া লয়ো না মোর সেবা-অধিকার।

পাষাণ-বিগ্রহ-পা'য় নিগ্রহের বেদিকায় হব শুষ্ক মৃত ;
জীবনধাত্রীর গাত্রে অক্ষয় যৌবনসম আমি সঞ্জাবিত।
মন্দিরে পূজারীরূপে অভিমানে ভক্তিহারা যেন নাহি হই।
বিশ্বের সেবায় যেন জন্মে জন্মে যুগে যুগে শূদ্র হ'য়ে রই।

প্রকৃত অর্ঘ্য

এটা ওটা সেটা দিয়ে কত তুমি পূজিয়াছ তাঁয়।
কিছুই ছোঁন নি তিনি, অনাদরে সকলি শুকায়।
মধুগন্ধে জীবনেরে শত দলে কর বিকশিত,
পদ্মে পদ্মে পদ রাখি নামিবেন কমলাদয়িত।
'দিনু তোমা, লও' বলি কিছু তাঁরে হয়না ক' দিতে!
যা-কিছু সুন্দর সবি নৈবেদ্য তা' তাঁহার বেদীতে।
কলা মূলা ঘুষ দিয়া শ্রীধর কি পাইল চরণ ?
গৌরাঙ্গ পদে যে স্বতোনিবেদিত তাহার জীবন।

পলিত ও ললিত

"একে একে ক্রমে করেছে প্রয়াণ সকল সাথী।
শীতের শীতল সমীর কাঁপায় দিবস রাতি।
এখনো জীর্ণ পলিত শীর্ণ পর্ণ ওরে,
তরুর শাখায় রোস্ কি আশায় শুধাই তোরে ?"
"যে গেল সে যাক আমার এখনো আসে নি দিন,
বাকী আছে মোর শুধিতে এখনো ধরার ঋণ।
কচি কিসলয়ে আগুলি' রহিব দারুণ মাঘে,
ছায়াটুকু দিব, শিশিরে বাঁচাব ঝরার আগে।"

রৌদ্র রস

উগ্র ভানুর ময়ূখমালায় ঝলসিয়া পড়ে মহী,
একা ও রাজীব রয়েছে সজীব তীব্র দহন সহি।
চারিদিকে তার শীতল সলিল হিল্লোলি গায়ে পড়ে,
নলিনীপত্রে সতত পবন আদরে ব্যজন করে।
পঙ্ক যোগায় তারে প্রাণরস মৃণাল-ছিদ্র-পথে,
তবে সরসিজ সূর্যের তেজ স'য়ে রয় কোন' মতে।
এত রসময় জীবন যার সে রুদ্রে পূজিতে পারে,
রসভাণ্ডার ভরা যেথা সেথা সকল ব্যথাই হারে।

চারিটি উপমা

হাসিহীন মুখ যেন শশিহীন স-ঘন গগন,
গানহীন কণ্ঠ যেন মূক ম্লান কারার জীবন।
অশ্রুহীন দৃষ্টি যেন বৃষ্টিহীন ধূসর নিদাঘ,
দীর্ঘশ্বাসশূন্য হৃদি চিররুদ্ধ পঙ্কিল তড়াগ।

তপ ও জ্ঞান

মিলে হাসি-মুখ শত জনমের কত তপ-উপচয়ে,
মূঢ় সেই জন রূঢ় তপ যেবা করে তার বিনিময়ে।
সরল হৃদয় অগাধ জ্ঞানেরই পরম চরম দান,
পাপী সে, করে যে তার বিনিময়ে জটিলতা সন্ধান।

দেবতার মুক্তি

মানব মন্দির রচে শিলা দিয়া অনিন্দ্য সুন্দর ;
দেব-কারাগার, তায় বন্দী দেব ব্যথিত কাতর।
অশ্বত্থ মন্দির রচে বিদারি' সে দেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি, অঙ্কে লভে যোগ-নিদ্রাসুখ।

হাসির ফুল

শুভ্র ক্ষণিক মুখের হাসি, শিশির-ভেজা দ্রোণের রাশি,
বুকের হাসি, সজীব তাজা রাঙা কমল ফুলের রাজা।
সুখের হাসির কনক বরণ, চাঁপার মতন মনোহরণ,
দুখের হাসি অধর-পুটে অপ্‌রাজিতার মতন ফুটে।

জ্ঞান ও প্রেম

জ্ঞান, প্রেম, দুজনেই ত্যাগবীর, তপস্বী, বৈরাগী,
ঐহিকতা একেবারে ঘৃণ্য বলি' তবু নাহি মানে।
জ্ঞান বিশ্বামিত্রসম যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠার লাগি'
প্রেম কণ্বসম নিজ বুকে টানে পরের সন্তানে।

প্রকৃত লক্ষণ

মুখ হাসে যাতে, হাসে না দু' চোখ, তার নাম নয় হাসি।
বুক না কাঁদিলে হয় কি কান্না, চোখে শুধু জলরাশি ?
হয় না কণ্ঠ গাহিলেই গান না-ই গায় যদি প্রাণ,
আত্মা না দিলে শুধু হাতে-করে-দেওয়ারে বলি না দান।

বল্মীক

দিন কি ফুরায় তার সাহিত্যে যা হয়েছে অমর ?
জাতির জীবনে যোগ তার সাথে শোণিতে মজ্জায়।
সাহিত্যে শফরীলীলা চলে যবে সারা দেশময়
লুপ্ত তারা হয় না ত'। মুখ ঢাকে কেবল লজ্জায়।
এদেশেই চিরদিন অভ্র ভেদি' জাগে হিমাচল ;
সহ্যাদ্রি, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য তুলে শির তবু নীলাকাশে।

'তাদের ফুরাল দিন'—কয় উচ্চে বল্মীকের দল
মাথা তুলি' যত দিন গ্রীষ্মশেষে বরষা না আসে।

প্রাণ-বহ্নি

বহ্নিরে এ দেহ মাঝে করিয়াছি রোধ,
আহুতি যোগাই আমি তারে।
যে দিন সে মুক্তি পাবে লবে প্রতিশোধ,
সে দিন সে দহিবে আমারে।
বহ্নির এ বন্দিদশা তারই নাম বাঁচা,
তার মুক্তি-রণ,—ব্যাধি-জরা,
একদিন জয়ী হয়ে ভাঙিয়া সে খাঁচা
পুড়াইবে, তারি নাম মরা।

জীবনে ও মরণে

এ-পারে মরুভূ ধূ ধূ চরণ দহিছে শুধু ঈর্ষ্যা-সিকতায়,
যশ হেথা লুব্ধ ক'রে শেষে হায় ক্ষুব্ধ করে মৃগতৃষ্ণিকায়।
পরপারে স্মৃতিরূপে রচে যশ শ্রদ্ধাধূপে ধূম্র মেঘমায়া,
কূজন গুঞ্জন স্তবে ভোগ্যফলে পুষ্পাসবে ঋদ্ধ বনচ্ছায়া।

নামহারা

নমি সেই রস-শিল্পিগণেরে সৃষ্টির যারা চায় নি দাম।
প্রাণের আবেগে করেছে রচনা তায় দেগে রেখে যায় নি নাম।
সৃজন করার বিজনানন্দে গণিয়াছে তারা পুরস্কার,
রহি অখ্যাত রহি অজ্ঞাত বহি অজ্ঞাতে বেদনাভার।
সর্ব অঙ্গে বহি' নামাবলী কত না সৃষ্টি লুপ্তি পায়।
নামহারা হয়ে তাদের সৃষ্টি অমর হইয়া আছে ধরায়।

স্থষ্টি তাদের জীবনচরিত, স্থষ্টিরই মাঝে বিরাজে তারা।
নাম অনিত্য, যেই নামে ডাকো সেই নামে তারা দিবে যে সাড়া।

পূরা মৃত্যু

দিনগুলি ধীরে ধীরে অস্তাচলে যায় ফিরে
পদচিহ্ন রেখে যায় মোর চিত্ততটে,
সে পদাঙ্ক, চন্দ্রিকায় কুমুদ হইয়া ভায়
দোলায় তা সন্ধ্যাবধূ ঢেউ তুলি ঘটে।
মধুগন্ধানন্দময় ছন্দে গাঁথা হ'য়ে রয়,
জানি তাই—পূরা মৃত্যু হবে না মরণে।
সেগুলি ডুবিবে যবে পূরাপূরি মৃত্যু হবে
ইহধামে বাঁচিব না কাহারো স্মরণে।

বুদ্বুদ

কাল-তটিনীর বুকে বুদ্বুদ জেগে চির দিন পায় বিলয়।
তাহাদের এই বিম্বজীবন একটি পলেরই অভ্যুদয়।
সেটুকুও ত্বর সহে না হায়রে একে আরে শুধু আঘাত হানে,
যেই পরিণামে নেই বিলম্ব তারেও বিম্ব আগায়ে আনে।
বিম্বিত যাতে রবির কিরণ দম্ভ তাহারও অল্প নয়,
ভাবে সে বিম্ব হইয়াছে যেন কনক-ডিম্ব জ্যোতির্ময়।

চারি চোখে

আজি বসন্তে ফুটেছে কুঞ্জে কত মঞ্জুল ফুল,
কচি কচি পাতা দুলাইছে মাথা, গুঞ্জরে অলিকুল।
যেন সুষমার হাট ব'সে গেছে নিকুঞ্জবনময়,
দুই চোখে শুধু ভুঞ্জিলে এর মর্যাদা-হানি হয়।

চারি চোখে পাশাপাশি
না দেখিলে তায় মাধুরী হারায় অপূর্ব শোভারাশি।
প্রকৃতির গৃহে এত শত আয়োজন,
প্রেম বিনা হায় সকলি বিফল সকলি দুঃস্বপন।

দীপ

বিধাতা জ্বালেন দীপ গগন ভরিয়া নিত্য
শুধু গৃহহারাদের তরে।
গৃহীদের তরে তাই মোদেরি জ্বালিতে হয়
আঁধারের দীপ ঘরে ঘরে।
বার বার সেই দীপ নিভাইয়া দিয়া তিনি
ডাক দেন গৃহাসক্ত জনে।
আকাশের দীপান্বিতা- মহোৎসবে দিতে যোগ
মুক্তিলোকে বিশ্বের প্রাঙ্গণে।

ফুল ও ফল

ফুল যে আমি ফুটায়ে যাই মনের আনন্দে
ফল যে তাতে ধর্‌বে তা কি জানি ?
ফলের আশায় ফুটাই না ফুল রসের বসন্তে,
ফলের লোভে বাড়াই না তাই পাণি।
ফল না পেয়ে তাইত' এ প্রাণ হয় না অশান্ত,
জানি,—ফলে নেইক অধিকার।
গীতের কুসুম ফুটানো যার ব্রতই একান্ত,
গীতায় প্রয়োজন কি আছে তার ?

সত্যের প্রকাশ

আকাশের সত্যরূপ ঢেকে রাখে রবির কিরণ,
রজনীর অন্ধকার প্রকাশিত করে তা ভুবনে।
মনের গভীর সত্য চেতনা করে যা আবরণ
স্বপ্নের তামস করে অবারিত তারে এ জীবনে।
জ্ঞানে যারে পাই না-ক, যা হারাই, ধ্যানে পাই তারে।
দিবসে পাই না যারে, পাই তারে রাতের আঁধারে।

অনুযোগ

ভীতি-বেদনায় ভরা এ ধরায় আমাদের চারি পাশ,
আকাশেই ছিল চোখ জুড়াবার সান্ত্বনা আশ্বাস।
উদার বিশাল সেই আকাশেও উড়ো-বিভীষিকা চরে,
নর-দানবেরা সেখান হতেও মরণ বৃষ্টি করে।
হায় গো বিধাতা, কেমনে সহিছ, কেমনে ধৈর্য ধরো ?
একে একে সব অধিকার ছাড়ি' দানবে করিবে বড় ?

শাপে বর

নৃত্যে তব তালভঙ্গ, সুরচ্যুতি হয় তব গানে,
দেবতারা ক্ষমা নাহি জানে।
তাই তুমি পেয়ে শাপ হয়েছ ধরার,
নতুবা রহিতে তুমি চিরদিন ভোগ্য দেবতার।
কন্যা হ'য়ে পাইতে না ধরা-মা'র স্নেহ আশীর্বাদ
জায়া হয়ে পাইতে না প্রেমঘন জীবনের স্বাদ।

ব্রজবেণু

রাখাল, তোমার বেণু আজো বাজে অনুখন,
যে শোনে শিহরি উঠে তার সারা তনুমন।
কালিনী উজান চলে,
কঠিন পাষাণ গলে,
চঞ্চল হয়ে টলে ভূধরের অণুকণ।

সেই বেণুতান শুনে আজো চলে অভিসারে,
পাগলিনী যত রাধা কোন বাধা না বিচারে।
ধায় তব বেণুরবে
গোষ্ঠের ধেনু সবে
আজো তব বেণু বাজে অন্তর দ্রবিবারে।

শিহরিয়া উঠে তরু তাই ফুটে কলিফুল,
বেণুতান শুনে তাতে তাই মাতে অলিকুল।
নদীরে সিন্ধু টানে,
ধায় সে বন্ধু পানে,—
গৃহী ত্যজে সংসার, মোরা তায় বলি ভুল।

তব বেণু বেজে চলে, শুনিতে কি সবে চায়?
যদি শোনে, গৃহকোণে মন বসে তবে তায়?
পাছে পশে গিয়ে তান
রোধে তূলা দিয়ে কান,
কান খাড়া ক'রে আছে ক'জনে এ ভবে হায়?

পুরাকথা

আজিকে বাহুপাশে রহিয়া রসরাজ মনে যে পড়ে সেই কথাটি—
কেমনে লুকাতাম কিশোরী-হৃদয়ের গোপন স্বপনের ব্যথাটি।
সেটা কি আজ বঁধু? করিল বেণুতান
কানের মাঝে পশি' মরমে অভিযান,
তখনি করেছিনু এ নারী-হৃদি দান, সে কথা বুঝনি কি দয়িত?
বুঝনি, বুঝাতে সে প্রাণের আকু-বাকু কেমনে এ হৃদয় সহিত?

কিশোরী-হৃদিখানি শরৎনিশীথের আফোটা কমলের কলিটি,
মর্মকোষে জাগে গন্ধ মধুরস আসিতে বাকি শুধু অলিটি!
নদীটি উছলিলে হৃদিটি উছলিত,
নীপের সহ দেহে তখনি কাঁটা দিত,
চকোরী তখনি ত গোপনে সুধা পি'ত স্বপনহারা চোখে জাগিয়া,
তোমায় লুকাবার ছিল না ছলনা তা তোমাকে জানাবারি লাগিয়া

বুঝনি তুমি বঁধু যমুনাঘাট থেকে হইত কেন দেরী ফিরিতে?
কেন না ফিরিতাম না হেরি গোঠ হ'তে গোধনে গ্রামপথে ভিড়িতে?
যমুনাতীরে যদি করিতে তুমি কেলি,
গাগরী মাঝজলে দিতাম কেন ঠেলি?
সে-শুধু তুমি দেখি পাঁচনি-বেণু ফেলি, আনিয়া দিবে বলি সাঁতারি।
নূপুর হারানোর ছলনা করি' কেন প্রহর কাটাতাম হাতাড়ি'?

যূথীর শাখা হ'তে কুসুম তুলিবার শকতি ছিলনাক যেন বা।
গোকুলে কেহ কি-হে ছিল না ডাকিবার, তোমারে ডাকাতাম কেন বা?
যাইতে পাশ দিয়ে বিঁধিত কাঁটা পায়,
বেতের ডালে শাড়ী বাধিত কেন হায়?

সাম্‌লে চলিবার ছিল ত বাসনাই, সমুখে আলু থালু তবু যে,
না বুঝে' থাক যদি আঙুল দিয়ে চোখে কে পারে বুঝাইতে অবুঝে ?

বুক যে ফেটে যায়, মুখ ত ফুটেনাক, এমনি কিশোরীর পীরিতি।
অবোধ গোপসুত হয়ত জানন সেগোপন পীরিতির কী রীতি।
দীর্ঘ শ্বাস ফেলা, যায় তা' শোনা পাছে,
ফেলিতে হেরিতাম কেহ কি কাছে আছে ?
চাপিয়া রাখিবারে এ তনু কাঁপিয়াছে, ফুঁপায়ে গুমরেছে হৃদি এ।
জীবন এইভাবে গোঁয়ানো কি কঠিন বুঝাবো আজ তাহা কি দিয়ে ?

বুঝনি এত কথা, আঁখির মুখরতা ? আছিলে নির্বোধ এত কি ?
গন্ধে বুঝনি কি গোপনে ফুটেছিল গুমরি' কাঁটাবনে কেতকী ?
ব্যাজের আবরণে লাজের আভরণে,
ঢাকা ত' পড়েনিক ছিল যা প্রাণে মনে,
ছিল না সংশয় কিশোরী বধূজনে, মূঢ়েরা তার কী বা বুঝিবে ?
তুমি না বুঝে থাক যদি তা, তবে সেই ব্যথা ত' জীবনে না ঘুচিবে

ব্রজের পথে মীরাবাই

কে অই তরুণী হিরণবরণী নেচে নেচে গেয়ে যায় চ'লে
আলুথালু কেশ, ধূলিমাখা বেশ, জল ঝরে দুই আঁখি গ'লে,
'জয় গিরিধর লাল' ব'লে ?
পথের পাথরে কাঁটায় কাঁকরে রুধিরের ধারা পায়ে ঝরে,
শ্যামপীরিতির রাঙা স্মিরিতির বিজয়-চিহ্ন পথ 'পরে
এঁকে যায় তায় অকাতরে।

তার মুকুতার কণ্ঠের হার পথ-কুত্তার গলে দোলে,
ভিখারীরে ছুঁড়ি' দেয় অঙ্গুরী অনাথ ছেলেরে তোলে কোলে,
'মেরা শামলিয়া ধন',—ব'লে।
নবনী-কায়ায় লাবণি গড়ায় অবনীর গায় বেয়ে বেয়ে,
হের পথখেদে তনু ভরে স্বেদে, কার বধূ—ও সে কার মেয়ে ?
নেচে নেচে চলে গান গেয়ে ?
সোনার স্বপন কাহার এমন ঘরছাড়া কোন্ মনোদুখে ?
আপনার জেনে সাথে লয় টেনে যত মুসাফির ভিক্ষুকে,
হরিনাম-সুধা দেয় মুখে।
পিছে যারা যাস্ কেন না ফেরাস্, কেঁদে কেঁদে ধাস্ সাথে সাথে,
রূপযৌবন-ভরা তনু মন প'ড়ে যাবে কোন্ পাপহাতে—
কোন্ পিশাচের লালসাতে !
একি কথা শুনি ? দেওয়ানী তরুণী চিতোরের রাণী পথে ফিরে ?
জানিব কি ক'রে ? কে আছে চিতোরে হেরেছে ও-রাজমহিষীরে,
তপনও যাহারে হেরে নি-রে ?
একি অপরূপ, চিতোরের ভূপ, যার দাপে কাঁপে সারাদেশ,
ত্যজি' রাজধানী, তার মহারাণী পথে পথে আলু-থালু বেশ,
কেশরী কি আজ হলো মেষ ?
কি বলিছ ?—"যার দীনদুনিয়ার মালিকের ডাক পশে কানে
নরের ক্ষমতা ঘরের মমতা রাজার ভ্রূকুটি সে কি মানে ?
রাজার রাজা যে তারে টানে।
"পতিতপাবনে যেবা পতি গণে নরপতি-পতি হায় তারে
দিয়ে কোন্ ধন ভুলাবে হিরণ-শৃঙ্খলে ইহ-সংসারে,
লালসা-বিলাস-কারাগারে ?
"দুনিয়ার রাজা দিবে কোন্ সাজা সঁপেছে যে প্রাণ হরিপদে,
হরিশরণার কে করে বিচার কেবা আছে রাজ-পরিষদে ?
কে হেন দানব মোহমদে ?

"সেই একবার অনলে সীতার শুদ্ধি রটিল চরাচরে,
নদীমাঝে পশি এ সতী তাপসী বারিপরীক্ষা উত্তরে,
সীতা বুঝি মীরা রূপ ধরে!
শ্যামজলধরে যে সদা বিহরে সে তড়িতে কেবা রোধে ঘরে?
গঙ্গাধারারে সুর-গজ পারে রুধিতে কি ভীম কলেবরে?
পাথারে কে বালুবাঁধ গড়ে?

যাহারে অমৃত করেছে তৃষিত সেকি তিরপিত সীধু-পানে?
যে পথে ছুটিলে সে অমৃত মিলে মৈত্রেয়ী সন্ধান জানে,
সেই পথই তারে সদা টানে!
পাষাণ-প্রাচীর পরিখা গভীর কোন সে গণ্ডী তারে বাঁধে?
বাঁশরীর রব ভাঙি বাধা সব পথ রচি' তারে নিতি সাধে,
'এস মধুবনে, এস রাধে।'

দাদুরীর রূপে সেকি রহে কূপে যারে ডাকে প্রেম-পারাবার?
মাধুরী-তুফান,—তটিনী-নিপান-গোষ্পদে করে একাকার,
ভাঙে অন্দর ঘর-বা'র।
বিপদবারণ যাহার শরণ বিপদই তাহারে করে ভয়,
লজ্জাবারণে ভক্ত-তারণে হরি তার কাছে কাছে রয়,
দুঃশাসনের কোথা জয়?

ভজনের গানে পাষাণেরো প্রাণে প্রেমমধু-মঞ্জরী জাগে,
সংযমহারা কামপশু যারা মাতৃমমতা ভিখ্ মাগে,
ভীরু বল পায়, ভূত ভাগে।
কুম্ভরাজের কুম্ভের মাঝে কেমনে র'বে সে চিরতরে?
বাষ্পীয় রূপে সে যে চুপে চুপে মিলিবে শ্যামল নীরধরে,
প্রেম অভিসারে কারে ডরে?"

শ্লথবেশবাসে কভু আশে পাশে না চেয়ে কে ওই যায় চ'লে,
কায়ার বাঁধন মায়ার কাঁদন কুল লাজ ধন পায় দ'লে,
'জয় কান্হাইয়া লাল' ব'লে ?
রাজসেনাগণ যত পুরজন দাঁড়ায় দু'ধারে জোড়হাতে,
'ফির মাগো' বলি' প্রজামণ্ডলী কেঁদে কেঁদে চলে সাথে সাথে,
পথ ভাসে প্রেম-দরিয়াতে।

প্রেমের পাথার মেবার পাহাড় মরু-মারবার ডুবাল রে,
শিলা পড়ে ধ্ব'সে ডুবে লীলারসে। মীন হয়ে তায় খেলা করে
রণবীরগণ প্রেমভরে।
ভাঙি' করবাল গড়ি' করতাল মেবারীরা মাতে নাম-গানে,
জয়ঢক্কারে রণডঙ্কারে করি' মৃদঙ্গ কর হানে,
তাণ্ডব তারা খুবই জানে।

অঙ্গারে হীরা,—হে জননি মীরা, বঙ্গের কবি গাহে জয়,
বঙ্গভূমির কেহ নহ তুমি এ কথা ত' মনে নাহি লয়,
চিনি-চিনি তোমা মনে হয়।
পদ্মাবতীর ভক্তপতির পীরিতি কি তুমি স্ত্রী-আকারে ?
রাধাগোবিন্দ-পদারবিন্দে 'রাগগোবিন্দ' গাহিবারে—
কবি-দম্পতী একাধারে ?

তুমি জানো, 'বিনা প্রেমসে মিলে না নন্দদুলাল-পদতরী',
তনুধনজনে বিদ্যাবচনে মিলে না পারের খেয়া-কড়ি,
তাই কি মা করো মাধুকরী ?
শ্যামলায়মান মরু-.ম প্রাণ, শ্যামের চরণ তায় আঁকা,
রঞ্জোর পায় হেম-বেদিকায় প্রেম-মঞ্জরী-রেণুমাখা
কুম্ভের বুকে চূতশাখা।

জবাবনছায় তুলসীর প্রায় মুকুলিত হরি-উপাসনা,
কঠোর দারুর বীণায় মধুর তুমি হরিনাম-মূরছনা,
মরু-বালুকায় হেমকণা।
মিছা কলঙ্ক কুযশ পঙ্ক ধরিয়াছ দেবি শির 'পরে,
পতির পীরিতি রাজকুলনীতি লাজমানরীতি অনাদরে
ত্যজিয়াছ সবি অকাতরে।
কানু-কানু ব'লে পাগলিনী হ'লে বাধা-বন্ধন মানো নাই,
ব্রজরাধিকাতে, হে মীরা, তোমাতে কোন' ভেদ খুঁজে নাহি পাই,
মীরাবাই—তুমি **মীরা-রাই**।

আড়ি

তোর সাথে ভাই করেছি কানাই আড়াআড়ি,
দেখিলে যে তোরে মুখখানি করি ভারি-ভারি,
অন্য পথে যে ছুটে চলে যাই তাড়াতাড়ি
পাছে তোর সনে দেখা হয় মুখোমুখি।

যাই না ক'দিন আর যশোমতী মা'র ঘরে
রাত পোহালেই গোঠে যেতে ডাকিবার তরে,
দিইনাক' যোগ মিছে অভিমান রাগভরে
গোঠের খেলায়, দূর হ'তে দিই উঁকি।

বাঁশরীর ডাক শুনে আসিনাক তোর পাশে
যমুনায় জলকেলি-বিহারের অভিলাষে,
কথা কহেছিস কতবার রস-পরিহাসে
জবাব না দিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছি আঁখি

ফেটে যায় বুক মুখ ফুটে কিছু নাই বলি,
গুমরি গুমরি অনুতাপে মরি জ্বলি' জ্বলি',
উঠে থাকি থাকি ক্ষোভে দুটি আঁখি ছলছলি',
হোলী এলো আর কেমন করিয়া থাকি।

দেখিলাম তাই তুই ছাড়া ভাই প্রতিপল
এ জীবনে তার তুষানলে পাই প্রতিফল,
দূর্বাকোমল নীপবন-তল নদী-জল
কোনোখানে হায় প্রাণ না জুড়ায় ভাই।

অভিমানে-গড়া নিগড় এ যেন পা'য় বাঁধা,
নিজহাতে-রচা কারাগারে ব'সে হায় কাঁদা,
আপনার 'পরে ঢের হলো ভাই বাদসাধা,
এমন অভাগা ত্রিভুবনে কেহ নাই।

একা-একা আড়ি কত করি ? এবে প্রাণ যায়,
ফাগুন দিনের হয়ে আসে অবসান হায়,
কথা নাই হোক—বুকে তুই ভাই ফিরে আয়,
বুক না জুড়ায়ে থাকিতে যে আর নারি।

সব অভিমান রাগ রোষ দ্বেষ ভুল চুকে
ডুবাইব তোর দোললীলা-রস-কৌতুকে,
দোলের আগে যে চাঁচর জ্বলে এ পোড়া বুকে,
নয়নে আমার ভরা আছে পিচ্‌কারি।

সখার দাবি

এই গোকুলে ভাসিয়ে দিয়ে অকূল পাথারে
কোন্ প্রবাসে থাকবে এরে ভুলে ?
মাঝ-যমুনায় নিয়ে মোদের, একলা সাঁতারে'
ভাব্‌ছ, কপট, উঠবে গিয়ে কূলে ?

তোমার সাধের ধেনুগুলি মোদের কাছে ফেলি'
ভাব্‌ছ বুঝি পালাবে আর-পারে ?
সুরু ক'রে মোদের সাথে লুকোচুরির কেলি
ভাব্‌ছ বুঝি লুকাবে একবারে ?

তা হবে না, তা হবে না, বাঁধ্‌রে সুবল, বাঁধ্,
বাঁধ কটি ওর দিয়ে ছাঁদন-দড়া,
রাখ রে নজরবন্দী, চিনি ফন্দীবাজের ফাঁদ,
গাঁটছড়া বাঁধ্—ধড়ার সাথে ধড়া।

শেষ-নাগাদ্ ও'র খেল্‌তে হবে, সইব না তার হেলা,
মানতে হবে রাখালী সওবৎ।
ফিরতে হবে ধেনুর সাথেই সেই গোধূলির বেলা
মা-যশোদা থাকুন চেয়ে পথ।

ননী ছানার ছড়াছড়ি তাহার ঘরে দ্বারে,
সোণার থালে খায় সে মিঠাই ফল,
বন্য ফলের অংশ তবু নিতেই হবে তারে
আঁজলা ভ'রে পি'তেই হবে জল।

সইতে হবে বটের ছায়ায় দূর্বা-ঘাসেই শোওয়া,
হাতের 'পরেই রাখতে হবে মাথা,
থাকুক ঘরে সোণার খাটে দুধের ফেনায় ধোওয়া
ননীর মতন কোমল শয়ন পাতা।

তা না হ'লে—থাক্‌লো প'ড়ে গোষ্ঠলীলা তার
ব'য়ে গেছে,—দায় পড়েছে ভারি!
রইবে কে তার গোধন নিয়ে, বইবে কে তার ভার?
সইবে কে তার কেবল হুকুম-জারি?

রাজ্য তাহার থাক্‌বে পড়ে, নিজে রাখালরাজ
ফাঁকি দিয়ে পালায় যদি দূরে,
তারই গোকুল, তারই গো-কুল, ব্রজের সকল কাজ
তারেই নিয়ে, সেই ত জীবন জুড়ে'।

দূরের কৃষ্ণে চিনিনা ভাই,—বুকের কৃষ্ণে মানি,
না পেলে তায় আমরা বিদায় লই,
আর কিছু না পারি, জলে ঝাঁপ দিতে ত জানি,
কালীদহেও জল আছে অথই।



মানিনী

(গান)

মান ক'রে যে বসলে হঠাৎ ভামিনি !
বিফলে যায় পৌর্ণমাসীর স্বর্ণময়ী যামিনী ।
মনস্তাপে অরুণ আঁখি
প্রাণটুকু ত্যাগ করতে বাকী,
দক্ষমুনির যজ্ঞে যেন ক্ষুব্ধা শিব-কামিনী ।

ত্বরিত করে ফেল্‌তে ছুড়ে খুল্‌তে গেলে মণির মালা,
কবরীতে আট্‌কে গেল চুলের ফাঁসে, হায় কি জ্বালা !
মাণিক শোভে মৌলি 'পরে
নিশ্বাসে বিষ উষ্মা ক্ষরে,
রোষোদ্ধত ফণায় যেন উপদ্রুতা ফণিনী ।
ভীষণ মানে বস্‌লে অভিমানিনি ॥

হ'য়ে যে মূক রই'লে বিমুখ মুখের 'পরে ঘোমটা টানি,
আঁচল টেনে নিচোল দিয়ে আবরিলে বক্ষখানি ।
পর হলো যে তাহার পাশে
স্বতই দ্বিধালজ্জা আসে,
মধুব্রতে শাস্তি দিতে বিগুণ্ঠিতা নলিনী ।
বিষম মানে বস্‌লে বনমালিনি ॥

সাধের রচা বিনোদবেণী অভিমানে ফেল্লে খুলে,
গাত্রভরা পত্রলেখা স্বেদের জলে সব যে ধুলে ।
ভ্রূভঙ্গে যে শঙ্কা লাগে
অপাঙ্গে যে বজ্র জাগে,
দৃষ্টি যেন বৃষ্টিভরা গহন মেঘের দামিনী ।
দুর্জেয় যে মানটি তোমার ভামিনি ॥

কুণ্ঠাহরণ

(গান)

কুণ্ঠা কিসের বঁধু ?
জ্বালা ভুলায় তোমার প্রেমের মৌচাকের ঐ মধু
বজ্রঘন শ্যামজলধর
তোমার তরল শীতল আদর
সইতে যদি না পারি তো বৃথাই নারীর প্রাণ ।
সুখের কুসুম-শয্যা 'পরি
মধুরাতে শয়ন করি'
একটি কিনা কাঁটার লাগি করব অভিমান ?

আত্মহারা সোহাগ সহি,
অঙ্গে তারে গর্বে বহি
শ্রী-বসন্তে আধফুটন্ত পলাশ-কলির দ্যুতি ।
গণ্ডে ঠোঁটে দিলে এঁকে
চুম্বনে তার, চিহ্ন রেখে
ক্ষণে ক্ষণে স্মরায় সে মোর রঙ্গ-অনুভূতি ।
নিবিড় বাহু-বাঁধন-ঠাঁয়ে
অঙ্কুরিছে পুলক গায়ে,
সফল হলো বেণীর লতা শিথিল হ'য়ে খুলে,
চোখে প্রেমের উন্মাদনা
সঞ্চারিল নীহারকণা,
বিজয়িনীর জয়মালিকায় মুক্তা হ'য়ে দুলে ।
কুণ্ঠা কেন প্রিয় ?
জীবন মথি' প্রেমের সুধা এম্‌নি ক'রেই দিও ।

প্রতীক্ষায়

কুঞ্জে আসিবে ব'লে দিয়াছিলে ভরসা,
ডরিনিকো গুরুজন ত্বরুযোগী বরষা,
অবিরল ধারাবারি তিতায়েছে নীলশাড়ী,
নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' কাঁপি শীতবায়ে অবশা।
কুঞ্জে আসিবে বলি'—মিছে দিলে ভরসা।

লাক্ষা গিয়াছে পায়ে পথজলে মুছিয়া,
ভক্তি-রচনা দেহে গেছে সব ঘুচিয়া।
কবরী ভিজিয়া খুলে আলুলিয়া পিঠে দুলে,
নূপুর হারালো কোথা দেখিনি তা খুঁজিয়া।
লাক্ষা গিয়াছে, যাক—পথজলে মুছিয়া।

যার লাগি আয়োজন সে যখন এল'না,
যাক্ সবি—দূরে যাক নাই তায় বেদনা।
এলেনাক' আশা দিয়া! ফণা তুলে ফোঁসে হিয়া,
তব শঠতার ব্রজে নাহি হেরি তুলনা,
অবলা ললনা লয়ে একী তব ছলনা!

এ বেতসী-লতাগৃহে সারা রাতি জাগিয়া,
দুরু-দুরু বুকে আছি দরশন মাগিয়া,
খগ-মৃগ-বিচরণে চাহি সচকিত মনে,
সারা দেহ শ্রুতিময় হ'লো তোমা লাগিয়া।
নাহি দয়া, অসহায়া মরি নিশি জাগিয়া।

কীচক-বনের তানে ভাবিয়াছি মুরলী,
কলাপীরে 'তুমি' বলি ভুলাইল বিজলী।
কতবার ক্ষণতরে হরষিত অন্তরে
ছুটে যেতে ব্যথা শুধু উঠিয়াছে উছলি',
নিভিবার আগে দীপ উঠে যথা উজলি'।

স্মরো দেখি একবার আঁধিয়ার রজনী,
শ্বাপদ-ভীষণা শত আপদের জননী।
স্মরো দেখি ঘন বন অশনির গরজন,
তস্করো সাধেনাক' দুষ্কর এমনি,
তুলিলে পিশাচী করি ছি, ছি—আমি রমণী।

ঝিল্লী-দাদুরীগণ টিট্‌কারী বরষে,
ফুল-শেজে ফুলগুলি অনাদরে ঝলসে।
চরণ ভাঙিয়া পড়ে, কেমনে ফিরিব ঘরে?
ছিঁড়ে ফেলি মণিহার—ফণিহার—উরসে।
অনিবার জ্বলে বুক যার বিষ-পরশে।

সেজে গুজে আসি যবে করি মনে ভরসা
হতাশায় পিপাসায় কর' তুমি বিবশা।
দীনবেশে নানা কাজে রহি যবে গৃহমাঝে,
ত্বরিত তড়িৎসম ডাক দাও সহসা,
তোমার আহুতি যেন শরতের বরষা।



ঋতুলক্ষ্মী

নিদাঘে তোমার রুদ্রাণীরূপ, ইন্দ্রাণী বরষায়,
শরতে শুভ্রা শাশ্বতী বাণী, ভাস্বর তব কায়।
শ্যাম হেমন্তে কল্যাণী রমা, অন্নপূর্ণা শীতে,
প্রেম-বসন্তে ফুলধনু রচ' রতিরূপে অটবীতে।
এক চোখে হাসি, আর চোখে ধারা, মেঘে শ্লথ তব বেণী,
অশেষ শ্যামল বাসবিস্তারে শ্যামলা যাজ্ঞসেনী।

পদাঘাত তব, শুষ্কশাখায় অশোকের বিকাশক,
সীধু-গণ্ডূষে বকুল বিলসে, আশ্লেষে কুরবক।
পরশে তোমার ফুটে প্রিয়ঙ্গু, মন্দার মধুভাষে,
বদনমারুতে চূতমঞ্জরী, চম্পক মৃদু হাসে;
সঙ্গীতরসে নমেরু বিকসে—নটনে কর্ণিকার,
তিলক কুসুম পুলকে শিহরে—দৃষ্টির উপহার।

হস্তে তোমার লীলারবিন্দ, কুন্দ অলক 'পরে,
লোধ্র-পরাগে গণ্ড তোমার পাণ্ডুর শোভা ধরে,
চূড়াপাশে তব নব কুরবক, শ্রবণে শিরীষ-ফুল,
চারু সীমন্তে পুলকাঞ্চিত শোভে কদম্ব ফুল।

ষট্‌পদগীত ষড়্‌রাগে তব লীলাহিন্দোলা দোলে,
মৃত্তিকা 'পরে কৃত্তিকা তুমি ষড়ানন তব কোলে।

নিদাঘ*

১

মধুযামিনীর মদনোৎসব-সভামণ্ডপ ছাড়ি'
ধূলিঝঞ্ঝায় বর্ষশেষের ধূলোট-যাত্রা সারি',
শুষ্ক অশোক পলাশ পুষ্প দলিয়া বিদায়-পথে
সাথে অনঙ্গ, বীণা, মৃদঙ্গ, 'মধু' ফিরে যায় রথে।

আর পথ দিয়া আসিছে নিদাঘ গিরি মরু উত্তরি'
বাহারের রেশ নাহি হতে শেষ তোড়ী ভৈরবী ধরি',
অঙ্গে ছায়ার উড়্‌নী জড়ায়ে, সঙ্গে দয়িতা তৃষা,
মরীচিকা-বিভা বিচ্ছুরি' কিবা উজ্জ্বলি' দশ দিশা।

বনের বিরহ ফুটিছে আজিকে নিম্বের কটু ফুলে,
তরু-মর্ম্মের মর্ম্মর সুরে, ঘুঘুর কণ্ঠ-মূলে।
মাধবী স্মৃতিরে জাগায় এখনো ফুলহারা মালাডোর,
শ্লথ ভূষাবেশ, ফাগে রাঙা কেশ, ভাঙা গলা, নেশা-ঘোর।
মুদিয়া আজিকে 'রজনী-জাগর-রাগ-কষায়িত' আঁখি,
ঢুলিয়া পড়েছে তরুণ তরুণী তরুমূলে শির রাখি'।

কাননিকা বালা প্রবাল-ভূষায় খুসী তত নয় আর,
পরেছে রঙ্গে সকল অঙ্গে—কনক অলঙ্কার,
মুকুলসজ্জা ঢাকে না লজ্জা আর, দুকূলের প্রয়োজন,
গহনে গহনে বয়ন-কলার তাই এত আয়োজন,

---

*এই কবিতার কতক অংশ সংস্কৃত কবিদের ভাবে আবিষ্ট—কতক অংশে তাঁহাদের সুক্তি-গুলি মুক্তার মত খচিত—অধিকাংশই কবির নিজস্ব। —সম্পাদক

পেয়ারা-কুসুম পশম যোগায়, বাবলা রেশম-গুটি,
শিরীষ-কেশর যোগায় তসর, বাকীটা শিমুল শুঁটি।

কিসলয়ে ছিল যে লঘু মাধুরী ছায়াতে তা' ঘনায়িত।
ডিম্ব-সুপ্ত সঙ্গীত আজি অম্বরে ঝঙ্কৃত।
মধুমাসে মধুমক্ষিবধূরা মধু-উৎসবে মাতি',
মধু-চক্রটি রচেনিক', মধু পিইয়াছে দিবারাতি ;
আজিকে তাদের চেতনা ফিরেছে, নাই তাই অবসর,
সঞ্চয় তরে মাধবী-মঞ্চে রচে ভাণ্ডারঘর।

দূর দিগন্তে গত বসন্ত, কোকিল তবুও ডাকে,
বকুলের বনে, মাঝে মাঝে ঘন তমালের ফাঁকে ফাঁকে,
রতিপতি বুঝি ঋতুপতি সাথে জিনিয়া রাজ্যখানি,
রেখে গেছে তারে 'চারণ' করিয়া ঘোষিতে বিজয়বাণী ?

২

কে ওই ললনা লতামণ্ডপে নলিনীর শয্যায় ?
ঢালে সখীগণ হরিচন্দন-পল্লব-রস গায়,
আজ নাহি ভয়, লজ্জাভিনয়,—গিয়াছে সজ্জাভার,
উশীরপঙ্ক, পঙ্কজরজঃ অঙ্গে বিলেপ তার।
কুমুদের মালা, মৃণালের বালা, অগুরুপত্রলেখা
হয়েছে ভূষণ, শোভে স্বেদকণ-মুকুতায় বলি-রেখা।
শিরীষে রচিত অবতংসটি কর্ণোৎপল দুটি—
গণ্ড-তাপের চণ্ড প্রতাপে ঝলসিয়া পড়ে লুটি'।
শিলার পট্টে লুটায় ললনা,—তেয়াগি খট্বা-সুখ,
কদলীকাণ্ডে গণ্ড পীড়িয়া জুড়ায় তাপিত মুখ।

রুনুঝুনু ধ্বনি মঞ্জীরে তুলি হংস-কাকলী জিনি,
স্বচ্ছ শুভ্র মর্মর বুকে, পদ ফেলে গরবিণা,
শিলা-কুট্টিম ওই চরণের চুমিয়া লাক্ষারস,
তাপিত উরস জুড়ায়ে যেন সে শিঞ্জনে গাহে যশ।
শ্যামা তরুণীর শিথিল ললিত সুশীতল তনুলতা
অশিথিল পরিরম্ভে শিহরি লভিছে সার্থকতা।

প্রিয়ার নয়নে অমৃতাঞ্জনী প্রিয়ের শীতল চুম
গ্রীষ্মকাতর জ্বালাময় চোখে আনে আরামের ঘুম।
লুলিত অঙ্গ ঢলি' ঢলি' পড়ে, স্খলিত মেখলাহার,
প্রিয়-করে-রচা সবল মেখলা ধ'রে ফেলে বারবার।
ব্যজনে নিরত দয়িত, প্রিয়ার সুপ্তি-শিয়র 'পরে,
শৈত্য-পরশে শিহরি' প্রেয়সী আঁখি মেলি' লাজে মরে।

ইন্দ্রনীলের মত চিক্কণ চারু তরঙ্গ তুলি'
কূজনফুল্ল স্ফীত কম্পিত কপোত-কণ্ঠগুলি
স্তম্ভ-শিখরে মণ্ডলী রচি' ধারাযন্ত্রের পাশে
অভিমানিনীরে করে চঞ্চল শ্লেষঘন পরিহাসে।

আজি এ নিদাঘে অচ্ছোদকূলে তাপসের পরাজয়,
একাবলী সাথে অক্ষমালার হয়ে যায় বিনিময়।
এলায় দুকূল বনবালাকুল গিরিসরিতের ঘাটে,
ভুলিয়া মৃগয়া যুবরাজ তায় অস্থির বনবাটে।
হেম-মরালের কমলগন্ধি পক্ষতাড়িত বারি
বক্ষে লভিয়া বিরহ জুড়ায় কোন্ বিদর্ভ-নারী ?
যমুনার জলে সন্তরে গোপী অন্তর-দেহদাহে,
মিছে দেরী করি' সন্ধ্যায় বরি' পরাণ জুড়াতে চাহে।

যমুনালহরী শতবার ঘুরি আঘাতে উরোজতটে,
তবু ঘটভরা হয়নাক ত্বরা, এমনি জ্বালাই বটে।

ফুলদোললীলা হইয়াছে শেষ, বাজেনাক বেণু বনে,
সলিলদোলের আসিয়াছে দিন দুলি তরঙ্গ সনে।
মন্দাকিনীতে তরী বেয়ে আজ দেবতা এসেছে নামি',
ডুবি' আকণ্ঠ মানস-সরসে সন্তরে দিবাযামী ;
ভোগবতী হ'তে নাগবালা উঠি' মিলে যায় তার সাথে,
জলকেলি করে কমলের বনে ধরি' তার দুটি হাতে।

প্রিয়ার কণ্ঠে শোভে ত্রিকণ্ঠী বক্ষ ছাড়ায়ে লুটে,
যেন মর্মরসোপানে সোপানে রোহিতের শ্রেণী উঠে।
আলুলিত তার কুন্তলভার যেন শৈবালরাশি,
মৃদুহিল্লোল রচেছে বিলোল ভঙ্গিমাময় হাসি।
খেলিছে শফরী কেলিচঞ্চল ইন্দীবরের পুটে
কনক-কুম্ভ দুলে তরঙ্গে—পদ্মে কোকনদ ফুটে।
বাহুর মৃণালে মরাল-কূজনে ভূষা-শিঞ্জন বাজে,
কৌমুদীসম গৌর বরণ উজ্জ্বলি' তনু রাজে,
যৌবন-তটে বাঁধা লাবণ্যসরসীর হিম-জলে,
নিদাঘ-নিশীথে ঝাঁপ দেয় কবি অবগাহনের ছলে।

৩

মিঠা সরবৎ নিয়ে আয় সাকী তরমুজ-রস ছানি',
আন্ বেলোয়ারী পিয়ালায় ভরি' নিঙাড়ি আঙুর-পানি ;
'বিমেনের' এলা দারুচিনি দিয়ে রচি' আন্ তাম্বূল,
'হদ্রমটের' কস্তুরীবাসে দীল্ কর মস্‌গুল।

'বসোরার' যত পশারিণী আজ গুল্‌নার বাগ থেকে,
গুলের সঙ্গে আন বুল্‌বুল্‌ বুকের কাঁচুলী ঢেকে।
উড়ায়ে ওড়্‌না আশমানীরঙা, গুলাবে সিনান ক'রে,
আয় আয় বাঁধ 'ওমানের' চারু মুক্তামালার ডোরে।
দশ-শত-এক আয়েসা লয়লা 'কাসিদা' 'গজল' গানে,
নবনব রাগে আজি এ নিদাঘে 'তর্‌' ক'রে দে' লো প্রাণে
মেহেদীপাতায় রাঙায়ে নখর চুয়া-রসে ভুরু আঁকি',
নিয়ে রূপযশ, খস্‌খস্‌-রস-খোস্‌বো বসনে মাখি',
সকল অঙ্গে আনারের শোভা, আয় লো আনারকলি,
কোমরে চামর, নয়নে গুমর, হাজার কলিজা দলি'।

গুটাও গালিচা জর্‌দা-জরীন, পর্দা ফেল' রে টানি,
ছিটাও চামেলি, পিচকারী ভরি' ছুটাও গোলাপী পানি।
ফুল-ভাণ্ডার মন্থন করি' সারা বসন্ত ধ'রে
জমা করিয়াছ যতেক আতর ছড়াও এ ঘর ভ'রে।
খুলে দাও আজ শীসমহলের বোরখা ঝরোখাগুলি
চন্দ্রমাতলে কালিন্দীজলে লীলাতরী দাও খুলি'।
সুরা-সরোবর-সোপানে লভ' রে শীতল শয়নসুখ,
হামামে-হামামে খোল' ডা'নে বামে তামাম ফোয়ারামুখ।
এ নিদাঘে তব কুণ্ঠার অবগুণ্ঠন দাও ফেলি'
কর পরকাশ সুষমাবিলাস লাজ-পেশোয়াজ ঠেলি'।
এলাইয়া দাও বেণীর বয়ন—নীবিবন্ধন ডোর,
কি হবে ভাবিয়া ? সুড়ঙে সুড়ঙে শূর-'সুন্দর'-চোর।
মরু-নির্ঝরে ইরাণী রূপসী ভরি' লয়ে হেম ঝারি,
তরুণ রাহীর অঞ্জলি 'পরে ঢালি' দাও হিমবারি ;
ঢালো ধীরে ধীরে, ওগো সুন্দরি, করপুট-দরপণে
ফুটুক ও-মুখবিম্ব, সে জল মিঠে হোক্‌ চুম্বনে।

৪

অসহ কবচ আজিকে অঙ্গে করিয়াছে পরকাশ,
উষ্ণীষ আজি করেছে প্রকট কুঞ্চিত কেশপাশ।
উড়েনাক' রথে কেতু পথে পথে, রণ অভিযান শেষ,
নাগরের বেশ ধরেছে নরেশ, তেয়াগি সমর-বেশ।
অশ্ব পশেছে মন্দুরামাঝে, ভেঙেছে স্কন্ধাবার,
স্মর-পরাভূত শূরগণ আজি বন্দী যে প্রেমিকার।
ধুয়ে মুছে ফেলে রণ-ধূলিমল নর-শোণিতের দাগ,
ধনু ত্যজি আজি বীণাতে ধরেছে নট-নারায়ণ রাগ।
প্রিয়ার হসিত গণ্ডের কূপে ডুবিয়া মরিবে বীর,
ললনার প্রেম-পরশ মুছাবে ললাটের শ্রম-নীর।

তারাদীপে ভরা সুনীলাম্বর-চন্দ্রাতপের তলে
রচিত আজিকে কবির শয্যা নিবিড় দূর্বাদলে!
জ্যোছনা-ধারায় পরাগ-ঝোরায় কুঞ্জে করিয়া স্নান
বেঁচে রয় কবি 'চন্দ্রকান্তমণি-জল' করি' পান।
পূর্ব-পুণ্যে যদি বা ইন্দ্র দিতে চাহে আজি বর,
যেচে লয় কবি কদলী-বিতানে তবে একখানি ঘর,—
তুষার-প্রাচীর, উশীর-ছাউনি, চন্দন-কাঠে গড়া,
শীত মর্মরে কুট্টিম রচা, কমলগন্ধে ভরা।

ডা'ন হাতে তব চামর-ব্যজনী, বামে ঘট-ভরা বারি,
নিদাঘের দিনে দেবী হয়ে তুমি এলে কল্যাণী নারী,
তৃষ্ণার ছল করিয়া কেবল কাছে কাছে আমি রই,
সাধ যায় তব কুম্ভের মুখে আম্রের শাখা হই।

তৃষিত তরুণ তরুগণে তোয় পান না করায়ে নিতি,
নিজে জল পান করো না তরুণী, এই তোমাদের রীতি।
তরু-আলবালে ভরি দাও আজি স্নেহধারা বারবার,
শাখায় শাখায় ফুটিবে ফলিবে আশিস পুরস্কার।
প্রাঙ্গণ 'পরি পরিজন-তরু, ঝলসিছে তার পাতা,
প্রান্তর 'পরে পান্থের তরে কে অই পুড়ায় মাথা?
মূর্ত্তা করুণা আর্ত্ত-তারিণী মর্ত্ত্য-দেবতা নারী,
ঝারি হ'তে ঢালি দাও তাহাদের ঝারার গঙ্গাবারি।

সন্ধ্যাবেলায় সিন্ধুবেলায় বালুকা খুঁড়িয়া আজি
হেলায় খেলায় রাতি বেড়ে যায় গণিয়া লহরীরাজি।
কোটি কোটি মণিপ্রোজ্জ্বলফণ ফণিরাজগণ সম,
চল তরঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে হরিয়া তটের তমঃ।
হু-হু বয় বায়ু, শরীর মনের বসন তাহাতে উড়ে,
ব্যসন-বাসনা দূষিত কামনা যায় সব তায় দূরে।
হেথা আসে বায়ু বয়ে নিয়ে আয়ু অমৃতের দেশ থেকে,
শ্বাস-যন্ত্রের কুহরে কুহরে জমা ক'রে যায় রেখে;
ছিঁড়ি রথকেতু করে প্রতিহত নিদাঘের অভিযান,
পবন-বাণে যে ব্যর্থ তাহার প্রবল অগ্নি-বাণ।
শুনি তরঙ্গে গজ-তুরঙ্গ-বৃংহণ-হ্রেষা-নাদ,
দূর হতে ভয়ে নিদাঘ পলায় মনে গণি পরমাদ।
গন্ধবহ ত' নহে হেথা বায়ু, নয়নে তন্দ্রাবহ,
অসীম-লোকের সংবাদ আনে ত্রিদিব-স্বপ্ন সহ।
সন্ধ্যার উপনিবেশে হেথায় সিন্ধুর উপকূলে
সবে গৃহভার ইহ সংসার প্রহরের তরে ভুলে।
নাগর-নাগরী জুটে, পরিহরি নগরের উপবন,
ঊর্মি-দোলায় দুলে দুলে তোলে ফেন-ফুল অকারণ।

কোটি কোটি সিত ফেনিল চামরে ব্যজনের প্রীতিদানে,
বিতরে শান্তি সিন্ধু তাহার শরণাগতের প্রাণে।
কলকল্লোল-তালে-তালে তার অন্তর নাচে যবে,
স্বর্গ দুয়ারে ঐরাবতে সে আরোহণসুখ লভে।

ত্রিলোক-রমার মণি-দর্পণ—হ্রদের স্বচ্ছ নীরে
ডুবিয়া তপ্ত রবিবিম্বটি আসিতে চাহে না ফিরে।
অঙ্গ এলায়ে শ্রান্ত তাপিত পান্থ অশথ ছায়
উন্মনা আজি অলস পবনে, যাত্রা ভুলিয়া যায়।
আজি জীবলোক সারা বরষের কর্মের ফুলফলে,
স্মৃতি-রোমন্থ করে আঁখি মুদি, নিদাঘের ছায়াতলে।

৫

মোহনার মুখ শুকায়ে তটিনী-পারাবারে ছাড়াছাড়ি,
বারিধির জলে পড়েছে মকর নদীতে মকরী তারি।
দিবা-দাবদাহ মিলনের বাধা, চীৎকারে চখাচখী,
আজি ব্যবধান মরুর সমান, কাঁদে তাই সখাসখী।
দাহ-দস্যুর হাত হ'তে কেড়ে কূপমাতা নানা ছলে,
লুকাইয়া রাখে সুধার ভাণ্ড বুকের কাঁচুলি তলে।
কণ্ঠের তৃষা জুড়াতে তথায় তরুণ-তরুণী জুটে,
জননীর স্নেহ-'ছায়ামণ্ডপে' হিয়ার তৃষাও টুটে।

নীরবে নিভৃতে সেবায় নিরতা স্নেহে ছল-ছল আঁখি,
শুভ্র ধূসর সৈকতবাসে জ্বালাময় তনু ঢাকি',
নিদাঘ-তটিনী বহে ধীরে ধীরে হিন্দুবিধবা নারী,
বক্ষে নাহিক স্তন্য, কক্ষে আছে ঘটভরা বারি,

রূপ-যৌবন করেছ দাহন হৃদয়ের চিতানলে,
শীতল স্বচ্ছ যা কিছু তাহাই বহিছে চিত্ততলে।

বাপীর বক্ষ শুকায়, দুঃখে শফরী পঙ্কগত,
অতি দানে বাপী হয়েছে নিঃস্ব চারুদত্তের মত।
কমল-কুমুদ-মণিভাণ্ডার আজি মৃত্তিকাসার,
প্রাণ ভ'রে দান করিতে যে নারে,তাই করে হাহাকার।
বুক চিরি শেষ কণিকা শোণিত তা-ও বিলাইয়া হায়,
ভিক্ষুক দেখি এবে শুধু তার বক্ষ ফাটিয়া যায়।

ফুলবন ছাড়ি ফলবনে এসে রুচিকর সৌরভে
মধুকর আজি মাধুকরী ত্যজি মাতিল মহোৎসবে।
তাল-তরু দিতে পারে নাই ছায়া, দিল ঢের বেশী তার,
দিয়াছে বৃন্ত-ব্যজনীর সাথে কোমল শস্যসার।
ঘন ছায়া দিতে পারে নাই বলি খর্জুরও নয় হেয়,
তরুলতাহীন মরুপ্রান্তরে একা সেই আতিথেয়।
রসালের রসখণ্ডে, বিশাল পনসভাণ্ড-পুটে
স্নেহ-দুগ্ধের ক্ষীর পূরি ধরা ধরিয়াছে দুই মুঠে।

বেণুবনে ঘেরা দীঘির সলিলে ছায়ারা নোয়ায় মাথা,
আলসে নামিয়া আসে কালো চোখে যেন নয়নের পাতা।
দাহের গরলে সুনীল জম্বু করে তায় অবগাহ,
সীমন্তিনীরা যেথায় ঘুচায় ক্লান্তি, বিরহ-দাহ।
বৎসল জলে প্রতি হিল্লোলে মার যেন পায়া সাড়া,
পূর্ণকুম্ভ-পয়োধরে ঝরে গৃহে গৃহে সুধাধারা।

কলসী ছলকি' জল ভরি সাঁঝে কৃষক-বধূটি ফিরে,
মাঠ হতে গৃহে ফিরিছে শ্রান্ত তৃষিত কৃষক ধীরে।

চলিছে নীরবে চতুর যুবক শব্দ করে না পায়,
পাছে সে রমণী থমকি অমনি আগে না যাইতে চায়।
সিক্ত বাসের শীতল পবনে জুড়ায় তাপিত হিয়া,
তৃষায়ত আঁখি মুদিত তাহার সিক্ত সে রূপ পিয়া।
কণ্ঠের তৃষা শান্ত না হ'য়ে অন্তর পানে ছুটে,
গ্রাম-বাটে সেই চরণ-পঙ্কে তাপিত মর্ম লুটে।

পিয়ালবনের মঞ্জরীরজে পীড়িত যাদের আঁখি
তারা পুনরায় নির্ভয়ে চায় শাল তরুছায় থাকি।
হিন্তাল তলে সান্তাল কোল মদিরানন্দে মাতি'
হাত-ধরাধরি নেচে নেচে ঘুরি কাটাইছে সারা রাতি।
মহুয়ার রসে মাতোয়ারা তারা বাজায় মাদল বাঁশী
শিরে অবিরল ঝরিছে বাদল সোঁদাল দলের রাশি।
বালু খুঁড়ে খুঁড়ে জলে ঘট পূরে কোলবালা সবে তোষে,
তটিনী তাদের জননীর মত, গোপনেই স্নেহ পোষে।
হেরি সানুদেশে গ্রীষ্মবীরের বিজয়যাত্রা শেষ,
গিরিচূড়া হতে গিরিচারিগণ বর্ষণ করে শ্লেষ।

৬

(ঋতুসংহারের ভাবানুসরণে)

করীর অঙ্গ ছায়ায় ছায়ায় সঙ্গে চলেছে 'হরি',
তৃষ্ণায় 'হরি' হিংসা ভুলেছে শঙ্কা ভুলেছে করী।
নিয়ত উষ্ণ পবন-সেবনে প্রখর তপনতলে
অহির গরল হইয়া অনল দেহেও তাহার জ্বলে।
দলে দলে তারা ছায়ার ভিখারী, শিখিশিখাতলে জোটে,
যদিও ক্ষুধিত, ক্লান্ত কলাপী স্পর্শ করে না ঠোঁটে।
মণ্ডূক কুল ক্লান্ত আকুল আতপতপ্তজল,
শরণ নিয়েছে শ্রান্ত ফণীর ফণার ছত্রতলে।

গ্রীষ্মের দাপে বুক গর্দভে একঘাটে করে পান,
নিত্যবিরোধী দ্বন্দ্ব রচিয়া রাখে পাণিনির মান।
এ নিদাঘতাপ শুধু সহে ছাগ—দক্ষের বরে বুঝি ?—
দেখায়ে ভ্রান্ত ভল্লুকে পথ জলাশয় দেয় খুঁজি।
তাপিত ব্যাকুল কৃকলাসকুল না পেয়ে তৃষার জল,
অজগরদেহ-বিগলিত স্বেদ পিইতেছে অবিরল।
পল্বলে দাহ জুড়ায় বরাহ, খুঁজিছে মুস্তামূল,
নিপান-পঙ্কে বিলীনশরীর ক্লান্ত মহিষকুল।
করেণুরে আজ নিয়ে গজরাজ নেমেছে হ্রদের নীরে,
কমল-পত্রে শ্যামাতপত্র রচে দয়িতার শিরে।
শুণ্ড-ধারায় সিনান করায় বারবার করেণুকে,
মৃণালকন্দ উপাড়ি আদরে পূরে দেয় তার মুখে।
চমরী পেয়েছে অমরীর মান, পুচ্ছ পূজারী তার,
গবয়ের গলকম্বল আজি গলগ্রহের ভার।
কূপে নামি তৃষা জুড়ায় শরভ, হিংসায় কপি চায়,
কদলীকাণ্ড খড়্গে বিদারি গণ্ডার রস খায়।
বিন্ধ্যগুরুর তৃষার সৃষ্টি মৃগেরে কে করে ত্রাণ ?
মৃগতৃষ্ণিকা-লাঞ্ছিত ভ্রমে বৃথা সে ভ্রাম্যমাণ।
তপের সৃষ্টি উষ্ট্র কেবল রবি-রোষে র'য়ে ধীর,
মরু-পারাবার অবহেলে তরে, লঙ্ঘিয়া গিরিশির।
বিষাণ-তাড়নে বৃষ রোষে ভূমি খুঁড়িতেছে বারবার,
তাপের জ্বালায় মাটির তলায় পশিতে কি সাধ তার ?

ছায়ালোভে আজি শষ্পের মায়া ছেড়েছে গোঠের ধেনু,
পাঁচনি তেয়াগি বটতরুতলে রাখাল ধরেছে বেণু।
তৃষার জ্বালায় নিশায় জ্বালায় আলেয়া উল্কামুখী।
ভাবে লোমকেশ-নিপীড়িত মেষ শূকরই আজিকে সুখী।

বাজী ভাবে আজি শোণিতমথিত ফেনিল ঘর্মে নেয়ে,
সিন্ধু-ঘোটক হওয়া ছিল ভালো সিন্ধী ঘোটক চেয়ে।
পাখী ভাবে আজ, 'পাখাতে কি কাজ—পারি যদি মীন হই',
'কর্কটই সুখী', মীন ভাবে আজি—'জলে শীতলতা কই?'

গরবিণী চাঁপা বৃক্ষচূড়ায় ঝলসি পড়িয়া ভাবে
'এর চেয়ে ঢের সুখ আছে হীন পঙ্কে জনম লাভে'।
কাঠ-ঠোকরাটি ঠোঁটের ঠোকরে গণিছে দণ্ডপল,
গগনের ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে ধ্বনিত 'ফটিক জল।'
দীর্ঘ দিনেরে হ্রস্ব করিতে ঝিঁঝিঁরা করাত টানে,
দীর্ঘতা আরো দুঃসহ হয় ক্লিষ্ট ক্লান্ত তানে।
তাপচঞ্চল সারস মরাল ছিটায়ে পাখার বারি,
সজীব করিয়া রেখেছে এখনো যত রাজীবের নাড়ী।
কুম্ভীর-দেহে শম্বূককুল ছাড়িছে তপ্ত শ্বাস,
ফুলের শীতল গর্ভকুলায়ে অলিকুল করে বাস।
কপোতকণ্ঠে তাপিত সৌধ তৃষ্ণা জানায় তার,
শুকশারীগুলি আজি বুলি ভুলি শুধু করে চীৎকার।

ভূতলে আজিকে নামেনি চাতকী, দূষিও না তারে তবু,
বারিকণা সাথে দিতে কি পারিবে প্রেমকণা তারে কভু?
মদভরে সে ত' ঘুরে না গগনে ত্যজি হ্রদ নদী বন,
নিয়ে গেছে সে যে কণ্ঠ ভরিয়া নিখিলের আবেদন।
প্রিয়জন পাশে ব্যর্থ হলেও প্রার্থনা তবু শ্রেয়,
অন্যের কাছে না যাচিতে পাওয়া তাও যে বড়ই হেয়।

দূত অবধ্য, শঙ্খচিলেরে ভানু নাহি বধে প্রাণে,
মেঘের বার্তা আনিতে গিয়া সে ঝড়ের বার্তা আনে।

অন্য পাখীরা গিয়াছে ভুলিয়া পক্ষের ব্যবহার,
ঝঞ্ঝাজীর্ণ কুলায়ের পুন করিছে সংস্কার।
বনস্পতির বল্ক-কোটরে কীট খুঁজে খুঁজে ঘুরে,
দাবানল ছাড়া বন হতে তারা ব্যোমপথে নাহি উড়ে।

দাহের ব্যাধিতে অধীর ব্যাধেরা সুলভ শিকার ছাড়ি,
ধরাসনে আজি শরাসন ত্যজি হইয়াছে ফলাহারী।
মৃগয়াসক্ত নরপতি আজ কৃপা করি পশুগণে,
বন ত্যজি ঘুরে মনোমৃগয়ায় উপবনে তপোবনে।
বধ্য আজিকে হন্তারো কাছে তৃষ্ণার জল চায়,
'করো' জলদান হরো শেষে প্রাণ,' ক্ষোভ খেদ নাই তায়।

৭

লোকে বসন্তে ঋতুরাজ কয় সত্য তা কভু নয়,
সে-ত যুবরাজ, তুমি মহারাজ, সবে গায় তব জয়।
তুমি নিয়মিত করিলে ভারতে উপাসনা-পদ্ধতি,
সকল ঋতুই তোমার রীতিই অনুসরে, ঋতুপতি!
তিব্বত হতে চামর এনেছ, হরিচন্দন-ভার
নীলগিরি হ'তে আহরি' রচিলে দেবীর পূজোপচার।
শিলার তপ্ত বিগ্রহে তুমি ঢালিলে গঙ্গানীর,
তুলসী শ্রীফল-কিসলয়দল সুরভি শীতল ক্ষীর।
'কুসুমে শয্যা, সজ্জা রচিয়া, কুসুমে লজ্জা হরি',
শৃঙ্গারবেশ রচিলে কুসুমমালায় অঙ্গ ভরি'।
বালগোপালেরে ননীছানা তুমি খাওয়ালে গোপের ঘরে,
দেবতার তুমি আসন রচিলে পঙ্কজে সরোবরে।

নিয়ে দেবতায় জলযাত্রায় নৌকাবিহার তব,
সরোমন্দিরে হ্রদনদতীরে উৎসব নব নব।
শীতল শিলায় মন্দির তাঁর রচিয়াছ মঠে মঠে,
হিমমণ্ডলে গিরিতরুতলে—অথবা নদীর তটে,
শীতল বলিয়া গর্ভগৃহের পাতাল অন্ধকারে,
অথবা কুণ্ড-নীর-মণ্ডপে মগ্ন রেখেছ তারে।
তীর্থসিনানপুণ্যে দিয়াছ চিত্ত-শোধন-প্রথা,
নিত্য সিনান দেয় ত্রিসন্ধ্যা জপে যাগে যোগ্যতা।
শান্তিবারির ভিখারী মোদেরে করেছ যজ্ঞশেষে,
পিতৃলোকের তৃষার কথাও ভাবিতে শিখালে দেশে!
ঘরে ঘরে হয় তোমারি বিধানে ঘটোৎসর্গ ব্রত;
সত্রে সত্রে করুণার ধারা ঝরিতেছে অবিরত।
তৃষিত বিপ্রে ফলদান হতে ফলবান কিবা আর?
জলদান ব্রত তোমার শ্রুতিতে সকল ব্রতের সার।
সকল পুণ্যবোধন-বিধানে মোদের গৃহের দ্বারে,
চূত-শাখা সহ স-ফল পূর্ণ ঘট শোভে দুই ধারে।
সফল পূর্ণ তাহে বহুশাখ উৎসব আয়োজন।
ভবনে পশিতে তোরণ-মালিকা করে ভাল পরশন।
স্নিগ্ধকদলী-তরুমণ্ডলী ছায়ার মাধুরী ঢালে,
তুমি যেই বিধি দিলে একদিন তাই চলে কালে কালে।

ফলফুল কিছু দেয় না যে তরু তারেও দিয়েছ মান,
বেদিকা বাঁধায়ে অঙ্কে তাহার দেবতায় দিলে স্থান।
অক্ষয় বটে হেরেছ শ্যামল বৃক্ষের টুরূপ,
পথের দুধারি ছায়া সঞ্চারি খনেছ অমৃত কূপ।
তব প্রেরণায় রচি' আঙিনায় ছায়ামণ্ডপখানি
বধূবর শোনে শুভ বন্ধনে কুশণ্ডিকার বাণী।

তোমারি বিধানে কিরীটপিধানে পুণ্যাভিষেক-রীতি,
ছত্রকোরক রাজশিরে ফুটি সদা বহে তব স্মৃতি।
অশনে বসনে নিয়ামক তুমি, তুমি অহিংসা-মূলে,
তোমার শাসনে আমিষ-লালসা এ দেশ গিয়াছে ভুলে।
রিক্ত বসন করেছ তাহারে,—নগ্ন অংসে তার
কেবল শুভ্র উত্তরীয়টি করে শোভা সঞ্চার।
প্রেরণা দিয়াছ সূক্ষ্ম বয়ন-শিল্পের প্রচলনে,
বেণীবন্ধনে, মাল্যবিলাসে, ললনার প্রসাধনে।
সকল শিল্পে কল্পনা তব সূত্র ধরিয়া থাকে,
রাগরাগিণীরা তোমার দেউলে হরিচন্দন মাখে।
কাব্যে তুমিই কবির সুহৃৎ—নাট্যে সূত্রধার,
সরস্বতীর অঙ্গে দিয়াছ সুরভি অলঙ্কার।
কাব্যে বিরহ স্মরশরদাহ যত দ্বেষ, রোষ, পাপ,
ক্লেশ জ্বালা যত লভে অবিরত তব দাহ, তব তাপ।
তোমারি পুণ্যে মাতামহ গিরি মহাগুরু, হিমবান,
তোমারি নিদেশে পাইয়াছে নদী মাতৃকা-অভিধান।
ঝাঁপ দিয়া পড়ি' তোমার ঘাটের শীতল গঙ্গা-বুকে,
'জয় মা' শব্দ অন্তর হতে উচ্ছলি উঠে মুখে।
পুষ্টির লাগি তুষ্টির লাগি বাড়াও ধরার ক্ষুধা,
রস-পারাবার মথি মেঘে তার সঞ্চিত কর সুধা।
বরষার দানগৌরব-ঘটা, শীতের শস্যভার
শরতের শোভা সৌরভঘটা, 'মধু'র হর্ষ-হার,
ঋতুচক্রের চক্রবর্তী তুমি যে সবারি মূলে,
সকলেরি বীজ উপ্ত তোমার তপ্ত-চরণ-ধূলে।
নদী দধিধারা, সীমাশেষহারা বিশাল কাননভূমি,
ঘনজনপদ, কৃষিসম্পদ সকলি রচিলে তুমি।

৮

এ নিদাঘ যেন প্রেমাভিনয়ের বিরহ অঙ্কখানি,
দুর্বাসা যেন অভিশাপ হানি দেয় ব্যবধান আনি'।
বিপ্রলম্ভে সঞ্চারী ভাব সঞ্চার করে ভীতি
নির্বেদ, গ্লানি, দৈন্য, জড়তা, অলসতা, মোহ, স্মৃতি।
বিরহ-পীড়ন আজি অসহন, রামগিরি-চূড়া' পরে
দাঁড়ায়েছে আজ যক্ষ যুবক দূত-সন্ধান তরে।
বহু দিন গত যক্ষ-বনিতা পায়নি বারতা তার,
বসি বাতায়নে আয়ত নয়নে চাহে ব্যোমে বারবার।
আদি-শৃঙ্গার রস-সঙ্করে সুখ-বসন্ত শেষ,
প্রাবৃটসর্গে মধুর শান্ত করুণের সমাবেশ।
ষড়ধ্যায়ের বিশ্বকাব্যে নয়টি রসের মেলা,
মাঝখানে তার এই নিদাঘের বীররৌদ্রের খেলা।

জামদগ্ন্য কি উঠিল জাগিয়া নয়নে অগ্নি যার,
ধরা-জননীরে বধিতে পরশু তুলিল কি এইবার ?
অর্জুন-ভুজ-কানন ছেদিয়া চলে কি বিদেহ-গেহে ?
লুকায়ে রাখিছে জনক যেখানে রামের কনক দেহে !
রক্ষোনাথের রথ কি ধরেছে জটায়ু চঞ্চুপুটে ?
নাগবংশের ধ্বংসের লাগি বিনতাসুত কি ছুটে ?
জন্মেজয় কি প্রতিহিংসার জ্বালিল যজ্ঞানল ?
গরল শ্বসিছে ফণার কাননে 'অনন্ত' অবিরল !
বিদ্রোহানল জাগে গৃহে গৃহে গিরি-পঞ্জর-তলে,
শমীবন হতে ছুটে দাবানল—সাগরে বাড়ব জ্বলে।
ময়দানবের ভয়ে মানবের হাহাকার উঠে হায়,
গলিত হিরণ ঢালি সে পীড়ন করে বুঝি বসুধায় !

ঈশান-ভবনে তড়িৎস্ফুরণে জ্বলে দশ শত আঁখি,
বাসব আপন অনুচরগণে মাঝে মাঝে উঠে ডাকি'।

৯

উপবাসে ক্ষীণা প্রকৃতি মলিনা বসেছে উগ্রতপে,
দারুণ দুঃখ সহিছে লক্ষ পুরশ্চরণ-জপে ;
যেন অপর্ণা তপোবিশীর্ণা হরের করুণা মাগি,
অনসূয়া যেন দুঃসহ ব্রতে বিশ্বহিতের লাগি।
মরু-প্রান্তরে ধরাজননীর স্তন্যের হবি দানে,
চারিটি কুণ্ডে করিছে কে যাগ চাহি সবিতার পানে ?
টানিয়া আনিবে আর্ত ভূলোকে যাহার পূর্ণাহুতি,
বরুণের বর-করুণার ধারা,—বিজয়ী হইবে শ্রুতি।
চাতকী-শিখীর কাতরাবেদনে—কেতকীর বেদনায়,
নীপকূটজের নিভৃত মৌন দুশ্চর সাধনায়,
বরাভয়ময় সঞ্জীবনের পড়েছে প্রবল টান,
কোটি কণ্ঠের ত্রাহি ত্রাহি রবে দ্যুলোক কম্পমান।
কোটি কোটি বীজ সার্থকতার আগ্রহে, ধূলিতলে,
জপে যে মন্ত্র নিশিদিন, তায় ধাতার আসন টলে।

এ কোন দধীচি ত্রিলোকের হিতে যোগাসনে ত্যজে তনু,
সমাধি ভাঙিয়া সুমেরুশিখরে হুঙ্কারে কোন্ মনু ?
কোন্ পাণ্ডব দহি খাণ্ডবে তুষিতেছে দেবতারে ?
লভি গাণ্ডীব কাঁপাবে বিশ্ব বজ্রের টঙ্কারে।
মরীচিকামায়া কোন্ সে ঋষ্যশৃঙ্গে ভুলায় নেচে,
যাঁর পদরজে যুগতৃষার্ত 'অঙ্গ' যাইবে বেঁচে।
দুঃশাসনের হৃদিবিদারণ হেরিছে যাজ্ঞসেনী,—
চপলারক্তরঞ্জিত করে রচা হবে তার বেণী।

থামিবে ঝঞ্ঝা, রুদ্রদেবের পিণাকের টঙ্কার,
ভাল-নেত্রের বহ্নি নিভাতে ঝরিবে অশ্রু তাঁর।
কণ্ঠের বিষ ভেদিয়া ফুটিবে তাঁর বরাভয়-বাণী,
অমৃতে ভরিবে আবার হরের করের করোটিখানি।
মেঘ-তরঙ্গে গিরির শৃঙ্গে হইবে শৃঙ্গনাদ,
প্রাণ-গঙ্গায় ঘোষিবে ডমরু মঙ্গল পরসাদ।

রবে না মাটির ভিক্ষাভাণ্ড বেশী দিন ঘরে ঘরে
কড়ি-দিয়ে-রচা সিন্দূর-ঝাঁপি ফিরিবে রমার করে।
হবে সুধাপীন ধেনুর আপীন, শষ্পে ভরিবে মরু,
শ্যামলানন্দে হাসিবে ক্ষেত্র, পুষ্পে ভরিবে তরু।
চক্রগদায় আজিকে ধরার অরাতি করিয়া জয়,
শঙ্খ-সরোজে নারায়ণ পুন বিতরিবে বরাভয়।
তপনেরে মোরা করিব আপন 'সূর্য-হৃদয়' গানে,
অনলে তুষিব স্বাহার মন্ত্রে সুরভি সমিধ্ দানে।
মোরা তপ করি আবার জীবন জাগাবো ভস্ম-তলে,
করুণার বারি ঝরাবো হরির চরণ-কমলদলে।
শাপহতগণ লভিবে জীবন সে বারির পরশনে,
সাঁতারি ধরিবে মকরের দেহ জয় জয় গরজনে।
দেবী মহামায়া ক্রমে দশ মহাবিদ্যার লীলা সারি,
কমলাত্মিকা রূপে বরষিবে করিকুম্ভের বারি।
দেবতা তুষ্ট রাজিবে ইষ্ট বরাভয় লয়ে করে,
কুশল বিতরি সলিলের 'পরি মরাল-রাজীব 'পরে।
বরুণ-তোরণ-গৃহ-প্রাঙ্গণ ভরিবে লক্ষ পোতে,
করুণার ধারা ঝরিবে রাজার হাজার চক্ষু হ'তে।

হেমন্ত

এলো হিমঋতু লয়ে গিরিশিরে সিতিমা, পাণ্ডুতা লয়ে বনে লোধ্রে,
পক্ক শালির শীষে লয়ে নব পীতিমা, পিঙ্গল করি হেম-রৌদ্রে ॥
প্রান্তর শোভে মোতি-মরকত-বিত্তে, বাপী আর শোভেনাক' পদ্মে,
আশা-শতদল ফুটে কৃষীবল-চিত্তে, এলো রমা হিমবতী-ছদ্মে ॥
মক্ষীরা জুটে আজি তালীরস-কলসে, পক্ষীরা জুটে শালিক্ষেত্রে।
দিগ্বধূদের দিঠি পীত-রূপে ঝলসে, অঞ্জন আঁকে তাই নেত্রে ॥

শেষবিদায়ের বাণী গুঞ্জরে শেফালি, হিমজল-ছলছল চক্ষে।
একে একে নিভে যায় কৌমুদী-দীপালী, দীপদশাধূমায়িত কক্ষে।
কুঞ্জ ছাড়িয়া যায় মীনকেতু ক্ষুণ্ণ, পুরে পশি রহে নিঃশঙ্কে।
শিঞ্জিনী দিয়ে বাঁধে তূণ তার শূন্য, কেতু তার লীন হ্রদ-পঙ্কে ॥
ব্যোমে নাহি প্রেমলীলা চন্দ্রিকা-চকোরে, ছাড়াছাড়ি স্বর্গে ও মর্তে।
মিত্রতা হল আজি 'কর্কটে' 'মকরে', পশে ভেক কচ্ছপ-গর্তে ॥

রবি দক্ষিণে চলি' দক্ষিণ-নয়ানে তপ্ত মদিরা করে বৃষ্টি।
বহ্নির রক্তিমা তন্বীর বয়ানে নবীন-সুষমা করে সৃষ্টি ॥
ঝিল্লিকা গায় আজি কুঞ্জের পূরবী, খদ্যোতে শোভে লূন বৃন্ত।
কস্তূরী হ'ল আজি বিলাসের সুরভি, পুষ্প ফুটে না চিরদিন ত' ॥
অঙ্গে নগ্ন করি মঙ্গল-শিশিরে 'পর্ব'-সিনান করে ইক্ষু।
সারাবছরের শ্রমফল দেয় কৃষিরে, আজ সে কার বা কৃপাভিক্ষু ?

গুটাও শীতল-পাটী, ছুড়ে ফেল ব্যজনী, তূলায় তনুটি কর লগ্ন।
দিন আজি ক্ষীণতনু, পীন আজি রজনী, দীর্ঘ স্বপনে হও মগ্ন ॥
কামিনী-গণ্ড শোভে কালীয়ক-তিলকে, ধূপসুবাসিত কেশগুচ্ছ।
শুষ্ক মালিকা ঝুলে বাতায়নে, কীলকে অনাদৃত চমরীর পুচ্ছ ॥

রাজ্য ফিরায়ে নিল গিরিরাজ, ফিরিছে উত্তরবায়ু তার ভৃত্য।
পীড়ক, পালক আজি,—পালকেরা পীড়িছে, কৃপণ বিলায় কৃপাবিত্ত ॥

মিত্র-দেবতা আজি সত্যই মিত্র, কৃপা নাই বরুণের বক্ষে।
বৃত্রারি নিজে হলো অকরুণ বৃত্র, বহ্নিই জীবগণে রক্ষে ॥
ক্ষেত্রের ডালি শোভে নবশালিধান্যে, আলি তার শোভে দ্রোণ-অর্কে।
থালি শোভে পিষ্টকে মধুপরমান্নে, জাগে ভোগ কোটি মধুপর্কে ॥
হিমবায়ু বাড়াইল বিরহজ বিকারে, বিরহীর কিবা অবলম্ব ?
পরাণ বাঁচাতে স্মরে আজি প্রাণাধিকারে, স্মরে তার ঘন পরিরম্ভ ॥

দীর্ঘ রজনী পেয়ে প্রণয়ের নাটিকা অভিনীত একাদশ অঙ্কে।
বহু নায়িকার রূপ ধরে গৃহনায়িকা মানভান করে নিঃশঙ্কে ॥
সহজ রমণীরাগ এ-নিশীথে প্রকাশে, মুগ্ধা সে সহসা প্রগল্‌ভা,
নব মধুরিমা মিলে পুরাতনী সকাশে, স্বীয়া আজি পরকীয়াকল্পা।
বঁধু চায় কান্তা-রে আরো ভালবাসিতে গাঢ়ালিঙ্গনে টানে অঙ্গে।
অশ্রুবেপথু স্বেদ সীৎকার হাসিতে ষড়্‌ঋতু-লীলা বধূ সঙ্গে ॥

গদ্যবসন আজি পরিহিত শরীরে, পদ্য-বিলাস নাহি বস্ত্রে।
জলকৌতুক শেষ, পরিহৃত তরীরে শিল্পী পীড়ন করে অস্ত্রে ॥
তাম্বূল সম্বল বিলাসোপকরণে,—কম্বল সুখাসন অন্য।
নারিকেল-ক্ষীর আজি হেয়, তৃষাহরণে পেয় নারীকুল-মুখ-মদ্য ॥
সুখ নাই হীরামণিমৌক্তিকহিরণে, কিরণে যায় না হিম-খরতা।
পীবর-তরুণীতনু-সুনিবিড়-পীড়নে ঘুচে যুবজন-তনু-জড়তা ॥
স্মর-শর আজি বিঁধে' গাঁথে তনু তনুতে, হৈমমিলন অবিভাজ্য।
নিশ্বাস-বিনিময়ে অণু মিশে অণুতে, যুগ্মে ভরিল প্রেমরাজ্য ॥*

* কতক অংশ ঋতুসংহার হইতে গৃহীত।

বাউল বসন্ত

মোদের কানন-পথটি দিয়ে যাচ্ছ তুমি কোন্ বিদেশে ?
কোন্ অজানা পথের তুমি যাত্রী ?
কোথা হতে আস্‌ছ পথিক, পথের ধুলায় ধূসর বেশে ?
যে হও তুমি কাটাও হেথা রাত্রি।

ঢাল্‌ছ কানে কলস্রোতে কল্পলোকের অনুভূতি,
কর্‌ছ প্রাণে স্বপ্ন-সুরা বৃষ্টি।
চেনা গলার জানা গীতি শুনে শুনে শ্রান্ত শ্রুতি,
অর্থহারা পরদেশী তাই মিষ্টি।

আম-বাগানের সরাইখানায় কচি পাতায় আসন পাতো,
মোচন কর দু'দিন তোমার শ্রান্তি,
মুকুল-সুরা সেবন ক'রে গাহাও গাহো, মাতাও মাতো,
ঘটাও তুমি ভুবনভরা ভ্রান্তি।

শুক্‌নো লতায় গজায় পাতা, এলোমেলো উদাস উদাস
বাতাস বহে, হুতাশ করে সৃষ্টি,
'আফল' খেলে মন-মীনেরা, উষ্ণ হলো নাসার বাতাস,
হরিণ-চোখে চপল হলো দৃষ্টি।

বল্‌গা বাঁধন আল্‌গা পেয়ে সবাই করে পালাই-পালাই
পান্থশালায় কণ্ঠ তোমার ছুট্‌লে,
নিখিল জগৎ বাউরা হলো বাউল গানে, এ কী বালাই !
কোথা হতে এ পড়শে জুট্‌লে ?

ভবের হাটে কাজের ঠাটে বিধিবিধান নিয়মকানুন
করলে বেবাক বাতিল ছত্রভঙ্গ,
সুরের ধ্বজায় তুল্লে এ যে বিদ্রোহ দুর্দান্ত দারুণ,
পথের পথিক, তোমার এ কি রঙ্গ ?

গগন-পথের পান্থ ওগো, তোমার সনে অসীম পানে
উড়ে যেতে সবারই উৎকণ্ঠা,
পরের কথাই বল্‌ছি কেন, সুদূর স্মৃতি তোমার গানে
বিধুর ক'রে তুল্‌ছে আমার মনটা।

ছট্‌কে পড়া মনকে আমার কেমন ক'রে আট্‌কে রাখি,
কেমন ক'রে করি বা তায় ঠাণ্ডা,
ঘরের মাঝে হাজার কাজে কেমন ক'রে আবার ডাকি,
তীর্থপথের ওগো চতুর পাণ্ডা ?

কম্পিত এই হস্তে গোছাই কেমন ক'রে খুঁজে খুঁজে
যন্ত্রপাতি ঝাঁকা ঝুড়ি ভাণ্ড,
নেব আপন গণ্ডা আবার কেমন ক'রে বুঝে সুজে,
ওগো বেতাল, কেমন তোমার কাণ্ড !

অসীম হতে অসীমে যাও সসীম লোকের মধ্য দিয়া,
কাটাও হেথা পানোৎসবের রাত্রি,
আমার আদিম জন্ম-লোকের স্মৃতিটুকুন উদ্বোধিয়া
যাচ্ছ চলে কল্পলোকের যাত্রী !



যৌবনের আবেদন

নব আষাঢ়ের শুভ বাসরের মুরজতান
অলকার বাণী কানে দেয় আনি, শিহরে প্রাণ।
ছুটেছে রুধির শিরায় শিরায় চঞ্চলিয়া,
উঠেছে মদির মনে বনে নীপ মঞ্জরিয়া।
আজি কালবশে মত্ত আমার এ যৌবন,
হে চিরতরুণ করিছে করুণ আকিঞ্চন।

আজি দায়ভার দূর কর তার, ক্ষমিয়া মোহ,
সব অপরাধ, অবোধ প্রমাদ, চপল দ্রোহ।
মধুমাসে যথা পিকেরে ভ্রমরে চকোরে ক্ষম',
শরতে যেমন মরাল সারস মকরে ক্ষম',
আজিকে যেমন ক্ষমিছ শিখীর মদোৎসবে,
তেমনি নিলাজ যৌবনে আজ ক্ষমিতে হবে।

ঝুলনের দিন মিলনের দিন এসেছে আজ,
আজি যৌবনে ক্ষমিবার দিন, হে রসরাজ।
আজি যদি তুমি নাই ক্ষম' তার চঞ্চলতা,
চপল কিশোর, ব্রজলীলা তব কথার কথা।
গোলোকে থাক' না, থাক' তুমি তবে ব্রহ্মলোকে,
মিছে কথা তবে কেঁদেছিলে কবে সীতার শোকে
গীত-গোবিন্দে তবে নাই, শুধু গীতায় রহ,
মদনমোহন নহ, মদনের পিতাও নহ।

জীবন-সংগ্রাম

কে বলে মরণ জয়ী ? জীবনের বিজয়-বিস্তার
হের কবি বিশ্ব ভরি', শোন' তার জয়-জয়কার।
সর্বত্র রুধিয়া দ্বার মৃত্যু রহে আগুলিয়া পথ,
কোথা সে বারিতে পারে জীবনের বৈজয়ন্ত-রথ ?
বন্যা আসে, স'রে যায়—বাড়ে তায় শস্যেরই সম্ভার,
তটিনীর কূলে কূলে কীর্ণ হয় শ্যামল প্রসার।
ঝঞ্ঝা আসে, ভাঙে শাখা, ভগ্নক্ষতে সহস্র অঙ্কুর
ছুটে আসে ;—ঝরে ফল, ছিন্ন করে প্রশাখা প্রচুর,
জন্মে নব নব তরু। দেন রুদ্র পিনাকে টঙ্কার ;
শত শত মরে তায়, প্রাণ পায় হাজার হাজার।

জ্বলে বনে দাবানল—দহি' তারে বানায় সাহারা,
ভস্মরস পেয়ে তায় ধূলিলীন আছিল যাহারা,
তাহারা গহনতর রচে বন বিজয় উল্লাসে।
মরুরে বিজয় করি মরুকুঞ্জ শ্যাম হাসি হাসে,
খর্জুর-পত্রের ধ্বজা তুলি উচ্চে। উষ্ট্রযূথ ধায়
অনায়াসে ক্ষুণ্ন করি মরুবক্ষ চরণের ঘায়।
নিদাঘপ্রারম্ভে তার জয়যাত্রা তুষার-মণ্ডলে,
শ্যামলে ভরিয়া দিতে প্রাণহীন নীরক্ত ধবলে,
হেমন্তেও তার শক্তি হিমতলে রহে প্রতীক্ষায়
পাণ্ডুর শৈবালরূপে, বল্গামৃগ সে সন্ধান পায়।
ক্ষুরাঘাতে হিমশিলা ভাঙি করে বল আহরণ,
তুষার-কুটীরবাসী নরগণে করে সে ভরণ।

লক্ষ লক্ষ যুগ ধরি রক্তকীট আপনার হাড়ে
জীবনের জয়স্তম্ভ গড়ি তুলে মৃত্যু-পারাবারে।
হিমার্ত মরণপুরে বসন্তের শোন' জয়ধ্বনি।
জিয়ায় আতপদগ্ধে বরষার বিশল্যকরণী।
চরণে মরণ হানি' রচে নর পথ চলিবার,
দূর্বার দুর্বার সেনা ধূলিসনে যুঝি অধিকার
করে তারে। জলাশয়ে গড়ে নর শিলার সোপান,
জলগর্ভ হ'তে উঠি জীবনের শ্যাম অভিযান
নিজ বর্ণে রঞ্জে তারে করি গ্রাস। ভূপঞ্জর জিনি,
দীর্ণ করি অঙ্গ তার অসিলতা জাগে বিজয়িনী।
ধরার পঞ্জর দিয়া রচি পুন জীবনপিঞ্জর,
অট্টালিকা হর্ম্য সৌধ নানা নামে ডাকে তারে নর,
লতাগুল্মে লূতাচক্রে পারাবত-পেচক-ইন্দুরে
জীবন বেড়িয়া তারে ধীরে ধীরে বসে সেথা জুড়ে'।
জীবনে বরণ করে শিলাময় জড়ের মন্দির
অশ্বত্থ-বটের মূলে সরীসৃপে মণ্ডিয়া শরীর।

শ্মশানের চর্ম-শৃঙ্গ-স্নায়ুশিরা-করোটি-কঙ্কালে
জীবন সঙ্গীত রচে, জীবলোক নাচে তালে তালে।
কীটের শ্মশান হ'তে আনি সূক্ষ্ম কোষসূত্রজাল,
অলক্ত-রুধির ধারা, আনি শঙ্খ, প্রবাল-কঙ্কাল
সমুদ্র-শ্মশান হ'তে, নারীরে সে করে শোভাবতী,
মরণের অর্ঘ্যে সেজে হিন্দু-সতী হলো আয়ুষ্মতী।
মৃগের শ্মশান হ'তে মৃগমদ করি আহরণ
কস্তুরী-ভৈরব রসে মরণেরে জিনিল জীবন।
তুলসীকঙ্কালে ভক্ত ধরে কণ্ঠে মরণের স্মৃতি,
হরিনামধ্বনি তায় জয় করে তার মৃত্যু-ভীতি।

শ্মশানের বিভীষিকা নির্জনতা ঘুচায় জীবন।
করোটির রন্ধ্রমুখে প্রেমগীতি গায় সমীরণ,
শকুনি কুক্কুর ফেরু মহানন্দে মহোৎসব ক'রে,
কোটি-কোটি কৃমিকীট কঙ্কালের কুহরে বিহরে,
মজ্জায় জীবন ধরে। শ্মশানের কন্থাখানি জুড়ে',
হাজার তূলার বীজ ভ'রে উঠে হাজার অঙ্কুরে।
অনামিকা লতা এসে দগ্ধ বংশখণ্ডেরে জড়ায়,
চিতার অঙ্গার লুপ্ত ছত্রিকার অঙ্গপীনতায়।

মৃত্যুরোগ? তারো মাঝে হেরি মোরা জীবনেরই জয়,
সে যে লক্ষ প্রাণময় বীজাণুরে করেছে আশ্রয়!
মরণের জটাজূট পরিপূর্ণ মৎকুণে উৎকুণে,
সরীসৃপে ভরা ঝুলি,—অস্থি তার কীটজীর্ণ ঘুণে।

ভ্রান্ত মোরা ভয় পাই মরণের আপাত প্রসারে,
শতের মরণ দেখি,—দেখি না যে লক্ষ জিনে তারে।
জীবন্ তপস্যা করে নব বলসঞ্চয়ের তরে,
তাহারে হেরিনা তাই অবিরামই যুঝিতে সমরে।
শবাসনে বসি যবে করিছে সে শ্মশানে সাধনা
ভাবি বুঝি নির্জিত সে, মরণেরি করে আরাধনা।
রূপ হ'তে রূপান্তরে যখনই সে করিছে প্রয়াণ
পরাজয়ে বরাভয় না বুঝিয়া হই মুহ্যমান।
মানবাত্মা যায় যবে মৃত্যুপথে মৃত্যুহীন লোকে।
মরণ করিল গ্রাস মোরা ভাবি,—কাঁদি তাই শোকে।

উভয়-ভারতী

শাপভ্রষ্টা সরস্বতি, এলে বুঝি ভারতীর রূপে
মণ্ডনমিশ্রের গৃহে, দীনবেশে পুঁথিপত্র স্তূপে
করিলে অজ্ঞাতবাস। শঙ্করের প্রচণ্ড জিগীষা
প্রকট করিল নব সাধনায় তোমার মনীষা।
তারপর ব্রহ্মপুত্র সহ হলো মিলন পদ্মার,
শঙ্করের কণ্ঠে তুমি মহাশক্তি করিলে সঞ্চার।
বহু সাধনায় তাঁর রণার্জিতা শিষ্যা অনুব্রতা
তপোলব্ধ বিদ্যাসমা,—পুণ্য তব ইতিহাসকথা।

আজি স্মরি সেই দিন—ভারতের সে গৌরবদিন,
যেদিন শঙ্কর করি দিগ্বিজয়-পতাকা উড্ডীন,
অতিথি তোমার দ্বারে, তর্করণে পতিরে তোমার
করিল আহ্বান, তায় তোমা ন্যায়বিচারের ভার
দিল তর্কমল্লগণ। গুণিজনে গুণই পূজাস্থান
নহে বংশ, বয়োলিঙ্গ, এ বাণীর করিতে প্রমাণ।
যাদের মানস-মাতা নারীরূপা দেবী সরস্বতী
কেমনে নারীত্বে তব সঙ্কুচিত হবে তারা, সতি?

প্রাণাধিক পণ রাখি তর্ক-রণ!—জিনিলে শঙ্কর
মণ্ডন মুণ্ডিয়া শির হবে তাঁর শিষ্য অনুচর,—
শঙ্কর নির্জিত হ'লে দণ্ড ভাঙি করিবে বরণ
মণ্ডনের শিষ্যরূপে নত শিরে গৃহীর জীবন।
চিরতরে স্বামী সহ বন্ধচ্ছেদ প্রত্যাসন্ন জানি',
শিষ্যপরিষদ মাঝে দুর্বিষহ পরাজয় গ্লানি,

পাণ্ডিত্যের অভিমানে দণ্ডাঘাত মৃত্যুসম তবু
সত্য যে সবার বড় ভুলিলে না,—ভুল' নাই কভু।
মণ্ডনের পরাজয় দৃঢ়কণ্ঠে করিয়া ঘোষণা
রাখিলে সত্যের মান, ধন্য তুমি ধন্য বীরাঙ্গনা।

জানি না, জাগিল কিনা, পতিব্রতা, তব মনে মনে
কোন দ্বন্দ্ব, কোন দ্বিধা, জীবনের মহাসন্ধিক্ষণে,
প্রেম সত্য পরস্পরে মাতিল কি সংশয়-সমরে
বাহিরের বিতণ্ডার সাথে সাথে তোমার অন্তরে
রক্তাক্ত সত্যের কণ্ঠে জয়মাল্য করিলে অর্পণ ?
অশ্রু দিয়ে করিলে কি বিজয়ীর বিজয়তর্পণ ?
জানি না সে সব কথা, জানি শুধু জিনি সব বাধা
সত্যব্রতা পতিব্রতা রাখিয়াছ সত্যেরি মর্যাদা।

সত্য চিরজয়ী হোক,—প্রেম সেও তবু তুচ্ছ নয়
অন্তর্গূঢ় ব্যথা কি মা জাগায়নি এই পরাজয় ?
অভিমানদৃপ্ত কণ্ঠে কহিলে মা, "ধন্য হে শঙ্কর,
আজি এ বিজয়ে তব বিস্ময়বিমুগ্ধ চরাচর,
কিন্তু এ'ত অর্ধোদয়, অর্ধ তব রহিয়াছে বাকি,
মোরে জিনে পূর্ণ কর—আমি তোমা তর্করণে ডাকি।"

চলিল বিতণ্ডারণ দিনত্রয় এবে অবিশ্রাম,
শার্দূলের সঙ্গে তুমি সিংহীসম করিলে সংগ্রাম।
বেদ সাংখ্য তন্ত্র গীতা সংহিতার সমস্যা অশেষ
মন্থন করিলে দোঁহে। সর্বশক্তি নিঃশেষে নিবেশ
করি মা বর্ষিলে কূট-প্রশ্নবাণ শত তীক্ষ্ণতম,
বিফল, শঙ্কর-দেহে অর্জুনের শরবর্ষসম।

সমস্যাজটিল জাল চারিপাশে করিলে বয়ন,
শাণিতধী প্রতিদ্বন্দ্বী একে একে করিল ছেদন।
সমগ্র সভাটি হলো শ্রুতিময় স্ফারিত-নয়ন,
নিরুদ্ধ নিশ্বাসে তথা কাঁপে তার উৎকণ্ঠ জীবন।
সংশয়ের হিন্দোলায় জয়লক্ষ্মী দুলি বার বার
শঙ্করের শিরে শেষে পাণিপদ্ম রাখিলেন তাঁর।

দিগ্বিজয়ী সহ তব দয়িতের তর্ক-রণফল
জানি না করিল কিনা নারীচিত্ত চঞ্চল বিহ্বল,
জয়দৃপ্ত পৌরুষের সহ রণে নারীত্ব তোমার।
হলো কিনা অসংবৃত, কেবা জানে সন্ধান তাহার ?
সন্তানে মর্যাদা দিতে গূঢ় কোন’ ইষ্ট সাধিবারে
সাধ ক’রে পরাজিতা বাগ্দেবী কি তোমার মাঝারে ?
অথবা প্রেমেরি তরে অনুসরি স্বামীর নিয়তি
পরাজয়চ্ছলে শেষে পতি-ব্রত বরিলে কি সতি ?

জাগে চিত্র মনে, দোঁহে অনুগামী হলে বিজয়ীর,
অদ্বৈতবাদের পিছে দ্বৈতবাদ যেন নতশির।
বেদদ্বেষী নিরীশ্বর বৌদ্ধদর্প করিতে দলন,
নবরূপে বিশ্বে যেন ঋক্-যজু-সামের মিলন।

তিনের মনীষা যেন শঙ্করের ত্রিশূলে সংহত,
‘বলা অতি-বলা’ যেন কৌশিকের হ’ল অধিগত।
মণ্ডনের গৃহধর্ম-জীবনের হইল মরণ,
লভিতে নবীন জন্ম সহমৃত্যু করিলে বরণ ?



জলরাণী

মকরপতির ককুদে বিরাজ করে
গৌরবে জলরাণী—
নদনদীদের গদ্‌গদ নাদে ভরে
সদা তার রাজধানী।
দশন হইতে হাসিলে মুকুতা ক্ষরে,
অধর হইতে প্রবালের ধারা ঝরে,
কথাটি কহিলে চলে সম্ভ্রমে ডরে
স্রোতে পোতে কানাকানি।
তারাদীপে তার আরতি করিছে দিগন্তে ইন্দ্রাণী॥

নক্র করিছে বক্র করিয়া গ্রীবা
আদেশের অবধান।
দিক্‌করিকরে রচিত তোরণে কিবা
বৃংহণ—জয়-গান।
শিরে তরণীর বিতানপ্রতান ওড়ে;
শীকর-নিকর-জনিত জড়িমা ঘোরে,
মন্থরানিল,—অঞ্চল তার ভ'রে
কল কল তুলে তান।
মৃণালতন্তু-দুকূলের নাই অকূলেও অবসান॥

শফরী-নয়নে সরসী কাজল আঁকে
নীলাব্জ-নীলিমায়,
বরুণছত্র বারুণী ধরিয়া থাকে
সঘন গগন গায়।

সারসবৃন্দ ব্যজন করিতে ছুটে,
পুণ্ডরীকের চামর,—চঞ্চুপুটে।
চরণোপান্তে মরাল-দূতেরা জুটে,
বার্তা বহিয়া ধায় ;
মীনগুলি রচে কটিতট বেড়ি রজতের মেখলায় ॥

বারিকুঞ্জর কুম্ভ ভরিয়া আনে
তীর্থের জলে নিতি,
তিমিরাজ করে সলিলোচ্ছ্বাসদানে
অভিষেক যথারীতি।
তপনবিম্ব-ললাটিকা শোভে ভালে,
অঙ্গরাগের সুষমা ইন্দু ঢালে
বলাকা-মালিকা গলে দুলে, শৈবালে
কল্পিত তার সীঁথি,
সন্ধ্যা-প্রভাতে সিন্ধু-শকুন গাহে বন্দনা গীতি ॥

অর্পে সাদরে ভূধর-লক্ষ্মী তার
গৈরিক উপায়ন।
ক্ষেত্রকানন পত্রপুষ্প-ভার
করে পায় নিবেদন।
ব্যজনীপবন জননীর চুম্বন
দৃষ্টিতে তার লভেছে সম্মিলন,
বুলায়ে তপ্ত আঁখে মায়া অঞ্জন
ঘুমে করে নিমগন।
সুরভিত তার বদন-মারুতে কমল-কুমুদবন ॥

গম্ভীরনাদী কম্বু একটি করে—
ঘোষিছে বিজয়বাণী ;
কড়ি-দিয়ে-রচা মণি-মঞ্জুষা ধরে
আরেক মঞ্জু পাণি।
ক্লিষ্ট ললাট তাপজ্বালা রাখে পায়,
তরুছায়াময় মরু তার করুণায়,
ত্যজি বিদ্রোহ হুতাশন ক্ষমা চায়
চির পরাজয় মানি।
বরাভয় লয়ে,—রাজে বৈভবে গৌরবে বরুণানী ॥

কালোরূপ

ভোমরা, তোরে কুরূপ বলে? হলেই বা তুই কালো
তোর রূপে যে বনরমার শ্রীমন্দির ঐ আলো।
সুন্দরের বন্দনার তরে কুঞ্জবনে কে গুঞ্জরে?
তোর সুষমার যোগ্য আদর কুসুম-বধূই জানে।
রসোৎসবের তুই দেবতা, সে কি শুধু কথার কথা?
সুষমা তোর মূর্তিতে নয় মূর্ছিত হয় তানে।
হলিই বা তুই কালো—
অনিন্দ্য তুই, সুন্দরে তুই বাসিস্ যে রে ভালো।

ও কালো মেঘ, লোচন-রুচির, যদিও তুই কালো।
বুক চিরে—তুই ফুটাস চিরসুন্দরেরই আলো।
ইন্দ্রধনুর স্বপন দেখিস, চন্দ্ররেণু গায়ে মাখিস,
অধীর শিখী নাচে যে তোর মেদুর পরশনে ;

যক্ষযুবার বার্তা বহি   সুন্দরীরে আসিস কহি
অধরে তোর সুধার ধারা বর্ষণে—আর স্বনে।
হলিই বা তুই কালো—
সুরাঙ্গনা অঙ্গনে তোর সুবর্ণ ছড়ালো।

ওরে গভীর দীঘল দীঘি, হলিই বা তুই কালো,
তোর কূপে যে উঠল ব্যেপে সবার রূপের আলো।
রূপের মোহে মরাল ছুটে,   রূপ ছড়ায়ে কমল ফুটে,
সোম-তপনের প্রেম-স্বপনে উজল তনুখানি।
রূপসীরা স্নানের ছলে   নোয়ায় মাথা চরণতলে,
তোর মুকুরে মুখ দেখে কি রূপনগরের রাণী ?
হলিই বা তুই কালো—
বনশ্রী তোর আলিঙ্গনে বরাঙ্গ জুড়ালো।

ওরে আঁখি কাজলবরণ, যদিও তুই কালো,
তোর বিহনে গভীর আঁধার বহ্নি-রবির আলো।
সুন্দরের এ সৃষ্টি শোভন   তুই করেছিস দৃষ্টিলোভন,
চাঁদ তারকা মাগে জীবন তোর তারকার কাছে।
তুই অনিমিখ, রূপের পানে   মুদেও থাকিস্ রূপ-ধেয়ানে।
রসাঞ্জনে ভূষিয়া দীপ তোর পরসাদ যাচে।
হলিই বা তুই কালো—
শিল্পীরা সব কটাক্ষে তোর কল্পনা ছুটালো।

মনচুরি

খুলিয়া ব'সে ছিল ভুলিয়া, এলোমেলো মঞ্জুবিভবের মঞ্জুষা,
উষা অকুণ্ঠিতা যেন অ-গুণ্ঠিতা বিথারি নন্দন-বনভূষা।
দৃষ্টি এনেছে সে সৃষ্টি-মধুরিমা হরণ করি মনোমূর্তিটি,
নিয়েছি আঁকি বুকে আলোকছায়াপাতে অলোক-সুষমার স্ফূর্তিটি।
বীণাটি লয়ে করে পরমাদরভরে যক্ষ-রমণীর ভঙ্গীতে,
আত্মহারা ছিল কোকিল-কণ্ঠের দক্ষ রাগিণীর সঙ্গীতে।
দূরেও র'য়ে মোর যুগল শ্রুতি চোর হয়নি সম্ভোগে বঞ্চিত,
এনেছে হরি তারা কণ্ঠমধুধারা, স্মৃতিতে শ্রুতিসুখ সঞ্চিত।
পরশ উপাদেয় নয়নে অনুমেয়, ও দেহ ছুঁয়ে বায়ু সঞ্চরি'
আভাসখানি তার হরিয়া আনি দিল, পুলকে তনু উঠে মঞ্জরি'।
অলক নিয়ে তার খেলিতে অনিবার সে চোরে দিল মৃদু বিশ্বাসে।
সঙ্গ-মধুরিমা অঙ্গ-পরিমল লভিনু তাই মোর নিশ্বাসে।
এমনি করি সব হরিয়া বৈভব ফিরিতে গৃহপানে উল্লাসে,
দেখি যে মোর পানে ব্যঙ্গশর হানে দুপাশে লতিকার ফুল হাসে।
সহসা খুঁজে দেখি, ঠকেছি, হায় একি, কখন গেছে মোর মনচুরি,
সে হারা মন লাগি চোরের সন্ধানে আজিকে সারা ত্রিভুবন ঘুরি।

আগ্নেয়ী

অয়ি আগ্নেয়ি, কি অনল তুমি প্রাণের স্নেহে
জ্বালিয়া রেখেছ, জ্বালা-লাবণ্য উছলে দেহে।
হৃদয়ে তোমার আগ্নেয়াচল,
রোমে রোমে তব জ্বলে দাবানল,
লকলক শিখা অঙ্গুলিগুলি শোণিত লেহে।

বিনা সোহাগায় ঠোঁটের আগুনে সোনাও গলে,
নিশ্বাসে তব জলের কমলও ঝলসি ঢলে।
নয়নে তোমার যে অনল ক্ষরে,
স্মর ছাড়া তায় সবি পুড়ে মরে,
সেই শুধু জাগে ভস্ম ভেদিয়া দ্বিগুণ বলে।
জ্বালাময়ি, তুমি হাসিছ তাতেও ভরসা কই?
আশার শস্যে খরতাপ যেন ফুটায় খই।
ধূমপুঞ্জেরে কুণ্ডলী করি'
বেঁধেছ ও শিরে ভুজগকবরী
নীলবাস দহি অনলের আভা ফুটিছে অই।

ও অনলে মোর পুড়ে যৌবন, পুড়িছে রূপ,
ছন্দোলীলায় গন্ধে মিলায় হইয়া ধূপ।
জীবনযজ্ঞ কামনা-হবিতে
জ্বলে জ্বালাময়ি তব বহ্নিতে,
শোণিত-সিক্ত ভোগলালসার যজ্ঞযূপ।
ও অনল জ্বলে মম স্নায়ুশিরা ধমনী জুড়ে,
এ মূঢ় অঙ্গ হ'য়ে পতঙ্গ ঘেরিয়া ঘুরে।
ও অনল শোষে সব সুখরস
পুড়ে যায় মোর লোভ-লাভ-যশ,
গ্রন্থ-তন্ত্র-অসি-কেতু-রথ সকলি পুড়ে।
জানি ও অনল নিভিবে না মম তনু না দহি',
সে দিনের আশে অগ্নিহোত্রি-জীবন বহি।
যে মিলন হেথা হলো না গহন
পূর্ণ করিবে তোমার দহন,
ও তনু-চিতায় সহমরণের আশায় রহি।

জীবন-যজ্ঞ

কোন্ বনে কোন্ শমী-সমিধের গূঢ় মর্মতলে
প্রসুপ্ত ছিলাম আমি কত যুগ, সহসা সবলে
আমারে মন্থিলে তুমি, অগ্নি-মন্থ মন্ত্র-উচ্চারণে
টানিয়া আনিলে বিশ্বে, বিশ্বহোত্রি, অরণি-ঘর্ষণে।
তারপর হতে লক্ষ জীবদেহ-যজ্ঞ-বেদী 'পরে
জ্বলিতেছি লেলিহান্ জিহ্বা মেলি আহুতির তরে।
কভু বা পিঙ্গল, কভু নীল দ্যুতি, কভু বা অরুণ,
ধূমপুঞ্জে কভু করি তব নেত্রে কষায় করুণ।
অনন্ত অতৃপ্তিময় এ অনলে আজ্যধারা দানে
সাধিবারে কোন্ ইষ্ট চাহ তুমি, তৃপ্তির সন্ধানে?

সান্ধ্য-হোম করি শেষ ভৃঙ্গারের শান্তিজল সেচে
ভস্মগুপ্ত ক'রে রাখ, মৃত্যুতলে রই তবু বেঁচে
স্ফুলিঙ্গের রূপে, প্রাতে পুনর্বার সমন্ত্র ফুৎকারে
জাগাও কুণ্ডের গর্ভে, জ্বলি শুষ্ক রসনাবিস্তারে।
দিনে দিনে, বর্ষে বর্ষে, যুগে যুগে একই অনুষ্ঠান,—
মনে হয় এ তোমার অগ্নি লয়ে লীলা অনিদান,
নহে ব্রত, নহে যজ্ঞ তুষিবারে আহুতি-লোলুপে,
তব লীলা-তৃষ্ণা আমি জ্বলিতেছি অনলের রূপে।
জানি না লীলার তৃষ্ণা কবে তব পাবে অবসান,
জন্মে জন্মে দিন দিন জ্বলিব না—লভিব নির্বাণ।

———

শৈশব-সঞ্চয়

অলস অসার বিফল আমার যৌবনের এই আহরণ,
রত্নকোষে যত্নভরে সঞ্চয়ে আজ নেইক' মন।
অতৃপ্ত্য সম্ভোগের তৃষা তৃপ্তি খুঁজে দিবস নিশা,
আবাহনের সাথেই আজি কই বিদায়ের সম্ভাষণ,
কোন' কাজেই লাগ্‌ল না হায় যৌবনের এই উপার্জন।

তৃষিত এই নেত্রে আমার সেই দরদী দৃষ্টি নাই,
বে-দরদী দৃষ্টি দিয়া হয় না কোন' সৃষ্টিটাই।
মক্ষাজীবন হেলায় ত্যজি প্রজাপতির মতন মজি'
যৌবন আমার যোগাল' না সৃজন-উপকরণ তাই,
তূলী হাতে শৈশবের সেই স্বপ্নলোকের শরণ চাই।

শৈশবের সেই সঞ্চয়ই আজ পুঁজি আমার যৌবনে,
আজকে আমার আঢ্যতা তাই তারি উপঢৌকনে।
বাল্য প্রাণের অনুভূতি মুগ্ধতা বিস্ময় আকূতি
তাজা আছে স্মৃতির পুটে তপ্ত শোণিত-রঞ্জনে,
লক্ষ্মীছাড়া যৌবনে আজ ধনী আমি সেই ধনে।

প্রকৃতি-মার অঙ্গনে মোর ছিল তখন সঞ্চরণ,
তরুলতায় চন্দ্র তারায় পেতাম সদাই আমন্ত্রণ।
হইনি তখন সুকৌশলী ছিলাম কেবল কৌতূহলী,
ব্যয় ছিল না—কেবল ছিল সঞ্চিত ধন সংগোপন,
আজ তাদের এ শিল্পশালায় পাচ্ছি ফিরে অনুক্ষণ।

নদীর বেলায়, কলার ভেলায়, ঝুলনদোলার উৎসবে,
মাঠের বাটের ধূলাখেলায়, বনবাগানের সৌরভে,
যে আনন্দ, যে সুষমা পেলাম, তাহার সবই জমা,
হারায়নিক একটি কণা। আজকে স্মৃতি-গৌরবে
যৌবনে মূলধন করেছি শৈশবের সে বৈভবে।

গন্ধে রূপে রসে বোঝাই নৌকা কতই আজ ভিড়ে
রঙিন আশার পা'ল উড়িয়ে যৌবনের এই পূব তীরে।
কল্পকপোত উড়ে উড়ে জুট্‌ছে আমার চিত্ত জুড়ে'
বাল্য-স্বপন করছে কূজন আমার কলামন্দিরে।
বাল্য-স্বরগ হতেই রসের মন্দাকিনী বয় ধীরে।

হারায়নি সে শিশুশোকের অশ্রুবারি এককণা।
শুকায়নিক কুহেলিকায় কোন' কোরক-কল্পনা।
উন্মাদনা ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ দিগন্তে তাও হয়নি বিলীন,
যৌবনের এ তন্ত্রীতে আজ লভে সবাই মূর্ছনা,
ছন্দে লভে ঝঙ্কৃত রূপ,—বর্ণে অভিব্যঞ্জনা।

প্রেম ও শিল্প

তোমার মাধুরী-রসে কবির লেখনী সিক্ত,
হে প্রেম সুন্দর,
মনের অমৃত-যোগে করে তারা যুগে যুগে
তোমারে অমর।

এ মর্তে তোমার কীর্তি-কীর্তনের লাগি হ'ল
সাহিত্য-সম্ভব,
লোকে লোকে হল শ্লোক-মুক্তাফল ও চোখের
শোক-অশ্রু-লব।
তব গুণগানে জড় ধাতুতে ঝঙ্কার জাগে,
দারুতে মূর্ছনা।
মঞ্জীর-মুখর লাস্যে দুলিল কুণ্ডল কর্ণে,
কটিতে রশনা।

ভূষিল তোমার কণ্ঠ কানন মালিকা গাঁথি
মালতী-মল্লীতে,
মণ্ডিতে তোমার অঙ্গ ফুটিল হীরার ফুল
কনক-বল্লীতে।
ক্ষুদ্র সূচি নিশিদিন ঘুরে মরে তন্তুবনে
ও তনু ভূষিতে,
ধরিছে কীটের লালা ময়ূর-কণ্ঠের রূপ
তোমারে তুষিতে।

শিল্পীর তূলিকা সিক্ত হৃদি-রক্তে তব কর-
চরণ-রঞ্জনে,
সে তব প্রীতির লাগি রেখার পিঞ্জরে বাঁধে
শারিকা-খঞ্জনে।
কল্যাণ-যজ্ঞের ভূমে সুবর্ণ-প্রতিমা তব
ভবনে ভবনে,
হাজার তাজের সৃষ্টি তোমার স্মৃতির তরে
মর্মর-স্বপনে।

প্রেম ও পূজা

পূবের আকাশ লাল হয়ে ঐ এলো
উঠেছে ঐ শুকতারাটি জ্বলি',
ওগো বঁধু নয়ন ছুটি মেলো
জাগো আমার হৃদয়-কোষের অলি ।

পুষ্প-জীবন ফুরিয়ে এলো মোর
পূজারী ঐ আস্‌ছে হাতে সাজী,
জাগো বঁধু হৃদয়-মধু-চোর,
ভোর আরতির কাঁসর উঠে বাজি' ।

হাজার চোখে পূব আকাশে চাই
হাজার কানে শুনছি প্রতি ধ্বনি,
ফুরাল সব আর যে দেরী নাই
জাগো আমার হাজার চোখের মণি ।

বারেক জেগে আমায় বিদায় দাও
হের এ চোখ শিশিরে যায় ভাসি',
শেষ কথাটি গুঞ্জরিয়া গাও
কর্ণে বহি বিদায় নিক এ দাসী ।

দেবীর পায়ে ভিক্ষা এবার লব'
"জন্ম দিও, এবার নিয়ে প্রাণ
এমন দেশে, হয় না যেথায় তব
পূজার লাগি প্রেমের বলিদান ।"

প্রেম

হে প্রেম, তোমার পরশ বিনা তাপের জ্বালা সইত কে ?
ঘাড়-ভাঙা ভার বোঝার বালাই কার তরে হায় বইত কে ?
থাক্‌তে বিশাল মুক্ত উদার পুলিন ভূধর কানন কেদার,
লোকালয়ের অন্ধ কূপের আঁধারে হায় রইত কে ?

বলোদ্ধতের পীড়ন-জ্বালা সইত কে হায় মুখ বুজে ?
মর্‌ত কে এই মর্ত্ত্য লোকে ব্যর্থ আশার পথ খুঁজে ?
সমাজ-পীড়ন রাজার শাসন হাজার গণ্ডী হাজার বাঁধন ;
তার মাঝারে থাক্‌ত কে হায় ভেকের মত ঘাড় গুঁজে ?

ফুট্‌ল, হে প্রেম, তোমার টানে সকল পঙ্ক পঙ্কজে,
পায়ের তলের নৃ-কঙ্কালও হলো হাতের শঙ্খ যে।
বিষ হারিয়ে ব্যথার ফণী আঁধার ঘরে জ্বাল্‌ল মণি ;
বনের কাঁটা পড়্‌ল ঢাকা লজ্জাবতীর সঙ্কোচে।

কর্ম-ভোগের ঘর্মে, হরি-চন্দনে আজ স্নান করি।
বৈতরণীর কূলে র'য়েও গঙ্গা-বারিই পান করি।
দৈন্য-শরের শয্যা মম বাসর-ঘরের শয্যা-সম,
উঠল বেজে ভাঙা শানাই সেও সাহানার তান ধরি'।

হে প্রেম, তুমি কংস-কারায় কর্‌লে মোরে সংসারী।
বাঁশের পোড়া ছিদ্রপথেও তুল্লে কী সুর ঝঙ্কারি ?
জল দিয়েছ শুক্‌নো মুখে, বল দিয়েছে রুগ্‌ণ বুকে,
পথের দাহ দূর করেছ অশোক ছায়া সঞ্চারি।

রথ

ওই আসে রথ

পাদাঙ্গুষ্ঠে দিয়ে ভর কৌতূহলী নারী-নর
ভ'রে আছে সারা রাজপথ।
তরুণ বালক বৃদ্ধ কৃপণ কাঙাল ঋদ্ধ
গৃহ ফেলি' দুধারে দাঁড়ায়।
প্রহরী বন্দীর সাথে, যন্ত্রী তার যন্ত্র হাতে
পশারিনী পশারা মাথায়।
শিশুরা উঠেছে কাঁধে এ উহারে হাতে বাঁধে,
শত্রু-মিত্র সবে গায়-গায়,
ভাণ্ডার-পেটিকা খোলা ছড়ানো টাকার ঝোলা,
চোর তবু জুটেছে হেথায়।
এক পায়ে লাক্ষা পরি' কটিতে বসন ধরি'
বাতায়নে জুটে বধূ যত,
শুনিয়া মেঘের ধ্বনি রথচক্র শব্দ গণি
বার বার ভুল করে কত।

অই এলো রথ।

হুড়োহুড়ি জনদলে চারিদিকে কোলাহলে
সমবেত নিখিল জগৎ।
আগে যেতে সবে চায় কে কাহার পড়ে গায়,
নাই খোঁজ ঠেলাঠেলিমাঝে,
কেবা ডরে সিপাহীরে ? চামারও সে চলে ভিড়ে
পাশে ঠেলে ফেলে মহারাজে।

হুলুধ্বনি করে নারী লাজ বর্ষে তুই ধারই,
বাজে শাঁখ ঢোল-ঢাক-কাঁসী,
বালক হারায়ে যায় খুঁজিয়া মিলায় তায়
ফুঁয়ে-বাজা তালপাতা-বাঁশী।
রথের দেবতাটিরে হারাইয়া ফেলে ভিড়ে
মহোৎসবে সবে মত্ত হায়,
তর্ক-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দোলে মূঢ়ানন্দ কলরোলে
প্রত্যয়েরে যেন গো হারায়।

চলে গেছে রথ
নিমেষের কলরোলে কোন্ দিকে গেল চ'লে,
মিলাইল সুখ-স্বপ্নবৎ!
চক্র-চিহ্ন বুকে ধরি বক্র পথ আছে পড়ি
হাহাকার করে শূন্যতায়।
ফিরিতে আপন ঘরে মন আর নাহি সরে
ভরে হৃদি হতাশ ব্যথায়।
রথ চিরগতিশীল স্থির নহে এক তিল,
এসে চলে দিগন্তের পারে,
শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দির- সম ইহা নয় স্থির,
একবারই যায় দ্বারে দ্বারে।
তুয়ারে পেয়েও মোহে ঘটা ছটা সমরোহে
ভুলিলাম ঠাকুরে হেরিতে,
দেখি সেই চাঁদমুখ জুড়ানো হলোনা বুক,
রথ হেরি হ'ল যে ফিরিতে।

অলির প্রতি কুসুম

এস কালো বঁধু মম গাহি গান, প্রিয়তম,
নিশিদিন ডাকি যে তোমায়,
ফুল-জীবনের সার তারুণ্য, লাবণ্য-ভার
সুকুমার এ কৌমার স'পিতে ও পায়।
রূপ আছে আছে রস, রয়েছে গন্ধের যশ,
আছে স্পর্শ শীতল মধুর,
নাই সুর নাই গান, ম্লানমৌনী মূক প্রাণ,
রেণুঘন শ্বাসে তাই ব্যথায় আতুর।
পাখার পরশ দিয়া দাও তনু কণ্টকিয়া
কেশর-রোমাঞ্চে কর এ হৃদি চঞ্চল,
গাহি গুন-গুন গান অবশ এ মূক প্রাণ
কর প্রেমানন্দরসে রভস-বিভল।
তুমি বিনা সবই ছার যৌবন হয়েছে ভার
লালিত্য লুলিত তার ওগো কালোবঁধু,
সৌরভ পীড়িয়া প্রাণে রৌরব-যাতনা আনে,
কালকূট হয়ে দহে মরমের মধু।
কাব্যের বৈভব বহি আর কতকাল রহি
কবি বিনা সবি যে বৃথায়।
সঙ্গীতের উপাদান অঝঙ্কৃত ম্রিয়মাণ,
দাও সুর, দাও প্রাণ তায়।
নীরব এ নাট্য-শালা, বৃথা তায় দীপ জ্বালা,
গান বিনা অলস স্বপন,
এত ঋদ্ধ আয়োজন বিনা হৃদ্য প্রিয়জন
তারাহারা যেন দুটি অরুণ নয়ন।

কালার বাঁশরী বিনা পিয়ারী মলিনা দীনা
ফুলের দোলনা তার ধূলায় লুটায়,
কালো জলদের বাণী না মাতালে হৃদিখানি
কলাপী রূপের ছটা বিলাপে গুটায়।
কালো কোকিলের গীতি বিনা, কুহেলির স্মৃতি
কে ঘুচাবে কাননের মর্মের মর্মরে ?
বিনা দুটি কালো আঁখি, শুধু লোধ্ররেণু মাখি
আরক্ত কপোল কভু বঁধু-মন হরে ?
কালো দীঘিটির বারি জ্বালাতাপ-দাহহারী,
কালো ছাড়া উপায় কোথায় ?
কুসুম-কৌমার-চোর, এস কালো বঁধু মোর
আপনারে সঁপি তব পায়।

প্রিয়ার কৈশোর

আজিকে বসন্তরাতে স্মরি তোমা, প্রিয়ার কৈশোর,
নবযৌবনের কুঞ্জে তুমি লীলা-সহচর মোর।
মনে পড়ে স্মিতরম্য কুণ্ঠানম্র তোমার মূরতি,
আরক্ত আনত মুখে হর্ষে ভয়ে ব্যাকুল মিনতি।
স্মরি সে বাহিরে বাম লজ্জাভীরু, অন্তরে দক্ষিণ
তোমার মধুর ভঙ্গী, সন্ধ্যাম্লান নয়ন-নলিন।
পদনখে ক্ষিতিচিত্র, অঙ্গময় প্রণয়-অঙ্কুর,
মম দৃষ্টিমহোৎসব লীলায়িত গঠন বন্ধুর।
আমার কিশোর-বন্ধু, এনেছিলে রঙ্গের প্লাবন,
তব সঙ্গ লভি মম সত্য হলো স্বপ্নের ভুবন,

ইন্দ্রায়ুধময় হলো শির'পরে মেদুর আকাশ
সৌরভে গদ্‌গদ হ'লো নিশ্বাসের উন্মদ বাতাস।
মহোৎসবময়ী হলো নৃত্যগীতে দানসত্রে ধরা,
সব পেয় হলো সীধু, সব ভক্ষ্য হলো মধুভরা।
'পঙ্কজে পঙ্কজে আহা ভ'রে গেল যেথা যত জল
ভৃঙ্গে ভৃঙ্গে ভ'রে গেল নিখিলের সকল কমল।
গুঞ্জন করেনি হেন মধুব্রত ছিল না তখন,
মানস হরেনি হেন কলগুঞ্জ করিনি শ্রবণ।'

সুস্বপ্নে ভরিল সুপ্তি, মুক্তাফলে হৃদিশুক্তিতল,
অকাজে ভরিল দিন, বিভাবরী চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।
ভরিল হেমন্তসন্ধ্যা রাস-রসে মাধুরী-উচ্ছ্বাসে,
সুখদ হইল শীত পরিরম্ভে উষ্ণ ঘন শ্বাসে।
বসন্ত ভরিল মোর ফাগে ফাগে হোলীর দোলনে
বরিষা ভরিয়া গেল নিশি নিশি ঝুলনে ঝুলনে।
কবিত্বে ভরিল চিত্ত, সব বাণী ভরিল সঙ্গীতে,
প্রকৃতি বিলোল হ'ল লীলায়িত হিল্লোল-ভঙ্গীতে

আবার মাধবী নিশা কালচক্রে আসিয়াছ ফিরে।
বাজে না তোমার বাঁশী মম প্রেম-যমুনার তীরে।
পলাশে বিলাস নাই, রক্তাশোক আজি শোকারুণ,
বনের বিহগ-কণ্ঠে বাজিতেছে বেহাগ করুণ।
মূক আজি শুক-কণ্ঠ, নাহি রস রসাল-মুকুলে,
আকুঞ্চিত মঞ্জুলশ্রী নাহি বন-লক্ষ্মীর দুকূলে।
আজি ব্যর্থ রজনীতে তপ্তশ্বাস তেয়াগি কেবল,
প্রিয়ার কৈশোর, তব মধু-স্মৃতি করিয়া সম্বল!

স্বভাব-ধর্ম

প্রকট করেছ ব্রহ্ম আপনারে এই বিশ্বলোকে
নিত্যকাল। চিরদিন রসলীলা বৈষ্ণবের চোখে
ভূমায় বিস্তার তব।—'সৃষ্টি' কহে সংহিতা-পুরাণ।
মায়াবাদী কহে 'মায়া'—উর্ণনাভ-তন্তুর সমান।
যাই হোক এই বিশ্ব,—তাত্ত্বিকেরা করুক বিবাদ,
লীলা হোক্, সৃষ্টি হোক্, হোক্ শূন্য, অবিদ্যা-প্রমাদ,
পরব্রহ্ম! ছিলে তুমি প্রতীক্ষায় যুগ যুগ ধরি
বৈদিক আর্যের তরে, চিদানন্দ অন্তরে সংহরি,
সত্তা অনুভূতি ক্রমে জাগাইতে বিবর্তন মাঝে,
একথা হয় না মনে। কোনদিন অপূর্ণতা রাজে।
হে পূর্ণ, তোমার ভাবে, কোন ছেদ, কোন অঙ্গহানি,
আছিল সত্তায় তব, কারো বাক্যে আমি নাহি মানি।
আদি যদি থাকে তবে আদি হ'তে ভূমার বিস্তারে
নানা ছলে, নানা রূপে জানাওনি তুমি আপনারে?
প্রতি অভিব্যক্তি-বিম্ব পায়নি কি তোমার সন্ধান?
পালেনি কি তব ধর্ম আপনারে করিয়া প্রতান
চিন্ময়, মৃন্ময় হয়ে লতাগুল্মে কোটী কোটী জীবে
আদি হতে ঋতুচক্রে সুখে দুঃখে, শিবে ও অশিবে?
তোমারি প্রথায় সবে করে নি কি সর্ব সংহরণ
আপনারি মাঝে যাহা যুগে যুগে আপাত মরণ?
আমমাংসে দেহ পুষি গুহাশায়ী বনচারী নর
শ্মশ্রুলোমারণ্য-তনু ভাষাহীন উলঙ্গ বর্বর
অপূর্ব বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির বিরাট চত্বরে,
সীমাহীন অবসরে নিশিদিন কী বা চিন্তা করে?

বিস্ময়ে রহস্যে ভয়ে মুহুর্মুহুঃ চমকি চমকি,
ঊর্ধ্বে অধে চারি পাশে মুগ্ধদৃষ্টি থমকি থমকি,
রুদ্রতা, প্রশান্তি, সৌম্য প্রসন্নতা, বিশাল বিস্তার,
বিচিত্র বিবর্ত-লীলা, অজস্রতা, মহিমা-সম্ভার,—
বন্যা, ঝঞ্ঝা, মেঘ, বজ্র, উদয়াস্ত, কুহূ, পৌর্ণমাসী,
ক্ষুব্ধ সিন্ধু, দাববহ্নি, গিরীন্দ্রের হিম-শুভ্রহাসি,
সবার মাঝারে তারা খুঁজেনি কি আপন নিদানে ?
বিশ্বাতীতে খুঁজেনি কি এ বিশ্বের বিচিত্র বিধানে ?
ঝঞ্ঝা, বজ্র, সিংহ, সর্প, ব্যাধি, মৃত্যু হ'তে আপনায়
বাঁচাতে আরণ্য নর খুঁজেনি কি শরণ্য সহায় ?

নদ-হ্রদ-দারু-শিলা-তরু-গিরি-ভূচরে-খেচরে
রহস্যমণ্ডিত করি পূজেনি কি ভয়ভক্তিভরে,
আম মাংসে চর্মে লোমে শুক্তিশঙ্খে পত্রে পুষ্পে ফলে
পর্বতে গুহায় বনে সিন্ধুতটে কিংবা তরুতলে ?
বংশী-শৃঙ্গ নিনাদিয়া করেনি কি তোমার বোধন ?
তাদের সর্বস্ব তুচ্ছ, তাই দিয়ে করিতে আপন
চাহেনি কি তারা তবু ? জানায়নি আর্তি আকুলতা
অর্থহীন বাক্যাঙ্কুরে হৃদয়ের গাঢ় গূঢ় ব্যথা ?

অনুসরি' একই মনোবৃত্তি-ধারা একই সে প্রেরণা
মানুষ আজিও চাহে করিবারে তোমার ধারণা।
দারুশিলা বিবর্তিত রক্তমাংসে অনলে অরুণে,
খুঁজে তারা গ্রন্থে, তন্ত্রে, স্বর্গে, শূন্যে, গুণে বা নির্গুণে
নরত্বে উন্নীত আজি জীব তরু জড়ত্ব-আশ্রয়,
মৃন্ময় বান্ধব ছিলে আজি তুমি অজ্ঞেয় চিন্ময়,

মন্দির মস্‌জিদ গীর্জা রূপ ধরে গুহা তরুতল,
অর্ঘ্য আজি দম্ভভরা আত্মভোগ্য ঐশ্বর্যের ফল।
নানা সুরে নানা যন্ত্রে আজি তব মন্দিরে বোধন,
ভাষায় ঝঙ্কৃত ছন্দে স্তব নান্দী পূজা আবেদন।
সূক্ত-শ্লোক-বদ্ধ বেদ, বাইবেল, আবেস্তা, পুরাণ,
প্রথম তোমার বার্তা জানে বলি করে অভিমান।
বর্বরের নখ, দন্ত, তরুশাখা, প্রস্তর, মুদ্গর,—
লৌহে, বিষে, আণবিক সর্বঘ্নীতে লভি রূপান্তর,
সভ্য মানবের আজি নব্য-যুদ্ধে হয়েছে সহায়,
তোমার সন্ধানপথে তবু সেই বর্বরেরি প্রায়

বেশভূষা, শয্যাসন, বাসগৃহ, আহারবিহার,
রূপান্তরে বিবর্তিত।—সে ত সবি বাহ্য উপচার।
অন্তরে বর্বরে সভ্যে খুঁজে নাহি পাই কোন ভেদ,
নগ্নেরে করেছে মগ্ন মন্ত্রভারে তন্ত্র-স্মৃতি-বেদ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-নিদ্রা-লোভ-ক্ষোভ-স্নেহ-ভালবাসা,
রিরংসা-জিগীষা-ঈর্ষ্যা-তোষ-রোষ-রুধিরপিপাসা
একই ভাবে রাজে আজো। ভোগতৃষা, লালসা, বাসনা,
সমানই বর্বরে সভ্যে মেলিতেছে লেলিহ রসনা।

'কেবল সাধনা-লভ্য ব্রহ্মতৃষ্ণা সুসভ্যেরই মনে',
আমার বর্বর-চিত্ত এ প্রলাপ মানিবে কেমনে?
শিশু যথা পিতা চিনে, সভ্য চিনে তোমারে তেমনি,
বর্বর চিনিল যথা শিশু চিনে আপন জননী।
তোমারে পাইতে হ'লে পূর্ণরূপে, কহে জ্ঞানিগণ,
চাই দ্বিধাক্লেদশূন্য অকপট বর্বরের মন।

তোমার সন্ধানে ভক্ত সভ্যতার সর্ব সমারোহ
বিসর্জি, বিজয় করি ভোগ-সুখ ধনজন-মোহ,
চারবাসে ফিরে হয় গুহাগর্ভে আবার বর্বর,
হে ব্রহ্ম, কেমনে কই সে বর্বরে কর অনাদর ?
অপরা বিদ্যায় দৃপ্ত সভ্য নর আর্য অভিমানে,
রসহীন গ্রন্থে মগ্ন বৃথা রসব্রহ্মের সন্ধানে।

বর্বরের ব্রহ্মতৃষ্ণা, ব্রহ্মে কর্মফলের বিরতি
গহন দণ্ডকারণ্যে শবরীতে হয়ে মূর্তিমতী
একাগ্র করিয়া চিত্ত উগ্রতম ব্যগ্র তিতিক্ষায়
রামব্রহ্ম লাগি রয় পথ চাহি দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।
শৈশব কৈশোর দশা একে একে চলে যায় ক্রমে,
যৌবনের ধূপ দহে মৃগমদে ভরি সে আশ্রমে,
জরা এসে হ'রে লয় শীর্ণ পদে প্রতীক্ষার বল,
ধবল পক্ষ্মের তলে ক্ষীণ নেত্র করে ছলছল,
পাণিতে শাণিত করি দৃষ্টি তার হানে প্রাণপণে
পৃথ্বী'পরে পদনখে রেখা টানি দিনগুলি গণে।
বর্বরের ব্রহ্মতৃষ্ণা তবু নাহি লভিবে বিরাম,
পুনর্জন্ম ভরসায়, যাত্রাপথে চাহে না বিশ্রাম।
রামনাম উচ্চারিয়া ফেলিছে সে প্রত্যেক নিশ্বাস।
মথ্যা হবে এ আকৃতি এ অটল অখল বিশ্বাস ?

একি শুধু ত্রেতাযুগে ? আদিকাল হ'তে এই ধারা
বহমান গিরিবনে—মরুতেও হয়নিক হারা।
তোমাকে সুলভে পেতে সভ্য খুঁজে সদা ফন্দি ফাঁকি,
সারাটি জীবন ধরি চেয়ে থাকে বর্বরের আঁখি।

তুলসী

শুনি হরিগুণ গান　　　নারদের বীণাতান
　　কোন সে বৃন্দাবনে উলসি,
ভক্তের প্রাঙ্গণে　　　এলে তুমি শুভখনে
　　ঘন পুলকাঞ্চনে, তুলসি।
যেথা নাই অহরহ　　　অর্চনা-সমারোহ,
　　রাশি-রাশি ভোগ্যের বিপণি,
নাই ঢাক ঢোলে ঘটা　　　নাই ধূপ-দীপ-ছটা
　　বলি-হোম-সামে সন্দীপনী,
তুমি সেথা আছ সতি　　　নিঃস্বের সঙ্গতি
　　ভক্তের শ্যামলিত আকূতি,
একাধারে বেদিকার　　　নব ষোড়শোপচার
　　পাণিপল্লবে দীন কাকুতি !

নাই ফুলগৌরব　　　নাই ফলবৈভব
　　নাই রেণু-সৌরভ-ঘনতা,
আসেনাক ষট্‌পদ　　　তাই বুঝি হরিপদ-
　　কমলের ভৃঙ্গের জনতা।
ভক্তের অঙ্গনে　　　রচ’ তুমি তপোবনে
　　নব মায়া-কাশী-গয়া-দ্বারকা।
মঞ্জরী-শলাকায়　　　ফুটাইছ করুণায়
　　তিমিরান্ধের আঁখি-তারকা।
বৈশাখী আঁখিজল　　　ঐ শাখে অবিরল
　　ঝরে, মূলে জ্বলে মৃৎদীপালী।
কাঙালের ভিটেখানি　　　জুড়ি পল্লব-পাণি
　　পূজে তোমা দিয়ে চাঁপা শেফালি।

তব দারু দিয়া গড়া তরীখানি পাপহরা
সম্বল ভবনদীতরণে।
সর্ব বিচারভার অর্পিয়া তোমা তার
ভুলিল সে ধর্মাধিকরণে।
বিছুরের ক্ষুদকুঁড়া বহ তুমি হে মধুরা
শ্রীআননে, অচ্যুত-দূতিকা,
হ'য়ে তব সহচরী হলো সেবা-অধিকারী
কুন্দ-মালতী-বেলা-যূথিকা।

গোরাগুণ-কুতূহলী, কীর্তন-পথ-ধূলি
বসনাঞ্চলে তুলি রাখিলে।
ভবরোগে সম্বল, সব রোগে মঙ্গল
অনাময় লভি তাই মাখিলে।
তুলসি, তোমারি দাস কাশীর কৃত্তিবাস,
হরিলে তাহার মোহ-জড়িমা
করিলে বৃন্দাবন- দাসেরে দ্বৈপায়ন
গাহিতে গোরার গুণগরিমা।

বিল্বের বন থেকে শবসাধকেরে ডেকে
বামাচার-পাপ তার মোচিলে।
কেন্দুবিল্ববনী জিনি তুমি নারায়ণী
কান্ত মণির খনি রচিলে।
রাজভোগে নিঃস্পৃহ জনে তুমি স্বর্গীয়
প্রেমমঞ্জরী-দানে তুষিলে।
বিশ্বেশ্বরে টেনে নিঃস্বের গৃহে এনে
ব্রজরাখালের বেশে ভূষিলে।

যুগে যুগে নদীয়ার খেতুরি ও সাতগাঁর
গৌড়ের যত প্রেমতৃষিত
কমলা-কমলবন ত্যজি করে বিরচন
তব বনে মৌচাকে অমৃত।
কুমারহাটির মাটি সে যে কাঞ্চন খাঁটি
অঞ্চলে রাখিয়াছ যতনে।
তুমি সতী যাদুকরী ভক্তের মাধুকরী-
ঝুলি কর সন্তোষ-রতনে।
শ্রীবাসের অঙ্গনে ত্রিবেণীর সঙ্গমে
স্নাত হ'লে যেই রস-ঝারাতে
বাঞ্ছাকল্পতরু আজো সংসার-মরু
সরস রেখেছ সেই ধারাতে।

তুমি যারে ডাক সতি, দাও তারে পরাগতি,
হরিপ্রেমে 'গজপতি' ভাসে যে।
ত্যজি সুখসম্পদ গুরুপদ, রাজপদ
দীনবেশে তব বনে আসে যে।
দারুমালিকার ছলে কঙ্কালশৃঙ্খলে
ভক্ত শ্রীকণ্ঠের শাসনে,
করিয়াছ বন্দিত সংযম-কুণ্ঠিত
হরিনাম বিনা বৃথা ভাষণে।

শ্রীপদে জনম লভি তরুরূপা জাহ্নবী
তুমি দেবী বৈষ্ণব-ভবনে,
মহাযাত্রীর শিরে ছায়াখানি রাখি ধীরে
হরিনাম দাও তার শ্রবণে।

লক্ষ্মীমাসে

আজকে আমার ভরেছে খামার সোনার বৈভবে,
ধূপ ধূনা জ্বালো, শঙ্খ বাজাও, ছড়াও খৈ সবে।
বাঁউরী-বাঁধনে পালায় গোলায় বেঁধেছি লক্ষ্মীরে,
বিদায় দিয়েছি আজকে সকল ঝামেলা ঝক্কিরে।
আজকে ঘুচাবো বাকি-খাজনার বকেয়া ঝঞ্ঝাটে,
সুদ-সহ-দেনা শুধব, ডরি না নবাবে সম্রাটে।
শৈলর বিয়ে দেব ঘটা করে' আস্‌ছে বৈশাখে.
ঘরে এত কাজ, চলেনাক, 'বেচু' আনুক বৌমাকে।
নতুন করিয়া ছাওয়া হবে ঘর এবার ফাল্গুনে,
কত কি যে সুখ-স্বপনে গোপনে রেখেছি জাল বুনে!
মা'র সাথে মাসী যাক্ গয়া কাশী গোলায় ধান তুলে,
ভরতি 'করচ', কর্‌তে খরচ পারব প্রাণ খুলে।
আছে আছে মনে বেচুর মায়ের বায়না খোটধরা,
খোকার কোমরে পাটা দেব, আর তারেও গোট-ছড়া।
হাততালি দিয়ে উঠানে নাচাও স্নেহের ধনটিরে।
নতুন চালের ভোগ দিয়ে এস মায়ের মন্দিরে।
তুল্‌সীতলায় গড় কর আজ মাথাটি হেঁট ক'রে,
হাঁস পায়রারে তাড়ায়ো না, তারা খাক না পেট ভ'রে।
'বুধী'রে আজকে রেখেছি আদরে গোয়ালে চট্ ঘেরে'
নতুন খড়ের গুণে ঢালে দুধ ভ'রে সে ঘট কেঁড়ে।
আজ শুভযোগ, লক্ষ্মীর ভোগ পায়সে পিষ্টকে,
খেজুর আখের রসের যোগানে সকলি মিষ্ট যে।
তেল-হলুদের ধুমধাম আজ সরিষা অঙ্গনে,
মটরের চারা পিচকারী হানে বেগুনী রঙ্গনে।

আইড়ির বেড়া আজ ফুলে-ভরা ক্ষেতের আ'ল ধ'রে,
বরবটি-শুঁটী করে লুটোপুটি ঘরের চাল ভ'রে।
রামধনু লুটে মোর আঙিনায় দোপাটি-সীমফুলে,
অকালের হোলী খেলে গাঁদাবন আবীরে হিঙ্গুলে।
লক্ষ্মীর দয়া হেরি এ-বাড়ীর ছড়ানো চৌপাশে,
লালপেড়ে শাড়ী পরি' পাকশালে মোড়ল-বৌ হাসে।
ঘটভরা জলে ঘুচিয়েছে ধূলা গাঁয়ের 'তালবোনা',
আঁক' লক্ষ্মীর আনাগোনা-পথে পায়ের আল্‌পনা।
ধানের ধূলায় নাক ঢেক নাক' আজকে অঞ্চলে।
শোভাও অঙ্গ মায়ের পায়ের ধূসর মঙ্গলে।
সব তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে রাখ', ঘুচাও মন্‌মলা,
ঝগড়া বিবাদ ক'রো না,—লক্ষ্মী হবেন চঞ্চলা।

ভরা ভাদরে

ঘন আঁধিয়ারে ঘেরি ভাদরের সেদিন দুপুরে
বাদরের ধারাবৃষ্টি এলো নেমে দশদিক জুড়ে ;
রুদ্ধ গৃহ মাঝে বসি সুকোমল অলস শয়নে
অপূর্ব রসের হর্ষ উচ্ছলিয়া উঠিল এ মনে
অকারণে। এ মুহূর্ত যেন আজ ব্যর্থ নাহি হয়,
ভাবিনু কবিতা রচি এরে আমি করিব অক্ষয়।
একটি জানালা খোলা, তার ফাঁক দিয়ে যায় দেখা,
মুছে গেছে জলস্রোতে একেবারে দিগন্তের রেখা।
অই ফাঁকে চলে গেল অলক্ষিতে দুরন্ত কল্পনা
দিগন্তের পর পারে। হেরিতেছি আমি অন্যমনা—
ভিজিছে গাভীর দল তরুতলে, কাঁপিছে রাখাল
মলিন গামোছাখানি জড়াইয়া। ভিখারী কাঙাল

আছে আজি উপবাসে, জলে ভেজা হলো তার সার ;
কোন গৃহে সাড়া নাই—সব গৃহ আজি রুদ্ধদ্বার।
মাঠে মাঠে খাটে চাষী, এই তার খাটার সময়—
দিতে নারে ভাঙা টোকা আজি তার মাথারে আশ্রয়।
কাঙালের কুঁড়ে ঘরে থই থই করে কাদাজল,
জ্বলেনি উনুন তার, ভিজে চাল চিবায়ে কেবল
ক্ষুধানলে শান্ত করে। ক্ষুব্ধচিত্ত ব'সে গৃহকোণে
নদীপানে লুব্ধদৃষ্টি জেলে আজি শুধু জাল বোনে।

ভুবন ভাসিছে জলে,—তবু হায় কে অই রূপসী
ভিজে ভিজে চলিয়াছে দূর ঘাটে ভরিতে কলসী!
গ্রামের পিছল বাটে বধূ তার ভাঙিয়াছে শাঁখা,
কটকী পাথর-বাটি। শাশুড়ীর বাক্য বিষ-মাখা
বিঁধিছে ব্যথিত অঙ্গে। কাদা জলে বসেনিক হাট ;
পশারীরা এসেছিল পার হয়ে দূর দূর মাঠ,
তরুতলে বসি ভাবে--শিরে বহি পশারার ভার
সেই মাঠ পার হয়ে কেমনে বা ফিরিবে আবার?

ডাকহরকরা ছুটে মাঠপথে বহি বার্তাভার
দুর্যোগে দুর্গম পথ—তিন ক্রোশ ছয় ক্রোশ তার।
পথে যেতে যেতে দেখে, ব'সে গেছে কাদাপাঁকজলে
একটা গোরুর গাড়ী। ঠেলে তারে প্রাণপণ বলে
তুলে দিয়ে নিরুপায় গাড়োয়ানে পরিত্রাণ করে,
প্রতীক্ষা না করি আর আরোহীর ধন্যবাদ তরে,
চলে পুনঃ গ্রামদূত সহি পথে দুর্যোগের ব্যথা,
বহি পৃষ্ঠে জলধৌত অক্ষরের প্রাণের বারতা।
বন্ধ খেয়া-পারাপার। খেয়াতরী বাঁধি তরুমূলে

পাটনী কোথায় গেছে—কূলে বসি ভাসিছে অকূলে
পারার্থীরা নিরুপায়। তুলি দূরে ধূমের কেতন
মাঝে মাঝে তরীগুলি ভেসে যায় উল্কার মতন।
কোথাও বা দূর পান্থ বটতল করেছে আশ্রয়,
মাঝপথে এসে তার প্রাণে মনে দারুণ সংশয়,
ফিরে যাওয়া আগে চলা এবে তার দুই-ই সমান।

গ্রামান্তের রেখা লুপ্ত—অনন্ত সে পথ ব্যবধান।
আরো দূরে গিয়ে দেখি,—একি সেই সমুদ্র-সৈকত?
এরই মধ্যে অতিক্রম করিয়াছি এত দীর্ঘ পথ?
ভাল ক'রে চেয়ে দেখি এ ত' নয় নীলের পাথার,
চালা-ঘর, পালা-খড়, গাছপালা দিতেছে সাঁতার,
বন্যায় ভাসিছে দেশ। অকস্মাৎ পশিল এ কানে
পাখীদের কলরব, হৃষ্টকণ্ঠে তারা একতানে
ক্ষণিক বর্ষণ-ক্ষান্তি দিগ্বিদিকে করিল ঘোষণা
ভাঙ্গি দিবাস্বপ্ন-ঘোর। হেরি ফিরে এসেছে কল্পনা
পাখা দুটি গুটাইয়া কাঁপিতেছে শীতে থর থর
নতমুখ অবসন্ন ক্লান্ত স্তব্ধ চকিত কাতর,—
কেশান্ত পক্ষাগ্র হ'তে জলবিন্দু ঝরে অবিরল
যতনে মুছানু তাহা দিয়া মোর দরদী আঁচল।

বুঝিনু আরামকক্ষে রুদ্ধ করি দ্বার-বাতায়ন
হয়নাক বিশ্বসনে এ চিত্তের বিচ্ছেদ-সাধন।
ভুবন ভাসিবে জলে, আরামের শয্যা 'পরে তবু
কবিত্ব-বিলাস-লীলা-কুতূহল চলেনাক কভু।

খেয়া-ঘাটে

ওরে ও খেয়ার নেয়ে,
সন্ধ্যা ঘনায় নদী কিনারায় তোর পানে চেয়ে চেয়ে।
কে যায় কে আসে মুখ পানে চেয়ে দেখিস্ না একবার,
চিরদিন তরে কেবা যায় চ'লে, কেবা করে হাহাকার,
কোন্ কাজে কেবা চলেছে ও পারে, কি ভাবনা কার মনে,
কে হারাল নিধি, কেবা তরে নদী তাহারি অন্বেষণে।
কেউ কাঁদে, কেউ হাসিঢেউ তু'লে, কেউ ধরে নায়ে গান,
পশে না ও-কানে, শুধুই শুনিস তটিনীর কলতান।
আমির ফকির হুজুর মজুর তরাস্ নিত্য নায়,
শিবিকা-সমেত কত নববধূ, দৃক্‌পাত নাই তায়।
ওরে ও নির্বিকার,
তোরই মত হায় হবে বুঝি ভব-নদীর কর্ণধার।

তাঁরই বুঝি ধারা, ধর্ম ধরণ, তুই পেয়েছিস্ ভাই,
তাঁরই কথা স্মরি এই দিনশেষে তোর পানে যত চাই।
সমুখের নদী হারায় অবধি বারিধির রূপ ধ'রে।
ও-পারের রেখা যায়নাক দেখা কুহেলিতে যায় ভ'রে।
নাচে মহাকাল ঊর্মিকরাল গরজি আত্মহারা,
নিখিল গগন আঁধারে মগন একটিও নাই তারা।
একটি তরণী জাগে তার 'পরে, অরুণ কেতন ওড়ে,
ক্ষণে দেখা যায়, ঊর্মি-শৈলে, ক্ষণে যায় ঢাকা প'ড়ে।
ভয়ে ভাবনায় চিত্ত আমার কাঁপে যেন প্রজাপতি,
শুধু সান্ত্বনা, মিথ্যা ভাবনা,—সকলেরই এক গতি।
ওরে ও খেয়ারী নেয়ে,
তোরে দেখে মোর আঁখি ধূমঘোর-বাষ্পে যে আসে চেয়ে।

বনমন্দিরের শিব

শ্মশানের শিব,
পাষাণ-মন্দিরে বন্দী করেছিল তোমা মূঢ় জীব,
বিরাট প্রাসাদ গড়ি বিথারিল ঐশ্বর্যের ঘটা,
চারিদিকে বিরচিল সমারোহে দীপালোকচ্ছটা,
তুমি আঁধারের দেব, ভুলে গেল। পাশরিল আর
ধূতুরা, কঙ্কাল-মুষ্টি, ভস্ম তব পূজার সম্ভার:
ভুলে গেল সঙ্গী তব নন্দী ভৃঙ্গী পিশাচের দল,
ভুলে গেল ভূষা তব ভুজঙ্গম, ভক্ষ্য হলাহল।
করিল তাহারা তোমা ভোগাসক্ত জনপদ-বাসী,
রাজভোগ-সমারোহে ইন্দ্রতুল্য ব্যসন-বিলাসী।

হায়, মূঢ় জীব
ভুলে গেল—তুমি যোগী সর্বত্যাগী শ্মশানের শিব।
সহজে কুপিত নও, ভোলানাথ ক্ষ্যাপা আশুতোষ,
ধীরে ধীরে ধিকি ধিকি জ্বলি শেষে ক্ষিপ্ত হল রোষ,
লোকালয় ভেঙ্গে চূরে শেষে রুদ্র রচিলে শ্মশান,
দেউলে তুলিলে তার ত্রিশূলাগ্রে অশ্বত্থ-নিশান।
প্রেত এলো, সর্প এলো, জয়ধ্বনি করিল ফেরুরা,
ফুটিল আকন্দ দ্রোণ, সিদ্ধিবনে ফুটিল ধূতুরা।
তুচ্ছ মানুষের সৃষ্টি; পদে ঠেল ইন্দ্রেরও ত্রিদিব।
পাষাণের শিব তুমি ফিরে হ'লে শ্মশানের শিব।

বসন্তের অভিনন্দন

একাই আমি এসেছি ভাই পাইনি কারেও সাথে,
তোমার কথা এরা সবাই উড়ায় উপেক্ষাতে।
কবে আসো কবে যে যাও খোঁজও নাহি করে,
এক ঋতুতে লঘূকরণ করেছে বৎসরে।
আম-মুকুলে সাজায় না কেউ তোমার বরণডালা,
অশোকবাসক-স্তবক দিয়ে কেউ রচে না মালা।
অগুরুধূপসৌরভে আজ ভরেনি সমীর,
তোমায় ঘেরি বাজবে না ভাই লসিত মঞ্জীর।
'হিন্দোলাতে আন্দোলিত হবে না উদ্যান,
নান্দীতে কেউ তুলবে না ভাই সিন্ধুকাফীর তান।
কবিরা কেউ বাঁধেনিক স্রগ্ধরাতে শ্লোক,
কেউ আসে নি। এই সুযোগে মনের কথা হোক
কহ তুমি ফাগে-অরুণ কল্প-লোকের কথা,
স্বপ্ন-যুগে কেমন ছিল তোমার বোধন-প্রথা।
কবিদের পীত উষ্ণীষে আর কর্ণযুগল 'পরে,
কেমন ক'রে পরিয়ে দিতে মুকুল সমাদরে।
পলাশ-তোড়া গায়ে কেমন ছুড়ত বিলাসবতী,
কেমন ক'রে ঘুঙুর ও-পায় পরিয়ে দিত রতি।
কেমন ক'রে দিয়ে অরুণ করতালির তাল,
নাগরীদের নৃত্য-লীলায় ছড়াতে প্রবাল।
কেমন ক'রে ভাঙতে তুমি কঠোর যোগীর তপ,
শিখাতে তায় অক্ষমালায় অপ্সরোনাম-জপ।
সে সব কথা বল শুনি কূজনে গুঞ্জনে,
সুবর্ণময় স্বপ্নে ভরা কাণকারের বনে।

দুঃখবাদী কবি

পশুর 'অতীত' নাই, 'স্মৃতি' নাই, নাই 'ভবিষ্যৎ',
'বর্তমান' দিয়া শুধু রচা তার আনন্দজগৎ।
যূপকাষ্ঠবদ্ধ ছাগ নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্তজীবন,
সিন্দূর-তিলক পরি' বিল্ব-পত্র করে সে চর্বণ ;
মন্দিরের হিংসামন্ত্র, বাদ্যোদ্যম উদ্দাম মদির,
তাহার চর্বণানন্দে করি তোলে গভীর নিবিড়।
মানুষ ত পশু নয়—সার তার নহে বর্তমান,
তাহারে ভুলাবে কবি, গেয়ে কোন্ আনন্দের গান
কবি জানে, মর্মদাহ ঘুচেনাত' প্রলেপে ব্যজনে,
কবি জানে, ঘন তমঃ মুছেনাত' চপলা-স্ফুরণে।
স্বপ্নেরে মদির করি' কিবা লাভ ?—হায়, জাগরণ
নিশ্চিহ্ন করিয়া সবি করিবে যে লুণ্ঠনে হরণ।

অস্থি-চর্ম-শৃঙ্গে রচা শঙ্খ, বেণু, মৃদঙ্গ, বিষাণ,
তাহাদের সহযোগে কী গাহিবে আনন্দের গান ?
নিসর্গ-শ্মশানবার্তা কোন্ বাদ্য করে না বহন ?
পাংশু-হস্ত-অবলেপে স্পর্শ কা'রে করেনি মরণ ?
কবিরে ভুলাবে সভ্য কোন্ সুরা দিয়া উপহার ?
কোন্ পাত্রে সেই সুরা পরশিবে অধর তাহার ?
সব সুরা তা'র চক্ষে দ্রাক্ষালতা-বক্ষের রুধির,
সব পাত্র হস্তে তার ধরে রূপ নর-করোটির।

বেদ

নমি ব্রহ্মের বাঙ্ময় রূপ। চিৎসিন্ধুর গর্ভ হ'তে
অশেষ ঔর্ব-অর্চিতে কবে উদীরিত হ'লে ধ্বনির স্রোতে ?
সিন্ধুতে রাখি ইন্দু-মাধুরী, রুদ্র-তেজেরে সঙ্গে নিলে,
ব্যোমে ওঙ্কার-নাদ-তরঙ্গে আদি-ভারতীর জন্ম দিলে।
হলো চঞ্চল নীহারিকাদল লভি দ্বিজত্ব উঠিল জাগি,
ঘন-আবর্তে স্বর্গে-মর্তে মনোমণ্ডল সৃজন লাগি।
অজ্ঞান-তমোদুরিতহরণ, মূঢ়ের বচন-দৈন্য ক্ষম',
মহামানবের মনোযজ্ঞের হুতবহ, তোমা নমঃ হে নমঃ।

চির উদাত্ত তোমার সূক্ত গ্রহ-তারকায় ধ্বনিত নভে,
ভৈরবে বাজে তাণ্ডব সহ রুদ্রদেবের বিষাণ-রবে,
মেঘমল্লারে অম্বুদে বাজে অম্ভোধিমাঝে কম্বুনাদে,
ষড়্জে বজ্রে, দীপ্ত দীপকে মরুমরুতেরা সতত সাধে।
রণিত গোত্র-মাতার কণ্ঠে, প্রতিধ্বনিত গুহার কূপে,
প্রজাপতি-ঋষি-ছন্দোমন্ত্রে বৃহতী-জগতী-অনুষ্টুপে।
সঙ্গীত তব কলতরঙ্গে ধৈবতে ধৃত শ্রোত্ররম,
কূজন-গুঞ্জে পঞ্চমে রুত, প্রণব-পুরুষ চরণে নমঃ।

নীল-লোহিতের ললাটলোচনে জ্বলে তব মহাতাপসী তৃষা,
পঞ্চশরের চঞ্চল লীলা ভস্ম করিয়া দিবস নিশা।
স্থণ্ডিল, বেদী কুণ্ডে কুণ্ডে জাগে পিঙ্গল তোমার শিখা,
নমে হিমাচল আহিতাগ্নিক ললাটে অভ্রভস্ম-টিকা।
তোমার আজ্যে যজ্ঞীয় ধূম পর্জন্যের জন্ম দিয়া,
কব্য-বিকির-বলি-চরু-দানে জীবলোকে রাখে সঞ্জীবিয়া।
তপ', জন, মহ', পিতৃলোকের বোধিদূত, চিরারাধ্য মম,
জ্ঞান-জগতের বহ্নি-জীবন, উদ্দেশে তব নমঃ হে নমঃ।

তোমার অর্চি তাপস-যতির পিঙ্গল জটাকূর্চে রাজে,
অরণি-শমীর শিরায় শিরায় ব্রীহি যব কুশ হবির মাঝে।
জ্বলে বিপ্রের দীপ্র নেত্রে যজ্ঞোপবীতে অংসে জাগে,
মন্দিরে ধূপ-দীপের বক্তে, ক্ষত্রশূরের শরের আগে।
ভারতের ধ্রুব আধ্যাত্মিক জীবনে জ্বলিছে অমৃতরসে,
ঐহিকতার চিতার সমিধে অগ্নি-মন্ত্র-মন্ত্রে পশে।
চিদাকাশে তুমি তেজোব্রহ্ম, যদিও হরেছ নিখিল তমঃ,
আলোক-ভূমায় হারাই তোমায়, উদ্দেশে তব লক্ষ নমঃ।

মনো-জগতের তুমি হিমাদ্রি, ভারতের শুভসাধনে রত,
স্মৃতি সংহিতা ষড়্‌বেদাঙ্গে দিলে গতি শত নদীর মত।
তোমার সানুতে হোতারা আজ্যে তোষে হিরণ্যগর্ভ দেবে,
ওষধিরা সব তব স্নেহরসে জ্বলিয়া ওষধি-নাথেরে সেবে।
প্রজাপতিগণ মেঘমালাসম তোমার মেখলা ঘিরিয়া ঘুরে,
তুষার-গলিত কল্যাণ-রস বিতরে নিখিল সৃষ্টি জুড়ে।
তব আশ্রয়ে রচে আশ্রম ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য, শম।
পূতহোম-ধূমমৌলিভূষণ হে বিরাট, তব চরণে নমঃ।

তুমি এক, তব ভূমায় প্রকাশ বহুরে ফিরায়ে এনেছ একে,
একটি মৃণালে রাজীবের কোষে কোটি কোটি রজঃ রেখেছ ঢেকে।
তব সংসারে মারুতে জনক, সলিলে বন্ধু, মহীরে মাতা,
পেয়েছি তপনে সোমে সখারূপে, নিঃসীম ব্যোমে পেয়েছি ভ্রাতা।
সকলের মাঝে প্রেমের সমাজে করিয়া রেখেছ আত্মহারা,
ওগো পিতামহ মর্ম-কুহরে বাঁচায়ে রেখেছ আর্যধারা।
হে অমৃত শ্রুতি, মোদের জীবন তব কুণ্ডলে মুকুতাসম,
প্রলয়ের ভয় আমরা রাখি না, দক্ষিণ, তব স্মরণে নমঃ।

তুমি আদি-বাক্, চাহ প্রতিনাদ, তোমার মহিমা যায় না বুঝা,
মানব-কণ্ঠে পুনরুদীরণ গঙ্গার জলে গঙ্গাপূজা।
দাও এ কণ্ঠে তূর্যশক্তি দিলে যা একদা আর্যগণে,
সূর্যেরে দিব সোম-মাধুর্য, ইন্দ্রে নামাব গৃহাঙ্গনে ;
আজ্যগন্ধি নিশ্বাসে তব আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভর',
খ্যাত কর মোরে জনমে জনমে যুগে যুগে জয়শঙ্খ কর'।
তোমাতে আমার উদয়-বিলয় ঋষি-গীত ঋক্‌মন্ত্রোপম,
স্বর-গ্রামের পতনোত্থানে, রুদ্র ! তোমার চরণে নমঃ।

সোমসামে তব সৌম্য স্বরূপ, নহ তুমি শুধু রুদ্র নহ,
সোমধারা-পথে মর্ত্যজনেরে মিলাও পিতৃগণের সহ।
সুরভি আপীনে তোমার মাধুরী, কল্পতরুতে তোমার প্রীতি।
তোমারে সেবিছে সোমক্ষীরায় সোমযাগে শত সোমপ নিতি।
আশিস্ তোমার শুভ শক্তিতে ঋদ্ধ করিছে বিজয়ী ভূপে,—
বৈদ্যের করে ঔষধধনে,—বৈশ্যের গৃহে শস্যরূপে।
জীবলোক-ধারা রাখে বহমান ঘটায়ে পাবন শুভোপযম
জীবনে জীবনে প্রেমের মিলনে, হে সোম-জীবন, চরণে নমঃ।

মধুমাধবের মোহন মাধুরী তোমা হ'তে বয়, হে মহনীয়,
সোমবল্লীর উপবীত তব মধু-মল্লীর উত্তরীয়।
ইন্দুতে ঝরে, সিন্ধুতে ক্ষরে, মধুবায় উড়ে মধুর রেণু,
ব্যাধি ক্ষুধা হরে ওষধিমালায়, ঢালে মধুধারা মেদিনী-ধেনু।
শত মধুমতী তটবতী নিতি মধুর কণ্ঠে গাহিছে জয়,
মধুজারে মধু-পর্কের মত করেছ ভোগ্য-সৌখ্যময়।
কর তাপময় মর্ত্য-জীবনে তামস-সিন্ধুপারংগম।
মধুকোষে কর মক্ষীর মত। মধু-মহোদধি, তোমায় নমঃ।

আদিত্য-মঙ্গল

জানি না সে কবে স্নেহচুম্বনে, বৎসল পাণি মাথায় রেখে,
ঘুম-ঘোর হ'তে এই বসুধারে জাগালে বাষ্প-শয্যা থেকে।
জানি না কবে সে শ্যাম রোমাঞ্চে হলো চঞ্চলা নবীন প্রাণে,
ভয়ে-ভরসায় কম্প্র আশায় চাহিল প্রথম তোমার পানে।
আজিও তাহারে রেখেছ বাঁচায়ে অবিরত স্নেহ-মাধুরী ঢালি,
আদুরী দুলালী করেছ তাহারে দশশত করে আদরে পালি'।
ছয়-ছয় ঋতু সহচরী দিলে লীলায় খেলায় তুষিতে তারে,
তৃণ-পল্লবে, ফুল-সৌরভে, ফলগৌরবে ভূষিতে তারে।
ঘুরিঘুরি তোমা ঘেরি ঘেরি নাচে আলো-আঁধারিয়া শাড়ীটি পরি'
শুনায় সকাল-সন্ধ্যা কাকলী, পূজাফুলডালি কক্ষে ধরি'।
গ্রহতারকার স্নেহমমতার পুত্তলী এই বসুধাবালা,
খোঁপায় সূর্যমুখী শোভে তার কণ্ঠে সূর্যকান্ত-মালা।

ধরণী ত' শুধু সর্ষপ-কণা, তুমি যে বিশ্বজীবনদাতা।
কোটি কোটি গ্রহ-তারকার তুমি সবিতা সৃজন-পালন-ধাতা।
তেজোব্রহ্ম হে শিবরুদ্র, ভাগ্যনায়ক, ত্রিলোকপাল,
তোমারি নিদেশে চিরনিয়মিত সেই আদি হ'তে এ মহাকাল।
ব্যোমে সংহত প্রভা-পরিবেষ, যমে সংযত নিয়মধারা,
তব সহস্র কিরণ ইন্দ্রে দিল সহস্র নয়ন-তারা।
সোমেরে করেছ প্রেমভাণ্ডারী পীযূষে করেছ প্রহ্লাদন,
যা পেয়ে তৃপ্ত তপ্ত ভুবন, যা পিয়ে অ-মৃত দেবতাগণ।
যা পিয়ে প্রকৃতি চিরযৌবনা, যা পিয়ে বরুণ চিরতরুণ,
যা পেয়ে অশ্বী আময়-বারক, রশ্মি-ধারক শিশু অরুণ।

নির্ঋতি তব ভ্রূকুটীর জ্বালা, ঊষা তব প্রেমমধুর হাসি,
আহিত অরণি-আজ্যে বহ্নি—তোমার তৃষিত ময়ূখরাশি।
ইন্দিরা তব হেমময়ী ভাতি, বাঙ্ময়ী ভাতি সরস্বতী,
তব মরীচির সপ্তবর্ণে যাঁহার সপ্তস্বরোদ্গতি।
ইন্দ্রে বৎস কল্পিত করি' দোহন করেছ ধরিত্রীরে,
বেদের যজ্ঞ-দর্বী ভরেছ, মিত্র, উর্জোবলের ক্ষীরে।
তোমারি অর্চি যজ্ঞীয় ধূমে করি সিন্ধুর গর্ভাধান,
বর্ষে বর্ষে দ্রোণাবর্তক-পুষ্করে করে জন্মদান।
তোমারি শাতিত তেজে কল্পিত বিষ্ণু-চক্র, শূলীর শূল,
যমের দণ্ড, ভীম প্রচণ্ড দেবারি-দলন আয়ুধকুল।
শাতিত ময়ূখে ধরিলে তপন নব অভিরাম মূর্তিখানি।
'রক্তাম্বুজময় বরভুজ বন্ধুকরুচি চক্রপাণি।
হার-কুণ্ডল-কেয়ূরাঙ্গদ-মণিমণ্ডিত-কিরীটধারী।
শোভিত অক্ষমালায় বক্ষ, ত্রিনয়ন, রথে গগনচারী।'

মহাপারাবার তব পানাধার, মরুৎ তোমারি আজ্ঞাবহ,
এক দীপ হ'তে কোটি দীপসম পেয়েছে জীবন তারকা গ্রহ।
বিশ্বচক্রে নেমির মতন কেন্দ্রে বিরাজো, বিবস্বান্,
অরার মতন শক্তিপুঞ্জ করেছে তাদেরে ঘূর্ণ্যমান।
তোমা হ'তে জাত পুষ্টি, কান্তি, শুদ্ধি, নিখিল বর্ণরূপ,
তোমারি অঙ্গ-পরিমল দিয়ে বনদেবী জ্বালে গন্ধধূপ।
হিরণ-রজতে সুরভি করেছ, মাটি হ'তে ফুটে বিবিধ নামে,—
অতসী-চম্পা-এলা-লবঙ্গ-বেলা-মল্লিকা-মালতীদামে।
আলো হ'তে তাপ, তাপ হ'তে গতি, গতিরে ফুটায়ে তড়িদ্বেগে,
মহাশক্তিরে করিছ চালনা, মেঘ হ'তে নীরে—আবার মেঘে।
ফুল হ'তে ফল—ফল হ'তে বীজ, বীজ পুন শত শাখায় জাগে,
বর্ষণ হ'তে তৃণ—ধেনু—হবিঃ, হবি পুন যাগে বৃষ্টি মাগে।

মহাশক্তির দশ মহারূপ তোমারি চক্রে আবর্তিত,
কভু সে তৃষায় স্বশোণিত শোষে, কভু বরাভয়ে বাঁচায় মৃত।

বিশ্বযাগের তুমি হোমাগ্নি, স্থণ্ডিল তব অসীম ব্যোম,
সপ্তর্ষিরা হোতা সে যজ্ঞে, সোমরস-ধারা যোগায় সোম।
গ্রহগণ গাহে সামগান তাহে উদ্গাতা তারা সমস্বরে,
ব্রহ্মা স্বয়ং 'ব্রহ্মা' ও-যাগে, মহাকাল ঘৃতে চমস ভরে।
প্রেতলোক লভে ওদন-কব্য, দেবতা হব্য, সোমাঞ্জলি,
ভূতনাথ লভে ভস্মভূষণ, ভূতগণ লভে বিকির বলি।
চরুপুরোডাশ লভিছে মানব ওষধি-তরুর প্রসবরূপে।
তামস-পশুর রুধির গড়ায় প্রাচীদিগন্তে বলির যূপে।

সম্রাট, রাশি-চক্রবর্তী, সার্বভৌম হে অদ্বয়,
অয়নে অয়নে অভিযান তব, নয়নে করেছ দিগ্বিজয়।
প্রতি সংক্রমে সাজাও ভুবনে নব সুষমায় নবীন ক্ষেমে।
শাসনে জিনেছ বিষুব-ক্রান্তি, আ-মেরু জিনেছ হ্লাদন-প্রেমে।
দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ চক্রে দিকে দিকে ছুটে বহ্নিরথ।
সপ্ত বাজীর জ্বালাময় ক্ষুরে জ্বলে গিরিচূড়া, কাঁপে জগৎ।
সপ্ত অশ্ব-নিশ্বাসে তোলে কাল বৈশাখী ঘূর্ণিবাত।
তপ্ত ফেনিল ঘর্মে তাদের সপ্ত সাগরে ফেনোদ্‌ঘাত,
তব পরিবেষ-মণ্ডল-সীমা লঙ্ঘিতে পায় অরাতি ভয়!
রাহু-বিজয়ের জয়কেতু উড়ে ধূমকেতু হ'য়ে গগনময়।

তব রাজ-যশোমুকুটের প্রভা ইন্দ্র-ধনুতে জলদে ভায়।
মেরু-শিরোদীপে অরোরার রূপে সারা মরু ব্যেপে মরীচিকায়।
ভাগ্যবিধাতা, নিখিল প্রজার নিয়মিত করো নিয়তি-ধারা।
স্বচ্ছ তোমার নখ-দর্পণে প্রাগ্‌-বিম্বিত রয়েছে তারা।

তুমি আদর্শ সম্রাট, রবি, আদান তোমার দানেরি তরে।
একগুণ ল'য়ে দশশতগুণ ফিরাইয়া দাও প্রজার ঘরে।
তোমার রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না কখনো একটি তিল।
তোমার শাসন-পঞ্জীতে নাই শতবর্ষেও কোন অমিল।
গ্রহ-তারাগণ কক্ষ হইতে এক চুলও কভু ভুলে না টলে।
পল অনুপল কলা-কাষ্ঠাও ধ্রুব নির্দেশ মানিয়া চলে।
গিরিতে স্নিগ্ধ, মরুতে রুদ্র, জয়জয় ভীমকান্ত রবি,
শর্বরীশেষে শৃঙ্গার-বেশে হেরিয়াছে তোমা প্রেমিক কবি।
তব চুম্বনে সরোরমা নিতি হেসে হেসে মেলে কমল-আঁখি।
ফিরাইয়া দাও ভৃঙ্গে ভৃঙ্গী, চক্রবাকেরে চক্রবাকী।
নির্ঝরিণীর কণ্ঠে দুলাও তরল সূর্যকান্ত-মালা।
পূরাও চাঁপার সুরভি কামনা, জুড়াও সূর্যমুখীর জ্বালা।
তোমার সোহাগে বনরাণী জাগে পরশে কেশের সুবাস ছুটে।
খেলে শ্যামাঙ্গে সুখ-তরঙ্গ, হাস্য-কাকলী আস্যে ফুটে।
বিদায় লইয়া যাও যবে তার চিবুক পরশি কনক-করে।
মরমরি উঠে মর্ম তাহার আঁখি-পল্লবে নীহার ঝরে।
হেম-রথ 'পরে অজের অঙ্কে তরুণী ইন্দুমতীর মত,
দিবা-বধূ যবে ত্রিদিবচ্যুত সুর-পারিজাতমালায় হত,
সাশ্রু করুণ অরুণ নয়নে সিন্দূরে তার রাঙ্গায়ে সঁাথি।
চন্দনকাঠে চিতা জ্বালি তার শোক-সিন্ধুতে ডুবিছ নিতি।

দেশে দেশে তুমি আদি আরাধ্য ব্রহ্মের আদি প্রকাশ তুমি।
তব মহিমার মুগ্ধানুভূতি ধর্মের আদি বিকাশ-ভূমি।
ব্রহ্ম-বিভূতি,—বিশ্বে ব্যাপ্ত অন্তর্গূঢ় অনুস্যূত,—
মূঢ় মানবের প্রতীতির তরে তোমাতেই বুঝি কেন্দ্রীভূত।
ঊর্ধ্বে ফিরায়ে মানব-দৃষ্টি ঘুরায়েছ তারে অসীম লোকে,
অমৃতস্নাত সেই দৃষ্টিরে ফিরায়ে আনিলে মনের চোখে

সুপ্তি-মৃত্যু-প্রত্যুহ হ'তে প্রত্যহ তুমি বাঁচাও নরে।
তুমি আছ নবজীবন জাগাতে, সে মরণে তাই কেহ না ডরে।

স্মরি সেই দিন, আর্যেরা তব যেদিন নিদেশ ধরিয়া শিরে
ভারতে হইল প্রথম অতিথি কুভা, ইরাবতী, বিপাশা-তীরে।
সূর্য, তোমার রথের তূর্য দূর হ'তে শুনি, প্রাতঃস্নাত,
সিন্ধুর তীরে প্রাঞ্জলি তারা দাঁড়াত ও রূপ হেরিতে, তাত।
তামস হ্রদের তামরস সম প্রাচী-দিগন্তে জাগিতে নভে,
মধুকরসম সামগুঞ্জনে বরিত আর্য ঋষিরা সবে।
গাহিত তাহারা—"হে বিশ্বরূপ সহস্রকর, নিখিল প্রাণ
হে জাতপ্রজ্ঞ এক জ্যোতি তুমি বিশ্বে শতধা বর্তমান।"
মিত্র, তোমার মৈত্রী তাদের পাথেয় যে ছিল যাত্রাপথে,
জীবনশুদ্ধি করিত নিত্য তোমারে হেরিয়া কনক-রথে।
তুমি সাবিত্রী-মন্ত্রে তাদের দিলে যে দীক্ষা, তোমারি ধ্যানে
জপি সে মন্ত্র সন্ধ্যা-প্রভাতে সিদ্ধ তাহারা চরম জ্ঞানে।

নব নব মহাবিস্ময় নিয়ে জাগিতে তপন উদয়াচলে,
কোন্ সে দৈব অতিলৌকিক কুহক বিথারি মেদিনীতলে ?
শিশু-সারল্যে মুগ্ধ, হে তাত, স্নিগ্ধ করিলে মরীচিধারা,
পরমাত্মীয় হ'লে যাহাদের 'মিত্র' বলিয়া ডাকিল তারা।
সত্যস্বরূপ আত্মার ভূপ ! চলিত তাহারা শাসন মেনে
সকল বাক্য কর্মে তোমায় চির অতন্দ্র প্রহরী জেনে।
কাশী-কোণার্কে কাশ্মীরে তারা তখনো গড়ে নি দেউল তব,
তখনো পূজেনি অনুকল্পিত তোমার প্রতীক নিত্য নব।
তখনো তারা যে পূজিতে পারিত তোমারি নয়নে নয়ন রাখি।
হে অসেচনক, তোমা হ'তে তারা তখনো ফিরাতে নারিত আঁখি।
চারিপাশে জ্বালি অনলকুণ্ড নিদাঘে বসিয়া মরুস্থানে,
পঞ্চতপারা করিত যে তপ অনিমিষে চাহি তোমার পানে।

সঁপিত অর্কসমিধগ্নিতে পায়সান্নের আহুতিভার,
পুরশ্চরণে জপিত ও-নাম একাসনে তারা লক্ষ বার।
'সূর্য-হৃদয়'-বন্দনা উঠে আজিও গঙ্গা-সিন্ধু-তীরে,
বরাভয় ঝরে বহ্নি-হৃদয় গলি' তাই হিমগিরির শিরে।

দেব বিভাবসু, শুধু কি আমারে বাঁচায়ে রেখেছ করুণা-দানে ?
তরু-লতারাও সে কৃপা হইতে বঞ্চিত নয় দেহে বা প্রাণে।
এ জড়পিণ্ডে করেছ চেতন চিদ্বুদ্ধির গরিমা দিয়া,
রক্তমাংস উদ্ভেদি' মম তুলেছ নেত্রে উদ্বোধিয়া।
বিশ্ব-বোধন দ্বার-বাতায়ন খুলিয়া দিয়াছ অন্ধ গৃহে,
প্রকৃতি আমার চিত্তে পশেছে ও-দৃক্গোচর রন্ধ্র দিয়ে।
আত্মায় আমি পাথেয় পাইয়া মোক্ষপথের যাত্রী, রবি,
চিদাকাশে নবকল্প-বিশ্ব রচেছি তোমার করুণা লভি'।
রূপেরি প্রসাদে জেনেছি অরূপে গাহি তাই, রূপনিদান, জয় !
এ ইহ-জনম সার্থক মম, বাকি পথ মোর আলোকময়।

এত কৃপা যদি করেছ তপন, মম চিদ্ব্যোমে উদিত হও,
স্ফুটকদম্ব-গোলকের মত জ্যোতির কেশরে উজল রও।
শুধু নও তুমি এ মায়ালোকের, চিন্ময় লোকে তুমিই রবি,
তুমি না উদিলে চিদাকাশে মম বিশ্বরচনা বিফল সবি।
কৃশানু-অর্চিঃ সম্বরি' ভানু জাগো সুষুম্নে, মধুর হাসি',
'সংজ্ঞা' আমার পারে যেন বুকে সহিতে তোমার ময়ূখরাশি।
বোধির উষারে জাগাও, সবিতা, মম অজ্ঞান-অন্ধকারে,
সরোজবন্ধু, দলসহস্রে ফুটাও আমার সহস্রারে।
তমোজড়িমার অনুচর যত নিশাচরগণে তাড়াও ভানু,
রসের 'যমুনা', তপের 'তপতী' ছুটুক প্লাবি' এ হৃদয়-সানু।
প্রদ্যোতনাথ তোমার দ্যুতিতে বস্তুবোধের খদ্যোতিকা,
ম্লান হ'য়ে যাক মায়াপ্রপঞ্চ গোচর-পঞ্চপ্রদীপ-শিখা।

অন্তরে তুমি উদিলে বন্ধু, কি রবে দৃষ্টি অন্তরালে ?
সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্য রবে না গুপ্ত দেশে বা কালে।
হইবে ত্রিলোক হস্তামলক, ত্রিকাল হইবে পাণির রেখা,
নখদর্পণে সেই শাশ্বত সত্যধনের পাইব দেখা।

'অসৎ হইতে সতে নিয়ে যাও, তমসা হইতে জ্যোতির্লোকে,
মৃত্যু হইতে অমৃতের মাঝে, শোক তাপ হ'তে চির অশোকে।'
'মোদের বুদ্ধি-প্রচোদক' তুমি, পূজি তোমা গুরু নায়ক জ্ঞানে,
'তোমার অর্ঘ্যে যিনি বরেণ্য' সেই ভর্গেরে জাগাও ধ্যানে।
'যথায় মিহির, তুমিও জাগো না চন্দ্র-তারকা জাগে না কেহ',
'যে ধাম লভিয়া এ ধামে ফিরে না কেউ পুন আর ধরিয়া দেহ',
'মনের সঙ্গে বাক্ নিশিদিন যেই ধাম হ'তে আসিছে ফিরে',
সেই ধাম মোরে দেখাও বন্ধু, অজ্ঞান-তমঃসিন্ধু-তীরে।

'তব বর্ণেরই মহান্ পুরুষ তমসার পারে নিত্যাসীন',
'এই ভূতগণ যাঁহা হ'তে জাত লালিত জীবিত যাঁহাতে লীন',
যাঁহার স্বরূপ বর্ণিতে চিৎ বুদ্ধি-বচন সকলি হারে,
যিনি 'গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ', 'অণোরণীয়ান্' জানাও তাঁরে।
'যাঁহারে দেখিলে অন্য কিছুই দেখিতে চাব না জীবন ভরি',
সেই অদ্বয় অমৃত সত্যে দেখাও মিত্র, করুণা করি।
সীমায় যাঁহার আভাস পেয়েছি তাঁরে যেন ভানু, ভূমায় লভি,
রূপেরে দেখালে, রূপব্রহ্ম, অরূপ ব্রহ্মে জানাও, রবি।

প্রভঞ্জন

নেমে এস আজ, হে প্রভঞ্জন, বর্ষের শেষে প্রমদানন্দে
ভৈরব-রূপ ধরি'
হাজার হাজার ঘুঙুরে তোমার তুলিয়া রণন প্রলয় ছন্দে
এসো এ বিশ্ব ভরি'।
লক্ষ লক্ষ পটহ সঙ্গে শিবের গাজনে তোমার অংশ
আসিয়া গ্রহণ করো।
মত্তপাগল সন্ন্যাসী এস শব্দিত করি' বেতস-বংশ,
ধূসর ঝাণ্ডা ধরো।
নাচ প্রচণ্ড উন্মাদনায় শিলার পিণ্ড করিয়া চূর্ণ
দিকে দিকে উড়াইয়া,
ঈশানের রণ-বিষাণের সনে মহিষ-শৃঙ্গ কর প্রপূর্ণ,
ধ্বংসের ধূয়া দিয়া।
হরের করের ডমরু কাড়িয়া ডিমিডিমিডিমি বাজাও চণ্ড,
দুলায়ে পিঙ্গজটা,
করি নৃমুণ্ডে কন্দুকক্রীড়া বম বম বম বাজাও গণ্ড,
রচি ঘোর ঘন ঘটা।
প্রমথ-পিশাচ নাচুক সঙ্গে তাধিয়া তাধিয়া মাতাল রঙ্গে
করি সবে কোলাকুলি।
বৎসর-শেষ উৎসবে এস প্রলয়ঙ্কর, ধরার অঙ্গে
ছড়ায়ে অস্থি-ধূলি।
দিগ্বলয়ের প্রাকার লঙ্ঘি চমকিত করি দিগ্‌দিগন্ত,
ঠেলি জলদের স্তূপে,
দিগ্বধূদের তারকা-মাল্য ছিঁড়িয়া ছড়াও, হোক জ্বলন্ত
তড়িন্মাল্য রূপে।
মদনিঃস্রাবে সিক্তগণ্ড দিগ্‌গজ-শির কর বিদীর্ণ,
শুণ্ড আঁকড়ি ধরি'

মুষ্টি ভরিয়া গজ-মৌক্তিক দিকে দিকে তুমি কর বিকীর্ণ
অভ্রাঙ্গন ভরি'।
ফণিরাজসম হাজার ফণায় গরল শ্বসিয়া এস হে তূর্ণ,
শীর্ষে সূর্যমণি,
রথচক্রের মন্দ্র তুলুক ইন্দ্রতোরণ করিয়া চূর্ণ
কর্ণবিদারী ধ্বনি।
ধরার পৃষ্ঠে ক্লেদ-কঙ্কাল নির্মোক-জাল পাংশুপুঞ্জ
হইয়াছে দুর্বহ।
উড়াও, পুড়াও জ্বালি দাবানল তামসী লীলার বিলাস-কুঞ্জ,
বিষতরুরাজি সহ।
অশাশ্বতের ভীষণ বৈরী মহাকাল-দূত এস হে রুদ্র,
কাঁপায়ে বিশ্ব ত্রাসে,
ডুবুক সকল হিংসা দ্বন্দ্ব স্বার্থের ক্ষতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র
বিপুল ক্ষতির গ্রাসে।

বেদনার স্মৃতিবিজড়িত গৃহ অহিসঙ্কুল প্লাবন-দীর্ণ
ভূমিসাৎ কর তারে।
ঢুলিছে এখনো মলিন ক্লিন্ন শীতজর্জর কন্থা জীর্ণ
দূর করো ফুৎকারে।
জীর্ণ যা কিছু কর হে ধ্বংস, ধ্বংস না হ'লে হবে না যত্ন
নবীনের আহরণে,
গৃহহারা করো বিশ্বজনেরে, সন্ধানে শেষে মিলে যে রত্ন,
শিখাও নিঃস্ব জনে।
ভব-যন্ত্রণা দূর করো তার ধ্বংসের পথে যে জন যাত্রী,
বুকে ক'রে তারে লহ।
নব জীবনের ঊষারে তাহার আগাইয়া দাও আনিয়া রাত্রি,
গভীর সুপ্তি সহ।

ব্যাধি-বীজাণুর আশ্রয়গুলি রেখনাক আর ধরার অঙ্গে
বাঁচাও মানব-ভূমি,
দগ্ধ কাষ্ঠ চিতার ভস্ম শ্মশান-তূলার সঙ্গে সঙ্গে
উড়াও উড়াও তুমি।
উড়াও ঝরাও যাহা খুশী কর, নিখিল তোমার ইচ্ছাভোগ্য,
কারো কথা নাহি শুন,
কিসের দুঃখ? তোমার আঘাত সহিতে যে নারে হইয়া যোগ্য
ফিরিয়া আসুক পুনঃ।

হরিবে না আয়ু তুমি প্রাণবায়ু, জানি নাশিবে না তোমার সৃষ্টি,
ভাঙ্গিয়া গড়ার সাধ?
বাঁচিবার যার যোগ্যতা নাই তার পরে দিবে ধ্বংস-দৃষ্টি,
এতে কার প্রতিবাদ?
নিঠুর আঘাতে জাগাও জাগাও অলস স্বপনে ঢুলিছে বিশ্ব,
জাগাও জড়তা হ'তে,
অধ্রুব-ধন-সঞ্চয়ী জনে একটি নিমেষে কর হে নিঃস্ব,
পাঠাও তাহারে পথে।

এখনো যাহারা প্রমোদোদ্যানে মধু উৎসবে মত্ত স্বিন্ন
কুসুম শয়ন' পরে,
ভাঙো তাহাদের মদিরা-পাত্র, চন্দ্রাতপেরে শতধা ছিন্ন
কর নির্ম্মম করে।

নিশ্বাসে তব ধ্বংস রটিছে আশ্বাস তব ভীষণ রঙ্গে
নিঃশেষে নয় ঢাকা।
শত অঙ্কুর-সম্ভাবনায় পূর্ণ না করি তরুর অঙ্গে
ভাঙো না একটি শাখা।

বন-মর্মের মর্মর-ব্যথা ঘুচাও উড়ায়ে শুষ্ক পর্ণে
পুড়ায়ে বাড়াও আয়ু,
পাণ্ডুতা হরি শোভাও তরুর অঙ্গ অরুণ প্রবাল বর্ণে
চঞ্চল করি স্নায়ু।

শুধু বনে বনে ভূধরে গগনে আজি দুর্দিনে, হে ভীমবৃত্ত
আহ্বান নাহি করি,
মানবের মনে জীবনে জীবনে করিতে খণ্ড-প্রলয়-নৃত্য
পরমাগ্রহে বরি।
তাণ্ডবে করি দম্ভেরে ধূলি, ঘুচাও সকল মোহের ধন্ধ,
ব্যথাময় শত স্মৃতি,
ঘুচাও মনের জঞ্জালজাল, পুরাতন দ্বেষ হিংসা দ্বন্দ্ব,
ফিরাও বিমল প্রীতি।

স্বার্থের তমঃ তব ঘূর্ণিতে বায়সের সম ভ্রষ্ট ছন্ন,
হয় যেন নীড়-হারা,
তোমার কশায় ক্ষুব্ধ নদের তরণীর মত শঙ্কাপন্ন
হউক শোষক যারা।
নেত্র আমার ধূলায় ক্ষুণ্ণ, পত পত উড়ে পতাকা জৈত্রী,
চারিদিক করে ধূধূ,
লেখা আছে তাতে শান্তি, স্বস্তি, মঙ্গল, প্রেম, সাম্য, মৈত্রী,
অনুমানে বুঝি শুধু।

ছন্দোব্রহ্ম

ছন্দে উঠে ডুবে রবি সেই ছন্দঃ সূত্র লভি
ছয় সর্গে কাব্য রচে প্রতি বর্ষে কাল।
গিরি হতে নদ নদী ছন্দে ছুটে নিরবধি
ছন্দোমন্ত্রে আন্দোলিয়া সিন্ধু দেয় তাল।
ছন্দে গাহে বনপাখী, নানা ছন্দে লতা শাখী
জন্ম দেয় নানা গন্ধে বর্ণে ফলফুল,
মেঘে ছন্দ মন্ত্রে বাজে ব্যোমে ছন্দ চন্দ্রে রাজে
পঞ্চদশী পদে তার নাই ছন্দভুল।
ছন্দে চলে সৃষ্টিধারা ছন্দে ঝরে বৃষ্টিধারা
কিছু নাই ছন্দহারা অলস জল্পনা,
ছন্দোময় হেরি সবি মনে হয় মহাকবি
করেছেন যেই শিল্পী এ বিশ্ব কল্পনা।
মহাকবি কি যে চান কর তবে অনুমান
তিনি চান তাঁর মহাকাব্যের পাঠক,
এই বিশ্বকাব্যখানি না করিয়া ছন্দোহানি
যে পাঠ করিতে পারে সেইত সাধক।

হয়ে অনুবর্তী তাঁর লভি ছন্দে অধিকার,
ছন্দোরচনারই সার তাঁর উপাসনা।
কোন বাক্য ছন্দ বিনা কর্ণে তাঁর পশে কিনা
এ সংশয় দেয় মোর মনেরে সান্ত্বনা।
যোগী ঋষি মুনি জ্ঞানী তাপস, জাপক, ধ্যানী
সবাই তাহারে জানে চিদানন্দময়,
পড়ি বিশ্বকাব্যখানি আমি আজ তাঁরে জানি
মধুচ্ছন্দা সুরব্রহ্ম তিনি ছন্দোময়।

শিলাব্রহ্ম

ব্রহ্মজ্ঞানীরা জেনেছেন শুনি, বর্ণিতে তোমা পাননি বাণী।
মূঢ় অভাজন আমিও তোমারে কিছু ত জানি।
আমার জন্য ভাব হতে রূপে ধাপে ধাপে তুমি এসেছ নামি,
শেষে মোর ঘরে গিয়াছ থামি।
ঋষিরা হেরিল তোমা "আদিত্যবর্ণোজ্জ্বল তামস পারে,
অজ অমূর্ত অমনা দিব্য অপ্রাণ সিত পুরুষাকারে।
দশ দিক তব কর্ণযুগল, শীর্ষ তোমার স্বর্গলোক,
বেদ তব বাক্, বায়ু তব প্রাণ, তপন চন্দ্র তোমার চোখ,
সর্বভূতের অন্তরাত্মা, মহীতল তব পদোদ্ভব,
নিখিল বিশ্ব হৃদয় তব।"

এই ঘোর রূপ সংবরি তুমি হোতার হোত্রে লভিলে হবি,
দেব হিরণ্যগর্ভের রূপে বন্দিল তোমা বেদের কবি।
পার্থেরে তুমি দেখালে যে রূপ কুরুক্ষেত্রে রথের 'পরে,
সে রূপ হেরিয়া শতরণজয়ী সে বীর তরাসে কাঁপিয়া মরে।

পুরাণ হেরিল শেষ-শয্যায় প্রলয়সাগরে, পদ্মনাভ !
এ মূঢ়ের তাতে কি হ'লো লাভ ?
চক্র-শঙ্খ-গদা-পঙ্কজ ধরিয়া তোমার চতুর্ভুজে,
ভক্তের ধ্যানে উদিলে একদা হেরিল তাহারা চক্ষু বুজে।
ধ্যান হতে তুমি নামিলে রূপে
পূজিত হইলে ফুলচন্দনে প্রদীপে ধূপে,
বিরাট দেউলে রত্নবেদীতে ঐশ্বর্যের আবেষ্টনে।
কৃপা ত হলো না মূঢ় দীন হীন এ অভাজনে।

হাসিয়া তখন দ্বিভুজে ধরিলে মুরলী, তাহার শুনিনু তান,
আরো কাছে পেতে চাহিল প্রাণ।
বুঝেছি মহতো মহীয়ান্ তুমি অণোরণীয়ান্ তাও যে প্রভু,
যত বড় হও ছোট হতে তুমি পারো যে তবু।
বেদ-বেদান্তে একসা থাকিবে কেমন ক'রে ?
আমি তোমা চাই, আরো বেশি তুমি চাও যে মোরে।
শালগ্রামের রূপ ধরি শেষে আসিলে আমার খড়ের ঘরে।
বিরাজ করিছ তুলসীপত্র-শয্যা'পরে।
ঋষিরা তোমারে জেনেছেন ভালো আমি রই হয়ে কৃতাঞ্জলি।
একেবারে তোমা জানি না এখন কি ক'রে বলি।

নরদেব

কমলার ডাকে ভরে গেছে মাঠ চাষার দলে
সেথা অবিরল মিশে শ্রমজল আষাঢ়জলে।
যার যত বল চালায় লাঙল চষিছে জমি,
ভূমিযজ্ঞের হোতা নরদেবে হোথায় নমি।

বাঁধা হবে পুল ভরা নদীকূল লোকের ভিড়ে,
মজুরের সারি বয় ভারী ভারী পাথর শিরে।
শত কারিগরে খাটিছে ছুপরে, ঝরিছে ঘাম
স্বেদাভিষিক্ত নরদেবে সেথা করি প্রণাম।

বসিয়াছে হাট গ্রামের প্রান্তে বিকাল বেলা
জমিয়াছে সেথা দশখানা গাঁর লোকের মেলা

করে কাড়াকাড়ি ব্যাপারী পশারী হাজার ক্রেতা
ভবের হাটের হাটী নরদেবে প্রণমি হেথা।

বৎসর শেষে উৎসব চলে দেখিনু হোথা,
চলে নাচগান সারা দিনমান কত না শ্রোতা।
জুটে নরনারী সংসার-মায়া অতিক্রমি।
উৎসব মাঝে বৈরাগী নরদেবেরে নমি।

রথযাত্রার জনতা অপার পথের মাঝে,
বাজে কাঁসী ঢোল খঞ্জনী খোল শঙ্খ বাজে।
নাইক দৃষ্টি, ঝরিছে বৃষ্টি অবিশ্রাম,
আত্মহারা সে নরদেবে হেথা করি প্রণাম।

আরতি চলেছে সাঁঝে তীর্থের শ্রীমন্দিরে
আপনা হারাই পথ নাহি পাই লোকের ভিড়ে
মানুষই শিলায় জাগায় লীলায় শ্রীভগবানে.
তীর্থ রচেছে সবে সমবেত ভক্তিদানে।

লক্ষ লক্ষ তৃষিত বক্ষ মিলিত হেথা,
তরল আয়ত বিলোচনে যত সরলচেতা।
ভক্তির লেশ নাই যার প্রাণে তারেও ক্ষমি,
এ মহাতীর্থমন্দিরে নরদেবেরে নমি।

বহু যেথা মিলে জীবজগতের হিতের পথে,
পেতে আনন্দ দিতে আনন্দ মহৎ ব্রতে।
পূর্ণ করিতে শুচি সুন্দর মনস্কাম,
সেখানেই আমি নরদেবতারে করি প্রণাম।

বাণীহারার দেশ

স্তব্ধ নীরবতার দেশে, এস তাপস,
এস ভাবুক, শিল্পী, ধ্যানী, রসিক, কবি,
হেথায় মহাশান্তি-ছায়ার গহন-তলে,
এস তোমার অন্তঃসলিল সঙ্গ লভি।
বাগ্মী হেথায় থামাও তোমার বাচালতা,
মুখর হেথায় থামাও তোমার কল-কথা,
হেথায় হের আঁখে আঁখে রসালাপন
কণ্ঠ, তালু, দন্ত হেথায় নীরব সবি,
বধির সমীর শব্দ হেথা সয় না মোটে,
বয় না ধ্বনি, বয় কুসুমের বাস সুরভি।

মেঘের মুখে তড়িৎ আছে, মন্দ্র নাহি,
নিঃশবদে নদী-নদে লহর তুলে,
গায় না অলি শুধুই মধু-সেবন-রত
পাখী শুধুই নাচে রঙীন পালখ খুলে'।
গানের পাখা গুটিয়ে পড়ে হেথায় এসে,
নরেশ হেথায় প্রবেশ করেন দীনের বেশে,
ওষ্ঠে রাখি তর্জনী তার হেথায় দ্বারী
রয় দাঁড়িয়ে সদাই কনক-বেত্র তুলে'।
দেয় ফিরিয়ে বন্যাপাথার বজ্র-ঝড়ে,
যায় ফিরে' সব, এ দিক পানে আস্‌লে ভুলে।

বনের বাণী জাগে হেথায় ফুলে-ফুলে,
মনের বাণী নীরব হাসি-অশ্রুধারায়,
তৃণের বাণী হেথায় নীহার-মালায় তুলে
গগন-বাণী জাগে কেবল তারায় তারায়।

নদীর বাণী জাগে শীতল করুণাতে,
নিশার বাণী জাগে উষার অরুণাতে,
তুষার-বাণী জাগে গিরির অধর-কূলে,
ভাষার ধ্বনি মধুর আশার স্বপ্নে হারায়।
সনাতনী ব্রাহ্মী বাণী নিশিদিনই
মানস-লোকের মনের চোখের দৃষ্টি বাড়ায়।

বাদ্য হেথায় লঘু চরণ-নৃত্যে জাগে
সঙ্গীতসুর ইঙ্গিতে আর ভঙ্গিমাতে,
জয়ধ্বনি রক্তকেতুর আন্দোলনে
ছন্দে জাগে ইন্দ্রধনুর রঙ্গিমাতে।
শব্দ হেথায় নেইক বলে' গন্ধ পরশ
দ্বিগুণ হ'য়ে ব্যঞ্জনাতে জাগায় হরষ,
কাব্য জাগে গহন বুকে গগন গায়ে
স্বর্ণময়ী বর্ণনারি বর্ণপাতে।
জীবন হেথায় শব্দহারা শঙ্খ-সমান
অতল গভীর শান্তি-সাগর হিন্দোলাতে।

ঝঞ্ঝনাতে গঞ্জনাতে উচ্চরোলে
হট্টগোলে কর্ণ যাদের ঝালা-পালা,
হেথায় নীরব শান্তি মায়ের স্নেহের কোলে
এস তারা জুড়াও কাতর জীবন-জ্বালা।
শব্দ হেথায় নেইক বলে', সহায়-হারা
তর্ক-বিবাদ, রোষ-অসূয়া এ-দেশ ছাড়া।
এস সাধক এইত তপের ধ্যানের গুহা,
এ আশ্রমে ভক্ত ঘুরাও জপের মালা,
হেথায় কবি, হের তোমার কল্পস্বপন,
শিল্পী রসিক এই তো তোমার চিত্রশালা।

প্রাচীন ভারত

প্রাচীন যুগের এই ভারতের ইতিহাস পড়ি
পরিতৃপ্ত নহে মন, জন্মে ক্ষোভ দৈন্য তার স্মরি'।
ভগ্ন-শীর্ণ শিলালিপি, জীর্ণ মুদ্রা, তাম্রের ফলক,
দূর হতে ভাসাভাসা দেখে শুনে চীন-পর্যটক
টিপ্পনী লিখিয়া গেছে করচায় কবে লীলাচ্ছলে,
ইষ্টক শিলার স্তূপ মিলেছে যা—খননের ফলে
—ইহাই সম্বল শুধু। তাই দিয়ে জোড়া অতিক্ষীণ,
সূত্রহারা, ছন্নছাড়া, পরম্পরা-শৃঙ্খলাবিহীন,—
কৃচ্ছ্র লব্ধ ইতিবৃত্ত, তাতে মন তৃপ্তি নাহি মানে।
মনে হয় ধমনীর রক্তধারা ঢের বেশি জানে
এর চেয়ে। উড়ে যায় সেই যুগে কল্পনা আমার,
শিল্প-সাহিত্যের পথে ব্যাহত কে করে গতি তার ?
স্বপ্নের মাধুরী দিয়ে ভ'রে তোলে সব ব্যবধানে
প্রাচীন ভারতে পুনঃ গড়ে তোলে নব উপাদানে।

সে স্বপ্নভারতে হেরি নরনারী বাসন্ত উৎসবে
মাতে ফাল্গুনের দিনে। নব মেঘোদয় হয় যবে
গগন-দিগন্ত ভরি', দূতরূপে মেঘেরে বরিয়া
কূটজ কুসুমরাশি অর্ঘ্য দিয়া অঞ্জলি ভরিয়া
পাঠায় বিরহী তার দয়িতার লাগি আকিঞ্চন।
উদয়ন-কথা কয় গৃহদ্বারে গ্রামবৃদ্ধগণ।
অভিসারিকারা চলে পুরমার্গে গুণ্ঠিত আননে,
সংবরি' মঞ্জীরধ্বনি। কাত্যায়নী আরাধে কাননে
জনপদ-বধূগণ। সন্ধ্যাপ্রাতে বৈতালিক দল
স্রগ্ধরা ছন্দের শ্লোকে গায় রাজপ্রশস্তি-মঙ্গল।

নাগরী শুকায় কেশ ধূপধূমে, ধারাযন্ত্র-জলে
স্নান করি', যৌবনের জয়লেখা পত্রলেখাচ্ছলে
আঁকে উরসিজতটে। সীধু পান করিয়া সন্ধ্যায়
মুরজবাদনে যত বিদগধ রসগীতি গায়।
প্রতিটি মুহূর্ত তারা যৌবনেরে করে উপভোগ,
নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ, নাহি দৈন্য, নাহি শোক-রোগ।

অর্হৎ শ্রমণগণ শ্রাবকের দ্বারে দ্বারে গিয়া
দশশীল ব্যাখ্যা করে। আভরণ সজ্জা তেয়াগিয়া,
পরিয়া চীবরবেশ, নটীগণ হয় মহাথেরী,
মুড়ায়ে মাথার কেশ। ছিন্ন করি সংসারের বেড়ী,
জুটে দলে দলে গৃহী সংঘারামে। বুদ্ধের শরণ
লভিয়া তাহারা করে ভিক্ষু-ব্রত দৈন্যেরে বরণ।
এ দিকে স্বগৃহে রচি ব্রাহ্মণেরা অর্ধ তপোবন
পরাবিদ্যা লয়ে করে সারস্বত জীবন যাপন।
প্রতিটি মুহূর্ত তারা জীবনেরে করে যে সফল,
নাহি ক্ষোভ, নাহি লোভ, নাহি দ্বন্দ্ব, নাহি কোলাহল।

বিরহিণী

চারিদিকে অন্নকষ্ট, হাহাকার, ব্যাধির পীড়ন,
অবিচার, অত্যাচার, দুর্বলের সম্বল হরণ,
রণাঙ্গনে আহতের আর্তনাদ, ঘরে ঘরে শোক,
অসহ্য জ্বালায় আজি জ্ব'লে মরে জগতের লোক।
তার মাঝে এ বর্ষায় বাতায়নে বসি একাকিনী,
উদাস নয়নে চাহি, কে গো তুমি পতি-বিরহিণী

করিতেছ অশ্রুপাত ? সাধ ক'রে বিলাস-ব্যসন,
সুকোমল শয্যাসুখ, প্রসাধন, ভূষণ, অশন
ত্যজিয়াছ। ব্যর্থ হয় হেন ঘন বরষার দিন,
তাই ভাবি নেত্রে তব বর্ষা নামে, তনু তব ক্ষীণ,
মুখ-শতদল ম্লান। কাঁদ' কাঁদ' বিরহিণী নারী,
তোমার সখের দুঃখে ফেলিবে না নয়নের বারি
কোন কবি এই যুগে। প্রশমিতে তোমার বেদনা
পদ্ম-পর্ণে ব্যজনী বা কিসলয়ে শয্যার রচনা
করিবে না কোন কবি। কেহ গান রচিবে না হায়,
ডাহুকী-দাদুরী-পিকে, ময়ুরেরে, নীপে, চন্দ্রিকায়,
নিন্দা করি'। করিবে না অপচার কবি-কল্পনার,
হংস-দূত রচিবার অবসর নাই আজি তার
বিদ্যুৎ-দূতের যুগে। রচিবে না তোমাদের শোকে
মেঘের মন্থর যাত্রা-বিবরণী মন্দাক্রান্তা-শ্লোকে।
সে যুগ গিয়াছে চলি, যেই যুগে তোমাদেরি কথা
বিনাইয়া বিনাইয়া বলিবার ছিল কবি-প্রথা,
ছিল কিছু সার্থকতা। তোমাদের বিরহ-বিলাস
যাহাদের কাব্যচ্ছন্দে বিরচিত দিব্য রসোল্লাস,
নির্মূল সে কবিকুল। যুগ গেছে নিয়ে কাব্যধারা,
দরদী কবির দল কাল-সিন্ধু মাঝে আজ হারা।
বিরহ তেমনি আছে, স্বপ্ন-যুগে আছিল যেমন—
এখন বিরহ শুধু গৃহে নয়, অরণ্যে রোদন।
কাঁদ' বিরহিণী নারী। চাহিবে না কেহ আজ ফিরে,
দশমী দশায়-ও যদি উপনীত হও ধীরে ধীরে।

মোহমুদ্গর

আমার এ দেহ মজ্জা-শোণিত-অস্থি-পিশিত-ময়
জানি প্রিয়তম, এর বেশী কিছু নয়।
এই দেহটার রূপবর্ণনে তুমি ত পঞ্চমুখ
তাহাতে আমার মনে জাগে কৌতুক।
লজ্জা যে পাই। আপন মোহই ঘনায়িত করিবারে
নানা সজ্জায় সাজাইছ মেদোমজ্জার দেহটারে।
আপন মনের কামনায় মোরে কামিনী গড়েছ তুমি,
ক্লিন্ন নরকে গড়েছ স্বর্গভূমি।
রঙিন খেলনা পাইয়া তোমার শিশুসম আহ্লাদ,
ক্ষুধিত, পেয়েছ এই কদন্নে রাজভোগ্যের স্বাদ!
মম আরক্ত ওষ্ঠাধরের পান-পিয়ালায় ঢালি
পিইয়াছ সুধা নিজেরই হৃদয়কুম্ভ করিয়া খালি।
কুম্ভ শূন্য হবে,
পিয়াসা মিটিলে অধরপিয়ালা তখন কোথায় রবে?
মনে জাগে তাই ভয়,
প্রেম কি তোমার শুধু দেহটারে করিয়াছে আশ্রয়?
রক্তে তোমার নিভিবে কামনানল,
এ দেহে আমার মাংস চর্ম রহিবে ত সম্বল,
জরায় পীড়ায় এই দেহ হায় হইলে কান্তিহারা
প্রেমের পালা কি হইয়া যাইবে সারা?
এ দেহটির রূপবর্ণনে তুমি ত পঞ্চমুখ,
ভয়ে কাঁপে মোর বুক।
ক্ষণভঙ্গুর এ তনুলতায় যতই দৃষ্টি পড়ে
অলি-কুসুমের প্রেম স্মরি তত শিহরিয়া উঠি ডরে।

সুপ্তিভঙ্গে

বিকালবেলা ঘুম ভেঙ্গেছে ব'সে আছি জান্‌লাপাশে,
অকাল ঘুমের আবেশটুকু তখনো চোখ জড়িয়ে আসে।
স্বপ্নজালে ছড়ানো মন তখনো ঠিক হয়নি জড়ো,
চির প্রাচীন সৃষ্টিটাকে লাগ্‌ল হঠাৎ মিষ্টি বড়।
মনে হল গাছপালা মাঠ সবই যেন চিত্রে আঁকা,
নিত্য দেখা দৃশ্যগুলি সবই যেন স্বপ্নমাখা।

ঝুরঝুরে ঐ বাতাস যেন কইছে কানে রসের বুলি।
ছায়া যেন মায়ার রূপে চোখে বুলায় কাজল-তূলি।
অপূর্বতা পেয়েছে আজ গাছের পাতা রঙ গড়নে,
নাম-না-জানা পতঙ্গেরা দৃষ্টিতে মোর স্বপন বোনে।
শিউরে ওঠে শিরীষ তরু, অঙ্গে দুলে আলোকলতা,
কাঠবিড়ালী নাড়ছে মাথা, তার সাথে কয় মনের কথা

এক পলকও একটি ঠাঁয়ে পক্ষী দুটি থির না থাকে,
দুইটি পাখীই পক্ষীভরা করেছে ঐ বৃক্ষটাকে।
দুজন সুখে কূজন করে পুচ্ছ নাচায় দোলায় গ্রীবা,
আদিম যুগের প্রেমের লীলা আড়ি পেতে দেখ্‌ছি কিবা।
একটি ছোট ধব্‌ধবে মেঘ দেখছি ভেসে যাচ্ছে দূরে,
সবুজ রঙের একটি ঘুড়ি তাহার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে।

চন্দনের ঐ ফোঁটা ও কি শ্যামলা দিগ্‌বধূর ভালে ?
তাহার নীচেই একটি ছোট তিল কি জাগে তাহার গালে ?

তাল নারিকেলকুঞ্জশিরে আলোর লুকোচুরির ফাঁকি,
গগনরাণীর ময়ূরকণ্ঠী চেলির আঁচল দুল্‌ছে নাকি ?
সোনার আলোয় জ্বল্‌ছে জলা, ঝল্‌ছে বিলের বক্ষখানি,
দিনের ও কি পিছন পানে চাউনি সজল,—বিদায়বাণী ?

চরছে ঘোড়া দীঘির পাড়ে, ঢেউ খেলে যায় তাহার লোমে,
সেই হরষের লহর লাগে অঙ্গে আমার রোমে রোমে।
ভরা কলস দুলিয়ে কাঁখে গ্রামের বধূ ফিরছে ঘরে,
এই দেখা যায়, আবার হারায়—বাঁশ-বাগানে আড়াল পড়ে।
তৃপ্তি যেন মূর্তিমতী ধেনুগুলি ফির্‌ছে ধীরে,
লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে যেন লক্ষ্মী আবার আস্‌ছে ফিরে।

ঘুমঘোরের আবেশভরা নয়নে আজ দেখ্‌ছি চেয়ে,
সৃষ্টি হাসে আমায় হেরে নবীন কলেবরটি পেয়ে।
ঘুম ভেঙে আজ ঘুমের স্বপন মন হ'তে কি বাইরে এসে
প্রাচীন ধরায় অভ্র দিয়ে আড়াল ক'রে বেড়ায় ভেসে ?
দণ্ড কয়েক অকাল ঘুমের ব্যবধানের মধ্যখানে,
সৃষ্টি এমন বদলে যাবে হয় না মনে—হয় না মানে।

দেহমনের সব পরিজন এখনো মোর কেউ না জাগে,
শুধু আমার চোখ জেগেছে হঠাৎ আজি সবার আগে।
তাদের কোলাহলের মাঝে যাঁহা পাওয়া যায় না খুঁজি,
নেত্র আমার নিরিবিলি একলা তাহাই ভুঞ্জে বুঝি।

বর্ষারাতে

নতুন হয়েছে বিয়ে, ঘোরে নি বছর,
তখনো রোজই রাতে মোদের বাসর।
মনে পড়ে শাওনের বরষা রাতি,
গৃহকোণে মিটিমিটি জ্বলন্ত বাতি।
ঝুপঝুপ ঝরত সে বৃষ্টিধারা
ডোবায় গাইত ব্যাঙ রাত্রি সারা।
আসত যুঁইয়ের বাস জানালা দিয়ে
ভাবতাম কখন বা আসবে, প্রিয়ে।
ডাকত তোমায় পোষা কপোতগুলা,
সহসা আসতে তুমি মাথায় কুলা।

শাওনে আঙিনা কাদাপঙ্কে ভরে,
পঙ্কজ ফুটিয়ে সে পঙ্ক 'পরে
এসে ত্বরা কুয়া পারে ধুইতে চরণ,
ম্লান হ'ত আলতার উজ্জ্বল বরণ।
বলতাম—এত দেরি কী যে ছাই কাজ,
বলতে—কোথায় দেরি শিগ্‌গিরই আজ।
খাওয়া-দাওয়া শেষ আজ সকাল-সকাল
ঘড়ি দেখ, সবে সাঁঝ, হায় রে কপাল!

শুকাতো না বাদলায়, চুল এলো তাই,
আজিও আম্‌লা-বাস সে চুলের পাই।
বলতাম, ছেড়ে ফেল শাড়ীটা ভিজে,
বলতে—কোথায় ভিজে? বলছ কী যে!
বলতাম, কত শাড়ী তোরঙভরা,
একখানা বা'র করে পরো না ত্বরা।

এতে তুমি মোর 'পরে রাগতে ভারি,
বলতে—ভাঙব কেন পোশাকী শাড়ী।
বলতাম খুলে ফেল গয়নাগুলো,
নিশ্চয় ওরা নয় নরম তুলো।
ফুলের গয়না যার পরার কথা
কঠিন ধাতুতে তার কেন মমতা ?
বলতে দুলিয়ে দুল নাচায়ে আঙুল,
মালিনী একটা রাখো যোগাবে সে ফুল।

চাবির রিঙ্‌টা খুলে টেবিলে থুয়ে
প্রদীপ নিভাতে যেতে মুখের ফুঁয়ে।
বলতাম—ও কি করো, দাও জ্বলতে,
বরং উসকে দাও ওর পলতে।
এই নিয়ে হ'ত আরো কলহের ছল,
মিলন-স্বাদুতা গাঢ় করতে কেবল।

লাগত বাদলারাত মধুর বড়,
করত নিভৃত গৃহে নিভৃততর।
আকাশ বাতাস মেঘ মাত্‌ত রাতে,
জোরে জোরে কথা বলা চল্‌ত তাতে।
চমকাত বিদ্যুৎ, ধমকাত মেঘ,
নিকটে আন্‌ত তোমা সভয় আবেগ।
মেঘের ডাকের কী যে আসল মানে,
নবদম্পতি ছাড়া কেই বা জানে ?
মনে হ'ত এ বরষা হোক না অশেষ !
নওল প্রেমের এ যে খাঁটি পরিবেশ।

সাফল্য

যশোদার আঙিনায়,
নাচিছে গোপাল, করতালি-তাল দেয় যত গোপিকায়।
পীত ধড়াখানি পরা কটিতটে বাজে তায় কিঙ্কিণী ;
কেশে বাঁধা চূড়া চরণে নূপুর ধ্বনি তুলে রিনিঝিনি।

যশোদা জননী হাত ভরি' ননী দেয় গোপালের করে,
চুরি ক'রে খেতে ভালবাসে, তাই ফেলে দেয় হেলাভরে।
'ফল নেবে ওগো ভাল ফল', পথে পশারিণী হেঁকে চলে,
নাচন থামায়ে গোপাল জড়ায়ে ধরিল মায়ের গলে।

ধরিল বায়না, 'ফল কেনো না মা, খাবনাক ক্ষীর ননী।'
বলিল যশোদা, 'বেশ, কেনো ফল ধান দিয়ে নীলমণি।'
দুটি কচি হাতে অঞ্জলি বাঁধি ধান দিয়ে ভরি তায়,
বাড়ীর দুয়ারে ফল কিনিবারে নন্দদুলাল ধায়।
সব ধানগুলি মাটিতে পড়িল হাত হ'তে গলি' গলি' !
দিল দুটি ধান পশারিণী হাতে 'ফল দাও মোরে' বলি'।

ধান দুটি হাতে হাসিয়া কাঁদিয়া পশারিণী চেয়ে রয়,
সেই মুখ দেখে নয়ন ফেরে না, গদ্‌গদ ভাষে কয়।
"কার বাছা তুমি ? সাধ যায় চুমি মুখখানি বুকে পেলে,
মথুরানগরে আমি কারো ঘরে দেখিনি এমন ছেলে।
তোমারে গর্ভে ধরেছে যে, আহা অসামান্যা সে সতী !
তোমারে স্তন্য পিয়ায়ে ধন্য কোন্ সে পুণ্যবতী ?

যতগুলি খুসী ফল লও তুলি পাকা দেখে বেছে বেছে।”
গোপাল ছু’হাতে ছুটি ফল সাথে ফিরে গেল নেচে নেচে।
ভাবিতে লাগিল পশারিণী বসি’—এত কাল বেচি ফল,
আজি ফলবেচা হইল সফল, চোখে ঝরে তার জল।

ছুটি ধান নিয়ে ছুটি ফল দিয়ে পশারিণী গেল ফিরে।
ভালো ক’রে পথ দেখিতে পায় না ঝাপসা নয়ন-নীরে।
সারা পুরপথে হাঁকিল না মুখে ‘ফল নেবে’ ব’লে আর,
বহিয়া পশরা আন্‌মনে ত্বরা যমুনা হইল পার।
গৃহে ফিরে গিয়ে দেখে বিস্ময়ে ডালার ঢাক্‌না তুলি,
ফল তার হয়েছে মাণিক, স্বর্ণ বাকিগুলি।

ডালা করি’ কোলে কাঁদে আর বলে, “ওরে মোর বাছাধন,
সোনা মণি দিয়ে ভুলাবে আমায়? মিছে এই প্রলোভন।
ছুটি ধানে মোরে কিনেছ, বাছারে, ধনে মোর কাজ নাই।
এই সোনা মণি যমুনায় ডারি তোমা সোনামণি চাই।

কি হবে তাহার বেচাকেনা আর, ফল তোমা সঁপিয়াছে।
চলিনু এখনি তব দাসী হ’তে তোমার মায়ের কাছে।
ক্ষুধা পেলে তোমা নবনী খাওয়াব, কাজলে ভূষিব আঁখি,
ভুবন ভুলিব জীবন জুড়াব অঙ্গে অঙ্গ রাখি।

ঘুম পেলে তুমি ঘুমায়ে পড়িবে আমার এ কোলে এসে,
আঁচলের বায় ব্যজন করিব, চূড়া বেঁধে দিব কেশে।
তোমার চরণ-কমল মুছাব আমার মাথার চুলে,
তোমা ধনে বাছা ভূষিব তুষিব ফলে নয়, ফুলে ফুলে।”

মা বসুন্ধরা

দেখেছ বৎস, নিকুঞ্জবন ফুলে ফুলে আলো-করা
তটিনীবক্ষে লক্ষ তরণী কক্ষে পণ্য ভরা।
দেখেছ বৎস, ফলভারে নত আম্রকদলীবন,
সোনার ধান্যে ভরা প্রান্তর জুড়ায়েছে দুনয়ন।

দেখেছ বৎস, দূর্ দিগন্তে সুনীল গিরির শ্রেণী
মেঘের মতন ভাবিয়াছ তায় আমার এলানো বেণী।
দেখনি শতেক যোজন জুড়িয়া মরুভূমি করে ধূধূ,
হিমমণ্ডল দেখনি যেখানে কঠিন তুহিন শুধু।

দেখনি তুঙ্গ গিরির অঙ্গে চির হিমানীর ভার।
দেখনি নিবিড় রবিকররোধী অটবী আফ্রিকার।
দেখনি অগ্নিগিরির কটাহ বিদীর্ণ জ্বালানলে,
যেথা অবিরত পঞ্জর মোর লাভা হয়ে দ্রুত গলে।

দেখেছ মায়ের হাসিমুখ আর হাতের ব্যজনীখানি,
পিয়েছ স্তন্য, পেয়েছ অন্ন, শুনেছ সোহাগবাণী।
দেখনি মায়ের ক্লান্ত করুণ নয়ন দীপ্তিহারা,
দেখনি মায়ের শুকানো বদন লুকানো প্রপাতধারা।

ভয়ে ভাবনায় কত উদ্বেগে পরাণ তাহার জ্বলে,
দহিতেছে তার আরাম বিরাম দাবানলে লাভানলে।
জানো না বৎস, কেবল তোমার হাসি মুখখানি দেখে,
আনন্দময়ী সেজেছে জননী সকল বেদনা ঢেকে।

উর্বশী ও পুরূরবা

মানুষের ঘরে নেমে এসেছিল স্বর্গের অপ্‌সরী
প্রেমে নেমেছিল মানবীর রূপ ধরি'।
একদা সহসা মিলাইয়া গেল কোন সে অশুভ খনে,
কোন' রূপ আর ধরেনি সে ত্রিভুবনে।
সেই অপ্‌সরী উর্বশী যার ছিল লীলাসহচরী
সেই পুরূরবা আজো খুঁজে তায় নিখিল বিশ্ব ভরি।
যুগে যুগে সে যে নবীন জন্ম লভি
দেশে দেশে হ'ল কবি।
খুঁজে সে গগনে ভূধরে গহনে তটিনীর কূলে কূলে
খুঁজে তরঙ্গে, মৃগ-বিহঙ্গে, কাননের ফুলে ফুলে,
সন্ধ্যাতারায়, জ্যোৎস্নাধারায়, শরতের ছায়াপথে,
দামিনীছটায়, মেঘের ঘটায়, ইন্দ্রের মায়ারথে।
খুঁজে সে নিখিল ললনাকুলের লাবণ্য-সুষমায়
ক্ষণে ক্ষণে চমকায়।
কোথাও দেখে সে সেই কটাক্ষ, কোথাও দেখে সে হাসি,
কোথাও দেখে সে ঘন কুন্তলরাশি।
কোথাও দেখে সে বসনপ্রান্ত, কোথাও রক্তাধর,
কোথাও শোনে সে পদপল্লব তুলে যায় মর্মর।
কোথাও শোনে সে কণ্ঠের বাণী, পায় অঙ্গের ঘ্রাণ,
কোথাও ক্ষণিক পরশ লভিয়া শিহরি মুহ্যমান।
কোথাও দেখে সে গুরু নিতম্ব, চারু পয়োধরচূড়া।
কোথাও দেখে না পূরা।
প্রকৃতির মাঝে বিলীন হইয়া দেহবিমুক্তি লভি,
দিব্য ললনা করিছে ছলনা হায় রে জানে না কবি।

ফিরে পেতে তারে খুঁজিতেছে নিতিনিতি
এই সন্ধানই বাণীরূপ ধরে হইয়া কাব্যগীতি।
যুগে যুগে তাই এক কাব্যই হইতেছে ভাসমান
নাম বুঝি তার উর্বশী সন্ধান।
কবি পুরূরবা ক্লান্ত হইয়া নবীন জন্ম লভে,
সে ভাবে এবার উর্বশী তার ঘরের প্রেয়সী হবে।

শরণ্যের প্রতি

হে দেবতা, জানি অমোঘ নিয়মে শাসিত চালিত এ মরঃলোক,
ব্যত্যয় তার কখনও হবে না, বৃথা আবেদন বৃথাই শোক।
আমি তুমি দোঁহে সমান শাসিত একই অব্যয় শাসন-বলে,
সমান অধীন মহারুদ্রের স্বষ্টিপ্রলয়-চক্র তলে।
মূঢ় মন তবু বুঝে না যে কভু, বিপদে তোমারি শরণ যাচে,
যবে ভূকম্পে বাড়ী টলমল শিশু ছুটে যথা মায়ের কাছে।
মনে পড়ে সেই কাদম্বরীর শুকশিশু যথা যাইল ছুটে,
ব্যাধেদের ভয়ে গলিত-পক্ষ জীর্ণ পিতার পক্ষপুটে।

মন্বন্তরে তুমি আমি দুইই ডুবে যাই ঘোর ধ্বংসকূপে।
তুমি যে অমর, ফিরে আস তাই এই নর-লোকে নবীন রূপে ;
আমিও মরি না, ফিরে এসে পুন দুর্দিনে ডাকি 'বাঁচাও স্বামী'।
যুগে যুগে এই চলে অভিনয়, তুমি ত্রাতা সাজো, আর্ত আমি।
কত বার তুমি ডাকিয়া বলেছ "মোর কাছে যাচ শরণ বৃথা।
আমি ত্রাতা নই, ভ্রাতা হ'তে পারি, সম দুখভাগী তোমার মিতা।"
জলে ডুবে যে সে ঢেউ চেপে ধরে ভেলা ভাবি, হায় তাহারি মত,
বিপদে পড়িলে তোমারেই ডাকি এ ভুল মোদের স্বভাবগত।

মৃগ

আয় মৃগ কাছে আয়,
ভয় নাই তোর আমি ব'সে আছি মালিনীর কিনারায়।
হাতে দেখ্ মোর দূর্বার দল, পাশে নেই ধনু-শর,
তবে কেন তোর ডর?
তোর চোখ দুটি কবির স্বপ্নে গড়া,
কত না আকূতি আরতি কাকুতি ভরা।
মনে যে জাগায় সরল তরল মায়ামাখা দুটি চোখ
অতীতের সেই ফেলে-আসা মায়ালোক।
জড়ভরতের মুগ্ধ মমতা ও নয়নে হেরি আঁকা,
যমুনাকূলের ব্রজের মাধুরী-মাখা।
ও আঁখির দরপণে—
হেরিতেছি আমি গোদাবরী-তীর মালিনী-তীরের সনে।
হেরিতেছি তায় ঋষিদের আশ্রম,
তোর দুটি চোখ দিব্যচক্ষু বলি হয় মোর ভ্রম।
ও দৃষ্টি তোর নেই যেন ইহলোকে,
ঋষিরা তাদের পরম তৃষা কি রেখে গেল ঐ চোখে?
দেশকালাতীত তোর ও দৃষ্টি কোন্ সে অসীমে ধায়,
চোখে চোখ দিতে প্রাণ কেন চমকায়?
অঙ্গ আমার লেহন করিয়া করে দে আমায় শুচি,
যুগ যুগ হতে জমা মালিন্য সবি যাক তায় ঘুচি।
আপন ভবনে যেতে চাই পুন ফিরে
তোরে সাথে করে সেই বিন্ধ্যের পাদমূলে রেবা-তীরে।
শৃঙ্গশিখরে অঙ্গ আমার করে দে কণ্ডূয়ন,
ঢুলিয়া পড়ুক রসাবেশে দু নয়ন।

বুক করে দুরুদুরু,
প্রেমের ভারতে স্বপ্নের পথে যাত্রা হউক শুরু।
আয় মৃগ কাছে আয়,
তোর রোমাঙ্গ পরশ করিতে রোমাঞ্চে ভরে কায়।

অতীত

অতীত ? বিলুপ্ত সে ত বাঁচে শুধু আমারি মাঝারে,
অতীত দিনের তরে হা-হুতাশে ফেলি দীর্ঘশ্বাস।
বুনেছি অতীতস্মৃতি দিয়া জাল মোর চারিধারে
তারি মাঝে নিশিদিন উর্ণনাভ সম করি বাস।

বর্তমান ? সে ত শুধু অসন্তোষ, ঈর্ষা, প্রবঞ্চনা,
ন্যায্যপ্রাপ্য-বঞ্চিতের আর্তকণ্ঠে শুধু হাহাকার।
বুকে বুকে লুব্ধ তৃষ্ণা, মুখে মুখে ক্ষুব্ধ আলোচনা :
তা'হতে ঘৃণায় ভয়ে দৃষ্টি মোর করেছি সংহার।

ভবিষ্যৎ ? চাহি যদি তার পানে হেরি বিভীষিকা,
সমস্ত দুনিয়া ভরি চলে যেন ফরাসী বিপ্লব।
বোমায় বিধ্বস্ত বিশ্বে নৃত্য করে শুধু মরীচিকা,
ছিন্নমস্তা সভ্যতারে ঘেরি চলে প্রেতের তাণ্ডব।

আতঙ্কে স্তম্ভিত করে ভবিষ্যৎ দুঃস্বপ্ন তর্জনী
বিষবাষ্পে অবরুদ্ধ করে কণ্ঠ ক্রূর বর্তমান।
সান্ত্বনার লাগি রচি অতীতের পুনরাগমনী।
কারুণ্যের সুরে গাই এ কুলায়ে তারুণ্যেরই গান।
চোখ মেলি চাইনাক চারিপাশে কিংবা অনাগতে,
দৃষ্টি মোর তৃপ্তি খুঁজে অতীতের ছায়াচ্ছন্ন পথে।

পিণ্ডদান

আনন্দরাম রায়,
তোমারে একটি প্রশ্ন করিতে মোর আজি সাধ যায়।
পিতামহস্য তুমি ছিলে পিতামহ—
কহ দেখি দাদু কহ,
ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে কেমনে বাঁচিলে তুমি
পাষাণ যখন হ'ল রাঢ়ী মাটি, শ্মশান বঙ্গভূমি?
আমি পঞ্চাশী মন্বন্তরে খেয়ে রেশনের চাল
বাঁচিয়া গেলাম, ছিল না রেশন তোমার কি হ'ল হাল?
তুমি ত তখন বারো বছরের ছেলে—
ভিক্ষা করিলে? ভিক্ষা বা কোথা পেলে?
বাপ-মা তোমার উপবাসী র'য়ে কত দিন কত রাত,
যোগাইল তব মুখে দুই মুঠা ভাত?
ঘরেই তোমার ছিল সম্বল? লুটে নেয়নিক লোকে?
কি ভাবিতে তুমি পাড়াপড়শীর মরণ দেখিয়া চোখে?
ক্ষুধিতে হয় ত সঁপিয়া মুখের গ্রাস
শুধু জল খেয়ে করিয়াছ উপবাস।
দুধ খেতে তুমি পোষা রোগা গাভীটার?
তৃণটি ছিল না, চাল টেনে খেয়ে দুধ শুকায় নি তার?
ভাদরের রাতে ক্ষুধা মিটাইতে পাকা তাল বুঝি খেলে?
তালকুড়ানীর অভাব ছিল না তাই বা কোথায় পেলে?
ক্ষুধার জ্বালায় মরিল কি তব মাতা?
কয়দিন তুমি চিবালে গাছের পাতা?
তেঁতুল গাছেও পাতাটি ছিল না, পাতা দিল কোন্ তরু?
কেমনে তরিলে ছিয়াত্তরের মরু?

মোর পিণ্ডের অতীত যদিও হয়েছ পিতৃলোকে,
নান্দীমুখের আসনে অশ্রু ঝরিছে তবু এ চোখে।
অশ্রুমাখানো পিণ্ড তোমায় আগে দেব পিতামহ,
তব পৌত্রের পৌত্রের এই তণ্ডুল ক'টি লহ।
বহু ক্লেশ সয়ে একদা পিণ্ডাভাবে,
বেঁচে গেলে তাই ধন্য হয়েছি পিণ্ডাধিকার লাভে।

গুরু শিষ্য

'মহাজ্ঞান' দেন শিব, মহামায়া করেন হরণ।
অপ্সরার ভ্রূবিলাস যুগব্যাপী সাধনার ধন
নিমেষে লীলায় হরে। তপ শুধু তৃষার সঞ্চয়,
বহ্নি তার যাজ্ঞিকেরে একদিন করে ভস্মময়।
দেহের বলের সাথে ক্ষীণ হয় মানসেরও বল,
জরা আসে, শ্লথ হয় যৌবনের সংযমশৃঙ্খল।
অহিফেনে তন্দ্রাচ্ছন্ন হিংস্রপশু কেটে গেলে ঘোর
হুঙ্কারি' গরজি উঠে মানেনাক শাসন কঠোর,
শোণিত পিশিত চাহে! যুগে যুগে খেয়াঘাটে পড়ি
আবাল্য-তপস্যারত কত গুরু যায় গড়াগড়ি।
পুরুরে সঁপিয়া জরা ভোগে মগ্ন রাজর্ষি যযাতি,
চ্যবন ভৈষজ্য খুঁজে ফিরাইতে যৌবনের ভাতি।

কেবা বৈরী তপস্যার? তপ কার প্রতীপাচরণ?
প্রতিশোধ নিতে তার কেবা রচে কদলীপত্তন

সাধনার মরুপথে ? রুদ্ধ করি ইন্দ্রিয়ের দ্বার
কঠোর নিগ্রহকৃচ্ছ্র তিলে তিলে কারে অস্বীকার ?
কার রোষ উদ্দীপন ? আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি
নির্মম নিয়তিরূপা, একি নয় তারে অস্বীকৃতি ?
পুরুষকারের সাথে প্রকৃতির এই যে সংগ্রাম
চলিতেছে যুগে যুগে, লভিতেছে একই পরিণাম
মহাযোগী, মহাদৈত্য। মা বলিয়া না নিলে শরণ
মহাতপস্বীরও গতি চণ্ডমুণ্ডশুম্ভেরি মতন।

হে গুরু গোরক্ষনাথ, মোহমুগ্ধ গুরুর পতনে
যে শিক্ষা লভিলে তুমি তব ক্লিষ্ট তাপসজীবনে,
মহাজ্ঞান হ'তে তাহা ঢের বড়। বিরূপা শক্তির
পাষাণ-হৃদয়ে তুমি সঞ্চারিলে বাৎসল্যের ক্ষীর।
মা ব'লে শরণ নিয়ে তারে তুমি জিনিলে সংগ্রামে,
বামারে দক্ষিণা তুমি করেছিলে সাধনার ধামে।

মনে জাগে সেই চিত্র, ভক্তিভরে ধরি দুটি হাতে
পঙ্কিল পল্বল হ'তে উদ্ধারিছ গুরু মীননাথে।
গুরু হ'তে শিষ্য বড় এই সত্য জাগে তার সনে,
জগতের জ্ঞানলোকে যুগে যুগে ক্রমবিবর্তনে
শিষ্যপরম্পরা-ক্রমে সাধনার শক্তি বেড়ে যায়।
শিষ্যধারা মগ্নতনু ভগ্নজানু গুরুরে বাঁচায়।
শ্রান্ত হ'য়ে গুরু যদি ব্রতভঙ্গে সুখতন্দ্রাগত
শিষ্য করে উদ্‌যাপন গুরুত্যক্ত সংকল্পিত ব্রত।

বাল্যস্মৃতি

অবাক করিত মোরে
কেমনে শীর্ণ ঝিঙের লতাটি ফুলে ফুলে যেত ভ'রে।
ভাবিতাম লতা কোথা হতে এত হলুদিয়া রঙ পায়,
সবুজ কেমনে সোনালী হইয়া খড়ের চালাটি ছায়।
ভাবিতাম তাই, বৈকালী রোদ পান করি তার হাসি
ফুটে কি উঠিল দোচালা ভরিয়া ফুল হয়ে রাশি রাশি ?

অবাক করিত মোরে
শূন্য সে মাঠ সবুজ ফসলে ভরিত কেমন ক'রে।
বৈশাখে শুধু করিত যা ধূ ধূ, বহিত তপ্ত হাওয়া
এমন শ্যামল সুষমা সেখানে কেমনে যাইত পাওয়া।
আকাশের মেঘগুলোরে মাটিতে বেঁধে কি রাখিত কেউ ?
উড়িতে না পারি চঞ্চল হয়ে তুলিত কেবল ঢেউ ?

অবাক করিত মোরে
কেমন করিয়া আষাঢ়ে আকাশ ঢেকে যেত ঘন ঘোরে।
ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে খাঁ খাঁ চারিদিক ঝলসিয়ে যেত আঁখি
চাতক শিশুর তৃষিত কণ্ঠ ফেটে যেত ডাকি ডাকি,
ছুটিয়া আসিত হয়ে কি ব্যথিত শুনিয়া 'ফটিক জল'
ঝরাইত জল তৃষ্ণা হরিতে তাই কি মেঘের দল ?

অবাক করিত মোরে
মৌমাছিগুলি কেমনে অমন মৌচাক তোলে গ'ড়ে।
বনের ভিতরে গাছে ফুল ফোটে কেমনে তা পায় খোঁজ !
কতটুকু মধু ছোট মুখটিতে বয়ে আনে তারা রোজ !

সুমধুর সুরে গুঞ্জন করি ঘুরে তারা দলে দলে
তাই কি জমিয়া মোম হয় আর তাই মধু হয়ে গলে ?

অবাক করিত মোরে
বাবুই বাসাটি গড়ে তালগাছে কত দিনরাত ধ'রে।
শাবকেরই তরে দোলা, বাসা নয়, ভিজে মরে তাই নিজে।
ভাবিতাম দেখি, সে ত ছোট পাখী, তারও ভালবাসা কিযে।
আহার আনিতে যায় দূর পথে বাসা চিনে ঠিক ঢোকে,
মিহিন সূতায় বাঁধা থাকে সে কি দেখিতে পাইনা চোখে ?

তালপাতার পুঁথি

তালপাতা চিরে চিরে তাই গাঁথি রচেছিলে পুঁথি।
যাহা শুধু ছিল স্মৃতি, শুধু ছিল শ্রুতি,
তাহাই শলাকা দিয়ে সে পুঁথিতে রেখেছিলে ক্ষুদি',
হে সাধক, সারস্বত সুধী।
অমৃতস্য পুত্রগণে তব ধ্যান, তব জ্ঞান, তব অনুভূতি,
রসোচ্ছল প্রাণের আকৃতি,
জানাইতে কতই না ছিল আকিঞ্চন !
রাখিতে চাহিয়াছিলে অমর করিয়া ইষ্টধন।
কত কথা হ'লনাক বলা,
চিন্তার বাহনহারা কত চিন্তা হইল নিষ্ফলা।
সংক্ষেপে বিবৃত বলি তব চিন্তা হ'ল সূত্রাকারা
ব্যাখ্যার অভাবে তার লুপ্ত হ'ল ধারা।
নশ্বরের পটে তুমি ক্ষুদে গেলে যে শাশ্বতী বাণী—
বিকৃত করিল তারে কীট দন্ত হানি',
ভুলাইয়া দিল মুছি মহাকাল বুলাইয়া পাণি।

আজি গ্রন্থারণ্যে বসি, কি পড়িব খুঁজিয়া না পাই।
পাঠ্যের অভাব আজ নাই,
তবু মহাসারস্বত, স্মরি তব কথা
মনে পাই ব্যথা।
করিতে বিশ্বের ধন চেয়েছিলে নিজস্ব সাধনা
নিঃস্ব তুমি, তার তরে সয়েছিলে কত না যাতনা!
কুটীরে জ্বলিলে বহ্নি শুধু তব পুঁথিখানি বুকে
বাহিরে আসিয়া ছুটি হেসেছিলে নিশ্চিন্ত কৌতুকে।
মরণশয্যায় তুমি আর সব ভুলি
কম্প্রহস্তে পুঁথিখানি পৌত্র হস্তে দিয়াছিলে তুলি।
কুটীরের চাল ভেদি হ'ত ধারাপাত,
বরষায় জাগি সারা রাত
পুঁথিখানি বক্ষে বহি সারা ঘরময়
সে দুর্যোগে খুঁজিয়াছ নির্জল আশ্রয়।
কত তত্ত্ব, কত তথ্য, অধিগম্য আজিকে আমার
ছাপা পুঁথি পেয়ে; তবু মনে হয়, সর্বতত্ত্বসার
জানাইতে চেয়েছিলে, পেয়েছিলে যাহা সাধনাতে।
হয়ত চরম সত্য ছিল সুপ্ত তালের পাতাতে
যা জানিলে রয়নাক জানিবার আর কিছু বাকি।
উন্মীলিত ক'রে দিত হয়ত বা আমাদের আঁখি
অজ্ঞান তিমিরজালে ঢাকা,
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার রূপ ধরি তোমার শলাকা।
যত ভাববিলাসীর অসার কৃত্রিম কথামালা
ভরিয়াছে এই গ্রন্থশালা,
মহাজ্ঞানী তাপসের সুধাময়ী সনাতনী ভাষা
মিটাল কীটের ক্ষুধা আর মহাকালের পিপাসা!

অশ্বারোহী বীর

অশ্বারোহী বীর তুমি, কোষে তব অসি খরশাণ,
বর্শা তব শোভে বাম হাতে।
ভালে দৃপ্ত কান্তি কই? কি চিন্তায় মুখ তব ম্লান
চোখে কেন দীপ্তি নাহি ভাতে?
জিপ্‌চারী যত সেনা উপেক্ষিয়া তোমা চলি যায়
রণে কেহ ডাকে না'তো তোমা!
তোমার গিয়াছে দিন! নানা রণযন্ত্রে ধরা ছায়,
আসিয়াছে গোলা, শেল, বোমা।

গেছে সে শৌর্যের দিন, গর্ত খুঁড়ি লুকায়ে সৈনিক,
দূর হতে মারণাস্ত্র ছাড়ে,
মুখোমুখি যুদ্ধ নাই, নিরাপদে রহি বৈমানিক
হত্যা করে হাজারে হাজারে।
এই কাপুরুষ-যুগে বীর তব ফুরায়েছে কাজ,
কি হবে শাণায়ে আর অসি?
সমুদ্রের পরপারে শোন গর্জে আণবিক বাজ;
গ্রামে ফিরে খাও জমি চষি।

কি হইবে অশ্বটির? ও অশ্বেরে ভালবাসো বড়?
বেচিতে হইবে বড় ক্লেশ?
জানো কি খেলিতে পোলো? তার চেয়ে এক কাজ করো,
জকি হ'য়ে খেল গিয়ে রেস।
দিন ফুরায়েছে বলি হে বীর হয়ো না ম্রিয়মাণ,
ফুরায় যে সকলেরই দিন।
সগৌরবে রবে তুমি, না ডাকুক রণ-অভিযান,
কাব্যে তুমি র'বে মৃত্যুহীন।

প্রাচীন বঙ্গ

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
গড়িলে একদা সিন্ধুপারের দ্বীপে দ্বীপে নব উপনিবেশ।
ধর্মশাসিত সভ্যতা নব
প্রচারি শিল্পী সন্তান তব
শ্যাম কম্বোজ সিংহল যব প্রেমের আয়ুধে করিল জয়।
ঘোষিল কীর্তি এসিয়াময় ॥

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
স্মরি মা তোমার বৈশ্য-গরিমা স্মরি মা তার সে শ্রেষ্ঠিবেশ।
শত বৈঠার বহর সঙ্গে
ভাসিত শাসিয়া খর তরঙ্গে
কত শ্রীমন্ত, ধনপতি, চাঁদ হেলায় তরিত উপসাগর,
তুড়িতে উড়াত তুফানঝড় ॥

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
আজো কানে বাজে কোলাহল মাঝে তব মঙ্গলগীতির রেশ।
করিল ভক্তি-কমল ফুল্ল
প্রতি পল্লীরে তীর্থতুল্য,
শত গীতিকবি কত দেবদেবী-পদাব্জ সেবি গাহিল গান।
আজো তা চেতায়, মাতায় প্রাণ ॥

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
স্মরি মা সেদিন ছিল না যেদিন ক্ষুধা, আধি, ব্যাধি-আদির ক্লেশ

অঙ্গ জুড়াত হরিচন্দন,
উশীরগন্ধমোদিত পবন,
হরিত প্রদোষে গ্লানি-মালিন্য সারা দিবসের চিত্তভার,
কীর্তনে ঢালা নেত্রাসার ॥

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
সন্তান তব বিদেশের পানে রহিত না চাহি নির্নিমেষ,
হাট ভরিত না জাহাজী পণ্যে
বাট হেন যানে জনতারণ্যে
বিজাতীয় রীতি বিলাসের প্রীতি হরিত না নিতি ধর্মবল,
মলিন করিয়া মর্মতল ॥

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
সন্তোষঘন অন্তরে তব ছিল না কখনো চিন্তালেশ।
বারোমাসে গৃহী ব্রতপার্বণে
মিলিত অতিথি স্বজনের সনে,
অলিকুলসম কলগুঞ্জনে তুলি মৌচাকে মিলনতান,
ভুলি হানাহানি মানাভিমান ॥

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ
স্মরি সে উজানী গৌড়, নদীয়া, হোসেন, নসিরা, রাজা গণেশ।
রণিত কাঁকণ সাঁঝে ঘাটে বাটে
ধ্বনিত রাখালী বেণু গোঠে মাঠে,
দেহে দেহে ছিল স্বাস্থ্যকান্তি, গেহে গেহে ছিল মহোৎসব।
অশিবে শাসিত শঙ্খরব।

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
তসরের শাড়ী পরি তব নারী শিরীষকুসুমে ভূষিত কেশ।

চিরবহমানা ছিল জাহ্নবী
ধেনুগুলি যেন ক্ষীরদা সুরভি ।
জানিত না ত্বরা, ছিল মন্থরা জীবনযাত্রা রাত্রিদিন ।
ছিল না প্রবাস, ছিল না ঋণ ॥

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
সন্তান তব কেশরী না হোক, মানুষই ত ছিল, ছিল না মেষ
লাঠিতে রাখিত মাটির দখল
দূরে যেত ভয়ে দস্যুসকল,
নামে পরাধীন, রহিত স্বাধীন, বহিত সাহস দরাজ বুক,
গ্রামে গ্রামে ছিল স্বরাজসুখ ॥

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
পুণ্যবাহিনী পূর্ব কাহিনী কত বর্ণিব সে যে অশেষ ।
'সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—
এর বেশি কিছু চাওনি ধরাতে ।
ফিরে যদি পাই তাই শুধু চাই, চাই না পৌর আড়ম্বর,
ফিরে চাই সেই দুধের সর ॥

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
অশুভক্ষণে বিদেশীর পোত গঙ্গাসাগরে করি প্রবেশ,
সপ্তডিঙারে ডুবাইল জলে
লক্ষ্মী পলায়ে গেলেন অতলে ।
সাতশত পোতে সাত সমুদ্র মন্থন করি ফিরাব তাঁয়,
একি শুধু হবে স্বপ্ন হায় ?

স্বপ্নসম্ভোগ

আমাদের এই ঘরে উনপঞ্চাশের পরে
দীপ কেন ? অন্ধকারই ভালো।
নিষ্ঠুর সত্যেরে বাতি দেখায় যে সারা রাতি
চাইনাক তাই তার আলো।

কল্পনা আঁধারই চায়, সৃষ্টি তার দগ্ধ হয়
প্রদীপের শিখার আঘাতে,
সহে না সে বর্তিকায় ফুঁ দিয়ে নিবায় তায়
মুদাইয়া দেয় আঁখি পাতে।

চল সখি যাই ফিরে মোদের যৌবননীড়ে
কল্পনার ব্যোমচারী রথে,
সকল ইন্দ্রিয় রুধি ক্ষীণতেজ চক্ষু মুদি
অন্ধকার অভিসারপথে।

চল সখি সেথা গিয়া মনের মাধুরী দিয়া
এই তনু ভাঙি পুন গড়ি।
হারানো সে দিনগুলি গিয়াছি যা এবে ভুলি
স্মরি তনু উঠুক শিহরি'।

যৌবন গিয়াছে চলি, ক্ষোভ কেন তাই বলি ?
আছে মন তেমনি সরস,
অন্ধকারে তা যে পারে দেহ থেকে হরিবারে
অনায়াসে বিশটি বরষ।

মানসী

বাহিরে তো জনারণ্য, অন্দরে রয়েছ তুমি প্রিয়া,
প্রিয়তরা যেই জন আছে সে তো অন্তরে বসিয়া।
চমকি উঠ না প্রিয়ে, সে মানসী, নহে সে মানবী,
অস্পূয়ার অতীতা সে, চির মধুমাসের মাধবী।
কারে বেশি ভালবাসি দ্বিধা জাগে, তোমারে না তারে?
তব সঙ্গ তব রঙ্গ তৃপ্তি তুষ্টি দিয়াছে আমারে।
জুড়াল ব্যাধির দাহ তব করে উশীর-ব্যজনী।
নিষ্ঠা তব অবিচলা, সেবিতেছ দিবস রজনী।
সকল দায়িত্বভার বহিতেছ সহিতেছ তুমি,
আমারি কল্যাণপুষ্পে ভরা তব মনোবনভূমি।
জীবনসঙ্গিনী অয়ি, নাই বিশ্বে তোমার তুলনা,
আমি তব "মালঞ্চের মালকার", সে কথা ভুল না।

অন্তরে যে বিরাজিছে এইবার তার কথা বলি।
তুমি তো পিয়াও মধু, সে পিয়ায় অমৃত অঞ্জলি,
মনের ব্যাধির দাহে বুলায় সে তার পাণি-পুট,
ভুলায়ে সে সব ব্যথা পরায়েছে যশের মুকুট।
পথচারি-জনারণ্যে কোনদিন যেতাম হারায়ে,
ধরিয়া রাখিত মোরে যদি না সে হাতটি বাড়ায়ে।
হারায়েছি যে আনন্দ উপভুক্ত শৈশবে কৈশোরে,
জীবনের যে আনন্দ হরিয়াছে নানা দস্যু-চোরে,
যে আনন্দ পাই নাই বহু ভোগ্যে, তার ক্ষয়ক্ষতি
পূরণ করিয়া দিল অন্তরের সেই আয়ুষ্মতী।
তারে বেশী ভালবাসি, বলি যদি হবে কি কোপনা?
তোমারে বাসিতে ভাল সে-ই মোরে দিয়াছে প্রেরণা।

ব্যর্থতার সার্থকতা

সাধনা-শৌর্যের বলে যারা লভে সাফল্য-বিজয়,
তাহাদের স্মৃতি পূজে বর্ষে বর্ষে জাতীয় উৎসব,
তাহাদের জয়গানে ইতিহাস কভু ক্লান্ত নয়,
মূর্তি চূড়া স্মৃতিস্তম্ভে উদ্ঘোষিত তাদের গৌরব।
আর যারা বিন্দু বিন্দু করিয়াছে বক্ষোরক্তপাত,
সমস্ত জীবনখানি সাধনায় করি নিবেদন,
সাফল্য করেনি লাভ, তবু তারা মর্মে দিবারাত
পুষিয়া রেখেছে ব্রত, শাবকেরে কুলায় যেমন ;
লুপ্ত কি তাদের স্মৃতি ? সন্তরিয়া আসি কিনারায়
হয়ত হয়েছে মগ্ন পরিশ্রান্ত তাদের জীবন।
যে ব্রত সমাপ্ত করি অনায়াসে অন্যে যশ পায়
হয়ত করেছে তারা তারি হাতে সে ব্রত অর্পণ।
তাদের কি ভোলা যায় ? তারাই ত অন্তরঙ্গ জন,
অসমাপ্তব্রতী মোরা ধন্য গণি তাদের প্রয়াস,
অন্তরের সিদ্ধাশ্রমে আছে তারা ধেয়ানে মগন,
সর্ব ব্যর্থতার মাঝে তাহাদেরি শুনি দীর্ঘশ্বাস।
সর্ব অবিচার মাঝে তারা আজো কাঁদিয়া কাঁদায়।
তাহাদের লাঞ্ছনার প্রায়শ্চিত্ত করে বিশ্বলোক,
কাব্য-নাট্যে কল্প-দেহে তাহাদের ব্যথা রূপ পায়,
লক্ষ লক্ষ শ্লোক-রূপ ধরে আজি তাহাদের শোক।
সেই শোকে যুগে যুগে বিশ্ববাণী করে অশ্রুপাত,
সেই অশ্রু অভিষেক লভি তারা হয়েছে দেবতা,
তাদের বেদনা নব-সাধনার করে সুপ্রভাত,
অপূর্ণ তাদের ব্রত বিশ্বচিত্তে লভে যে পূর্ণতা।

কর্মে অধিকার জেনে সঁপে গেছে কর্মফলচয়
বিশ্বনর-ব্রহ্মে তারা, বৈশ্বানরে আহুতির মত,
নিঃস্ব নর ছিল তারা, হইয়াছে বিশ্বনরময়,
সার্বভৌম হইয়াছে তাহাদের জীবনের ব্রত।

ধরণীর প্রতি

লক্ষ লক্ষ যুগ ধরি, রে জননি, এই বক্ষে তোর
আসা-যাওয়া মোর।
বারবার ফিরে এসে বাড়ায়েছি তোর বক্ষোভার।
সেই ভার জমে জমে হলো কি মা পর্বত-পাহাড়?
বার বার শুষিয়াছি তোর স্তন্যধারা,
সে শোষণ রচিল কি শুষ্কতালু বালুর সাহারা?
আনন্দ দিয়েছি তোরে শিশু যবে, কত না সময়
ভাষে হাসে তা তো মিথ্যা নয়,
তারই স্মৃতি মা কি তোর মাঝে মাঝে মনে জেগে ওঠে
রোমাঞ্চিয়া হয় তৃণ, তাই বুঝি, ফুল হয়ে ফোটে?
আনন্দ যা পেয়েছি মা তা তো ভুলে যাস
ব্যথা যত পেয়েছি মা স্মরি তাই বুঝি ব্যথা পাস!
বহুদিনকার জমা দীর্ঘশ্বাস তোর, মুক্তি পেয়ে
কালবৈশাখীর রূপে আসে বুঝি ধেয়ে।
গেলাম বিদায় নিয়ে বার বার, হায় তারি শোকে,
অবারিত অশ্রুধারা ঝরেছে ও-চোখে।
তোর চোখে ঝরা সেই লবণাক্ত জল
মহাসিন্ধু হয়ে বুঝি তোরে ঘেরি করে টলমল।

গোধূলির ডাক

এস বধূ শোন, দীঘি ডেকে যেন কী কথা বলে,
ডাকে সে ভরিতে পিতল কলসী শীতল জলে।
না মুদিতে তার নয়ন-কমল
এস, তার হিয়া হয়েছে অমল,
চায় সে তোমার নিবিড় পরশ গভীর তলে।

এস বধূ এস, তরুশাখা 'পরে পাখীরা ডাকে।
আর কেন দেরি এসো ত্বরা করি কলসী কাঁখে।
হয়ে এল হের দিবা অবসান
শুনাইবে তারা তোমা নব গান
কুলায়ে পশেনি তাই তারা, তব আশায় থাকে।

ডাকে রাঙা রবি, ঘাট-পথে আজ তোমা না হেরি,
অস্তে নামিতে অযথা তাহার হয় যে দেরি।
গোধূলি ধূলার আবিরে ভরিয়া
রেখেছে ও পথ রঙিন করিয়া
সে ধূলার ফাগ হবে অনুরাগ ও তনু ঘেরি।

ডাকে তব সই জলে রহি অই ডুবায়ে গলা,
কত কথা শোনা হয়নি, কত না হয়নি বলা।
ঘরে ঘটভরা থাকে যদি জল,
ঢালি শাকক্ষেতে এসো করি ছল,
ফিরিবার বেলা হেরিবে গগনে চন্দ্রকলা॥

প্রাণাচার্য

ডাক্তার ! ডাক্তার !
রন্ধ্রবিবর সবই জানো তুমি এই নর-দেহটার ।
হাজার হাজার পেশীতে পিশিতে যন্ত্রে যন্ত্রে যোগ ;
লাখ গ্রন্থির ঢিলা হলে কেহ, জনমে মৃত্যুরোগ ।
তোমার কি মনে হয়
মরণই জীবের স্বভাবধর্ম, বাঁচাটাই বিস্ময় ?
কত নগণ্য শক্তি তোমার নিয়তির তুলনায় !
তার সাথে তব সংগ্রামই ব্যবসায় ।
কর না কি অনুভব
সেই নিয়তির কৃপাই তোমার সম্বল-গৌরব ?

ডাক্তার ! ডাক্তার !
তোমার মনে কি হয়নাক বারবার
নিরাময় পূরা করিতে পার না, রোগেরে যাপ্য রাখো,
ভিতরের ক্ষত রয় রীতিমত, প্রলেপ দিয়া তা ঢাকো ?
সকল ব্যাধি তো জন্মে না দেহে, জনমে রোগীর মনে,
ষড়্‌রিপু যেথা আঘাত হানিছে রণে ।
রোগমূল তুমি করেছ কি সন্ধান ?
মূলে কি করেছ কুঠার আঘাত দান ?
তোমারো তো হয় ভুল,
সে ভুল তোমার চিত্তে হানে কি শূল ?
নিজেরে বোঝাও কিসে ?
দ্বিধা-সংশয়ে, হৃদয়াবেগেরে মারিতে পার কি পিষে ?

ডাক্তার! ডাক্তার!
নিশিদিন তুমি শুনিতেছ শুধু আর্তের হাহাকার।
স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা
আকুল কণ্ঠে মাগিছে তোমায় হতাশার মাঝে আশা।
এ ধরার জলবায়ু,
সহে না যাহার, ক্ষীণ পাণি মেলি সেও মাগিতেছে আয়ু।
মাতৃকণ্ঠে, প্রিয়ার কণ্ঠে কত রোদনের রোল,
শুনিতেছ তুমি ফিরিবার পথে 'বল হরি—হরি বোল',
তোমার হৃদয় করে না কি চঞ্চল?
কি বলি' সবারে সান্ত্বনা দাও? ঝরে ওই চোখে জল?

তোমার চিত্ত পীড়িছে নিত্য শত আর্তের ব্যথা,
তোমারি বন্ধু, কবি হইবার কথা।
আর্তবন্ধু, তোমারে এ দেশ বলিত যে কবিরাজ,
ব্যঙ্গ তা নয়, সেই মর্যাদা ব্যর্থ হবে কি আজ?
অশাশ্বত এ বিশ্বের জীব-জীবন-নশ্বরতা,
তোমার মতো ত' অন্য কাহারো বুঝিবার নয় কথা।
এ সত্য তব চিত্তে রহে কি জাগি?
বন্ধু তোমার হইবার কথা মায়াবাদী বৈরাগী।
তুমি জ্ঞানী, তুমি ব্যথায় আর্ত, জিজ্ঞাসু নিশ্চয়,
শুধু তো অর্থ তোমার কাম্য নয়;
গীতায় চক্রপাণির উক্তি পাবে না সার্থকতা?
তোমারি তো তাঁর ভক্ত হ'বার কথা।
নানা বিদ্যায় নিষ্ণাত তুমি, ব্রতভার শিরে বহ,
তুমি ত' নেহাৎ মুদ্দফরাস নহ।
তুমি যে বৈজ্ঞানিক,
এই জীবদেহ বিরাট ভুবন, ব্যাপার অলৌকিক।

লাখো লাখো কোষ, আর কোটি কোটি রক্ত-কণিকাদল
ঘোষণা করিছে বিস্ময়কর শৃঙ্খলা-কৌশল।
পেশীর পেষণে শতশত শিরা স্নায়ুতন্তুর খেলা,
ভাবি এরে জড়শক্তির লীলা, করিতে পার কি হেলা?
কর না কি অনুমান,
এর মূলে আছে চিৎশক্তির সক্রিয় অবধান?
জীবন্ত জীবকায়া
তার দর্পণে দেখনি বন্ধু পরমাত্মার ছায়া?
কোটি গ্রন্থির দেহের গ্রন্থ মহাগ্রন্থ যে তাঁর
তার মাঝে তুমি পাওনি বন্ধু গীতা বেদান্তসার?
পারমার্থিক পরা সাধনার পথে
তোমার সিদ্ধি লভিবার কথা প্রাণাচার্যের ব্রতে।
যমদূত সনে যুঝিছে পঞ্চভূত
তাহাদের মাঝে তুমি কি বন্ধু হবে না বিষ্ণুদূত?
ভক্ত মুরারি গুপ্তের মত, ডাক্তার! ডাক্তার!
চিকিৎসা তব করিবার কথা দেহ সহ আত্মার।

অতনুর প্রতি

হে অতনু, হে প্রেম সুন্দর,
তব করুণার 'পরে করি শুধু একান্ত নির্ভর
চলেছে ষোড়শী বালা রাঙা চেলি পরি'
মাতাপিতা ভাইবোন গৃহসুখ সব পরিহরি।
অজ্ঞাতচরিত্র এক পথিকের সাথে,
কম্প্র স্বিন্ন পাণি রাখি তার তপ্ত হাতে।
যাত্রাপথ কতদূর কোথা নাহি জানে
চলিয়াছে অনিশ্চয় নিরুদ্দেশ পানে।

চলিয়াছে যে সংসারে হয়ত তা সুদূর প্রবাস,
সেথা নিন্দা কটুকথা তাতাইবে হয়ত নিশ্বাস।
হেথা ছলছল চোখে ভাই বোনগুলি
তাহারে বলেছে, 'দিদি যেওনাক ভুলি'।
তাহাদের মুখ চুমি অশ্রুসনে অশ্রুর মিলনে,
- দলিত অন্তরে আর স্খলিত চরণে,
চলেছে ষোড়শী বালা, পড়শীরা শঙ্কিত দ্বিধায়।
হে অতনু, তুমিই সহায়।

একান্ত নির্ভর করি তোমার উপরে
আরেক ষোড়শী গেল একদিন সেবিতে শঙ্করে
অকাল বসন্তে হায় উপেক্ষিতা হ'ল সে শ্রীমতী,
তোমারও হইল বন্ধু চরম দুর্গতি।
সে কথা স্মরিতে হয় হৃদয় আকুল,
যা করেন ভোলানাথ তাই হয় ভুল,
করিলেন সংশোধন উমাঅঙ্কে হেরিয়া কুমারে
দোঁহারে চুম্বন করি স্নেহভরে জিয়ায়ে তোমারে,
এই বর দিলেন তোমায়
ভয় নাই তার আর যে তোমারে করিবে সহায়।
তারপর হ'তে ঘরে ঘরে
অসহায়া বালিকারা আর্তচিত্তে তোমারেই স্মরে।
কবিদের কাব্যগানে পঞ্চশর তাই তুমি 'স্মর'
পরগৃহবন্দিনীর একান্ত নির্ভর।
অনাত্মীয় উদাসীন অবাঞ্ছিত পরিবেষ মাঝে
তোমার অভয় পাণি ঘরে ঘরে রাজে।
হে অতনু, হে প্রেম সুন্দর,
নিতান্ত আপন হয় তোমারি কৃপায় যেবা পর।

ত্রিপথ

বাল্যে ছিল পথটি কাঁচা ধূলা কাদায় ভরা,
খাঁটি রাঢ়ের মাটি দিয়েই গড়া।
পল্লীমা-টির পরশ পেতাম সেথায় অনুক্ষণ,
সে পথ দিয়ে রাখাল যেত সঙ্গে ধেনুগণ।
ছিল সে পথ ভরা ছায়ায়, ঝরা পাতায় ঢাকা,
ধর্‌ত মাথায় সবুজ ছাতা তরুগুলির শাখা।
গোরুর গাড়ী আসত যেত উদাস গাড়োয়ান,
চাকার ধ্বনির তালে তালে গাইত বাউল গান।

যৌবনে পাই লাল সুরখির শহরতলীর পথ,
দুই পাশে তার জীর্ণ ইমারত।
পুকুর, বাগান, ভাঙা পাঁচিল, মসজিদ, মন্দির,
ঘোড়ার গাড়ী ছুটত তাতে উড়ায়ে আবির।
দেখতে পেলে রাজার সিপাই ঘোড়ায় চড়ে আসে
পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে যেতাম বাতিখুঁটির পাশে।
এ পথ আমায় নিয়ে যেত রাজকলেজের পানে,
লাল ডোরা তার বুকে আমার মধুর স্মৃতি আনে।

শেষে পেলাম শহুরে পথ কয়লা ক্বাথে গড়া,
ঘরের মেজের মতন পালিশ করা।
কিন্তু তাতে নইক আমি হাঁটার অধিকারী,—
ওপথ দিয়ে চলে শুধু ধনীর মোটর গাড়ী,
নই বড়লোক, এই পথেরই ধারেই তবু বাস,
সারা দুপুর পাঠায় ও-পথ বহ্নিজ্বালার শ্বাস।
ত্রিপথগা জীবনধারা অনেক ঘুরে ফিরে
এপথ বেয়েই শেষ হয়েছে ত্রিপথগার নীরে।

সংসারচিত্র

সঞ্জীব আমার বন্ধু মারাত্মক রোগে শয্যাগত,
প্রত্যহ দেখিতে তারে যাই বিধিমত।
সেদিন গেলাম আমি বৈকালবেলাতে
সুবিজ্ঞ ডাক্তার বন্ধু নিয়ে মোর সাথে।
ডাক্তার করিল যত্নে তন্ন তন্ন পরীক্ষা তাহার,
হৃৎপিণ্ড কহিল তারে মন্দ সমাচার।
মোটরে তুলিয়া দিতে আসিলাম নামি।
ডাক্তার জানাল মোরে ক্ষণকাল থামি,
'এই রোগ নয় সারিবার
খুব জোর এক পক্ষ আয়ু আছে আর।'

চাপি দীর্ঘশ্বাসে
ফিরিয়া এলাম আমি সঞ্জীবের পাশে।
সঞ্জীব বিশ্বাস করে—সারিতেছে রোগ
পক্ষ 'পরে কাজে তার পারিবে সে দিতে পুন যোগ
বিধাতার কৃপা এ ধারণা,
বেশি দিন আগে হতে সহিবে না মৃত্যুর যাতনা।
এদিকে বাড়িতে চলে হট্টগোল, হাস্যকোলাহল।
আসিয়াছে চারুবেশা বান্ধবীর দল,
কন্যা যাবে রম্ভা সিনেমাতে
তাহাদের সাথে।
পুত্র চলে পরি তার খেলোয়াড়ী সাজ,
আছে তার ফাইন্যাল ম্যাচ খেলা আজ।
করি রম্য বেশভূষা, লয়ে শিশুগণ
যাইতেছে বন্ধুজায়া—ধনিগৃহে আছে নিমন্ত্রণ।

একবার আমারে শুধালো—
'ডাক্তার নিশ্চয় আজ ব'লে গেল ভালো ?'

ঘন ঘন হর্ন বাজে, শুনিতে উত্তর
দেখিলাম—নেই অবসর।
বিধবা ভগিনী শুধু র'য়ে গেল ঘরে,
রোগীর সেবার ভার শুধু তারই 'পরে।
সেই তো রোগীর পাশে সারা রাত্রি যাপে।
ডাক্তার আসিলে ঘরে বেতসপত্রের মত কাঁপে।
লুকাইয়া মোছে চোখ, চাপে দীর্ঘশ্বাস,
অবিরত শিরে তার পাখা হাতে করিছে বাতাস।
সঞ্জীবেরই উপার্জন ইহাদের একান্ত সম্বল,
ইহাদেরই জন্য করি শ্রমজলপাত অবিরল,
কর্মক্ষেত্রে সহি নানা ক্লেশ
তাহার জীবনীশক্তি হয়েছে নিঃশেষ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলি আমি ভাবিলাম ভালে রাখি হাত,
মানুষে পশুতে আছে কি আর তফাত !
শুনেছি অনেক পশু যখন তাদেরে ব্যাধ খুঁজে,
ব্যাধেরে এড়াতে তারা নিজে চক্ষু বুজে।
গলায় জবার মাল্য, লভি সদ্য স্নানের কৌতুক,
যূপবদ্ধ ছাগ ভুঞ্জে বিল্বপত্রচর্বণের সুখ।
পশুদের মতো হায় মানুষেরও সার বর্তমান,
অতীত তো যুগান্তরে হয়ে যায় ম্লান।
এই তো সংসার !
যা কিছু উল্লাস হেথা ভবিষ্যতে করি অস্বীকার।

আধ্যাত্মিক কবিতা

বন্ধু বলিল আজ—
"বুড়ো হ'য়ে গেলে হয়নাক আজো লাজ,
তোমার লেখায় পাইনাক মোটে পারমার্থিক কিছু।"
শুনিয়া সে কথা করিলাম মাথা নীচু।
বসিলাম সন্ধ্যায়
ভক্তিমূলক কবিতা লিখিব করিয়া অভিপ্রায়।
ভোজনের ডাকে প্রিয়া আসিলেন, বলিলাম তাঁয় "রোসো,
পারমার্থিক কবিতা লিখছি চুপ ক'রে কাছে বোসো।"
প্রিয়া বলিলেন, "আমিও ত বলি তাই
বয়স ত হ'ল, ধর্মের কথা লেখায় কেন না পাই!"
বড় আশা ক'রে বসিলেন প্রিয়া কাছে,
গেলেন না চ'লে তাড়াতাড়ি, ব'লে 'হাতে বড় কাজ আছে'।
শুক্লপক্ষ, জানি না ঠিক কি তিথি,
আলোক ছায়ার আলিপনে হোথা ভরা অঙ্গন-বীথি,
বেলার সুবাস উড়ে উড়ে আসে পাশের বাগান থেকে,
ঘুরিছে জোনাকি, শত শত পাখী একসাথে যায় ডেকে।
মলয় সমীর নয় তত ধীর, উল্‌টায়ে দেয় পাতা,
প্রিয়ার অলক দুলায়, ভুলায়। এক হাতে চাপি খাতা,
স্মরিয়া আমার গুরু,
পারমার্থিক কবিতা করিনু সুরু।
হৃদয়াবেগের অভাব ত নেই, তাগিদও রয়েছে বেশ,
আধ ঘণ্টায় কবিতাটা প্রায় শেষ।
খাতা টেনে নিয়ে বলিলেন প্রিয়া—"দেখি!"
পড়া শেষ ক'রে ছুঁড়ে ফেলে খাতা কহিলেন—"হায়, একি!
তুমি পাষণ্ড, ছি-ছি লাজে মরি, লিখেছ আমারি স্তব,
তোমার কলমে আর কিছু লেখা কখনো কি সম্ভব?"

বলিলাম—"প্রিয়ে, কবিতার খাতাখানি!
এক বারে শেষ না হ'তে সহসা তাড়াতাড়ি নিলে টানি'!
দুইটি কথার বদল হইত, মাঝখানে দিলে বাধা,
'আমি'র বদলে হইবে কানাই, 'তুমি'র বদলে রাধা।"

কবির সন্ধান

কবিরে খুঁজিছ কোথা, এই দেহ মাঝে সে ত নাই,
মাঝে মাঝে আসে বটে—এ দেহ খেলার তার ঠাঁই,
গুঞ্জন শুনিবে বটে এই দেহে, কাব্য রচি যবে,
কুসুমের মত আমি মধুবিন্দু তাহারে যোগাই!

তোমাদেরি মনোলোকে ভূমিষ্ঠ হ'ল সে একদিন,
কবিরূপে,—জন্মস্থান নয় তার এ ধরা কঠিন।
তোমাদেরি প্রীতিরসে হয়েছে সে লালিত শৈশবে,
আজো সেই সেথা রহি' বাজাতেছে যৌবনের বীণ।

আমি কে? আমি ত শুধু চিরদিন সেবক তাহার,
মোর আহরণ যত তার শুধু মনের আহার।
মোরে কবি বলি' কেন বৃথা বন্ধু কর সম্ভাষণ,
তোমাদেরি চিত্তরসে নিত্য কবি করিছে বিহার।

আমারে ধরেছে জরা, নয়নের দীপ্তি আসে নিভে।
চিতা হতে চিতান্তরে কোথা তব কবিরে ঢুঁড়িবে,
রসিকের চিত্তে তার কোন দিন নাহিক মরণ,
চিত্ত হতে চিত্তান্তরে চিরদিন আনন্দে ঘুরিবে।

রেলপথে

ব্যাণ্ডেল হতে কাটোয়া চলেছি, তুই দিকে যত চাই
তুধারে ফুলের কাতারে কাতারে মিছিল দেখিতে পাই।
যত বুনো ফুল নানান রঙের তারা,
অবিচ্ছিন্ন ছুটেছে তাদের ধারা,
মানুষের কাছে অকেজো তুচ্ছ মাটির স্বেচ্ছাদান।
যারা সন্ধান রাখে তাহারাও করে নাক সম্মান।
বলিলাম মনে মনে,
ফুটিবার ঠাঁই আর জুটিল না হায় এই ত্রিভুবনে।
ভাবিলাম হেসে এরা যে স্মরায় মোর জীবনেরই কথা
এ-বনে জীবনে চলেছে একই প্রথা।
সারাটি জীবন চলিয়াছি আমি লোহা-পাথরের পথে,
এমনি ত্বরিত রথে।
জীবনের উপভোগ্য সকলি অবিরত অফুরান,
ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি মাতার দান,
বাণীর প্রসাদ অবাধ, অগাধ শোভাসুখ বসুধার,
ইহভুবনের গৃহজীবনের মাধুরীর সম্ভার,
এমনি ফুলের প্রবাহ হইয়া তুইধারে রয় ফুটে,
সব ফেলি আমি চলিয়াছি দ্রুত ছুটে।
কুসুমোৎসব করিবারে উপভোগ
হলোনাক শুভযোগ।
ফুলেদের নাই কোন কাজ তাই হেসে খেলে মাতোয়ারা-
আমার জীবনে নাই অবসর ক্লান্তির ঘুম ছাড়া।

সাপুড়িয়া

বিষধর সাপ তোমার ঝাঁপিতে পুঁজি,
হায়রে বন্ধু, এই দুনিয়ায় জীবিকা পেলে না খুঁজি ?
একচুলও ভুল হ'লে
জানো নাকি তুমি বিষ-দংশনে তখনই পড়িবে ঢ'লে ।
সাপুড়ে কখনো মরে না অনলে, রোগে বা বজ্রাঘাতে,
ভাত যে যোগায়ে রেখেছে বাঁচায়ে মরণও তাহারি দাঁতে
অনিবার্য এ পরিণাম আছে জানা,
তবুও বন্ধু দুধ কলা দিয়ে পুষিছ সাপের ছানা !
সারাদিন শোনো কুপিত তাপিত ভুজগের নিশ্বাস,
সরল চিত্তে কর মরণের গরলেরে বিশ্বাস ।
মৃত্যুরে নাহি ভয়,
যমদূত সাথে সহবাস কর, শুধু নয় পরিচয় ।
জীবন মরণ যেন দুটি ভাই শ্রীকৃষ্ণ বলরাম,
তোমার আগুনে খেলা করে তারা রচি নব ব্রজধাম ।
মৃত্যুর সাথে তুমিও করিছ খেলা
মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠের চেলা ।
আমি ভাবি, একি শুধু জীবিকার লাগি,
নাচাইছ নাগ-নাগী ?
মৃত্যুরে তব বশ্য করেছে তোমার দুঃসাহস
দেয় না কি তোমা বিজয়ানন্দ-রস ?
ভয়ের কাঁটায় জয়ের কুসুম সম
লাগে নাকি মনোরম ?
দুর্জয়ে তুমি অসীম শৌর্যে করিয়াছ পরাজয় ।
মহাবীর তুমি, পেয়েছ কি বরাভয় ?

রণজয়ী বীর লভে যেই মর্যাদা
অভিযাত্রীরা দুর্গম পথে লঙ্ঘিয়া শত বাধা
যেই গৌরব লভে অভিযানে, তার চেয়ে বেশি গণি
তোমার প্রাপ্য। তুমি কি পেয়েছ সাপের মাথার মণি?
তাহাও তুচ্ছ, ভাবিতে এ মনে জাগে মোর বিস্ময়,
তোমার পন্থা ক্ষুরধারসম নিশিত দুরত্যয়।
এ পথ ব্রহ্মবিদ্যালাভেরই পথ
সাধ যায় মোর তোমার চরণে করিতে দণ্ডবৎ।

ব্যবধান

রামধন তাঁতী গামছা বুনিয়া ফেরি করে দ্বার দ্বার
গামছার আছে আকছার দরকার।
হরিধন ভড় বোনে মিহি শাড়ী দেয় তায় জরিপাড়
শহরের সাথে চলে তার কারবার।
হরি ভড় যত বড় কারিগর হোক্‌
পাড়ার লোকের নয় আপনার লোক।

মদন কুমোর হাঁড়ি সরা গড়ে হাটে করে বিক্রয়
জন্মে তাহার সঙ্গে সবার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।
নরহরি পাল দেবীর প্রতিমা গড়ে,
তারে দরকার দু-চার জনার ঘরে।
প্রতিমা দেখিতে সারা গ্রামখানি জোটে
কে গড়িল তার খোঁজও লয় না মোটে।

কেনারাম মুচি বাজায় ঢোলক ঢাক,
প্রতি পার্বণ পরবেই পড়ে ডাক।

বাবুরাম দাস গড়েছে একটা রসানচৌকি দল
অধিগত তার সানাইবাঁশীতে সব সুরকৌশল।
সভ্য সমাজে তার সমাদর হয়
গাঁয়ের লোকের কাছে বাবুরাম মুচি ছাড়া কিছু নয়।

ক'রে থাকে বেচু লাউ ঝিঙে কচু আলু বেগুনের চাষ,
গাঁয়ের লোকের সব তরকারী দরকারী বারোমাস।
মধু মোড়লের বাগিচায় ফলে তরমুজ, পেঁপে, লিচু,
আনারস আর দাড়িম্ব কিছু কিছু।
গাঁয়ের হাটে ত বিকায় না মাল তার,
গঞ্জেরই সাথে চলে তার কারবার।
গাঁয়ে তার বাড়ীঘর
গাঁয়ের লোকের কাছে মধু তবু চিরদিন যেন পর।

জাতীয় জীবনে সব ক্ষেত্রেই এই ধারাটিই চলে
এ ভেদবুদ্ধি রুদ্ধ হবে না কোন আইনের বলে।
চটে কার্পেটে, বিড়ি সিগারেটে, কাস্তে ও তরোয়ালে,
মোড়ায় সোফায়, ডুলি চৌদলে, কাঁথা কাশ্মীরী শালে,
রঙ ও রসানে, পানি ও পানায় তফাৎ রয়েছে ভারি,
ইংরাজী ভাষা ভাগ করে খাসা 'নেসেসারি, লাক্‌সারি।'
চারুশিল্পীর, কারুশিল্পীর মত নয় নাম যশ
একের আদর করিবে হাজার অন্যের জনদশ।
সুধী জ্ঞানী গুণী শিল্পী করে না ক্ষোভ,
বস্তাপচা সে সস্তা লাভের প্রতি নাই তার লোভ।
বীণা ছেড়ে গুণী বাজাবে না ঢাক ঢোল
ধ্রুপদ খেয়াল ছেড়ে সে দেবে না কভু গোলে হরিবোল।

স্মৃতির মিছিল

মিছিল বাঁধিয়া চলিয়াছে স্মৃতিগুলি।
তুচ্ছ ঘটনা মনে পড়ে শুধু, বড়গুলি যাই ভুলি।
বড়গুলি যেন দাদা মহাশয়, হারায় মেলার ভিড়ে,
ছোটগুলি নাতি ঘাড়ে তাহাদের বাঁশী বাজাইয়া ফিরে।
মনে পড়ে মোর ভাইদ্বিতীয়ায় ঝি-এর হাতের ফোঁটা।
কুলীর কন্যা কাঁদে কুয়াপাড়ে কুয়ায় হারায়ে লোটা।
আজি মোর পড়ে মনে
ছুঁড়িয়া দিলাম দুইটি পয়সা কাটোয়া এষ্টেশনে
ভিখারী বালকে। ট্রেন ছেড়ে দিল পড়িল চাকার নীচে,
ট্রেন চলে গেল, সে কি খুঁজে পেল ? সে দান হ'ল কি মিছে ?
একটি বালিকা বলেছিল, 'বাবু পেয়েছে বড়ই খিদে'
কবে দাঁইহাটে খেয়াপারঘাটে, কাঁটা হয়ে মোরে বিঁধে—
টাকা সিকি ছিল দুয়ানিও ছিল, আনিও ছিল না ব'লে
ভিক্ষা দিই নি, ম্লানমুখে আহা কেঁদে গিয়েছিল চ'লে।
মাঠ পার হয়ে বৃদ্ধ খঞ্জ ভারী বোঝা নিয়ে ঘাড়ে
থেমে থেমে ঘেমে চলেছিল হাটে, মনে পড়ে আজ তারে।
বহুদিন পরে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে কাছারি-বারেন্দায়,
প্রণাম করিনু শূদ্রজাতির গুরুমশায়ের পায়।
অবাক হইল লোকে,
বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন তিনি অশ্রুতে ভরা চোখে।
বালক তখন, তুলে দিয়ে কাকা আমারে ইষ্টিমারে,
কাঁদিতেছিলেন দাঁড়ায়ে নদীর ধারে ;
বহুদূর হতে ঝাপসাই দেখা যায়,
দেখিলাম কাকা চাহিয়া আছেন ঘাটে দাঁড়াইয়া ঠায় !
পড়া হয় নাই, বেত্রহস্তে ছাত্রে করিনু তাড়া,
ছাত্র বলিল, পরশু রাত্রে ছোট ভাই গেছে মারা।

ছল ছল চোখ ম্লান মুখখানি তার
দেয় মোরে ধিক্কার।
একটি ছেলের ছিল বড় মনে সাধ
জন্মতিথিতে লিখে দিই তারে পদ্যে আশীর্বাদ,
বিমুখ করিনু, একমাস পরে শুনিনু সে নেই আর,
সেই কথা আজ মনে পড়ে বার বার।
সোনার বোতাম হারাইয়া গেল মোর,
তাড়াইয়া দিনু ভৃত্যে ভাবিয়া চোর,
তিন মাস পরে বিছানার তলে খুঁজিয়া পেলাম তায়।
আনন্দটুকু ভেসে গেল বেদনায়।
পাঁচ বছরের ছোট ছেলে মোর কঠিন দারুণ রোগে
একদা যখন চল্লিশ দিন ভোগে,
'ভাত খাব' ব'লে কেঁদেছিল মা'র কোলে,
মিথ্যা প্রবোধ দিয়েছিনু তারে—ভাত চ'ড়ে গেছে ব'লে।
দশ দিন পরে সেই ভাত হ'ল রাঁধা,
কানে বাজে মোর আজ তার সেই কাতর কণ্ঠে কাঁদা।
এমনি কতই ছোট ছোট স্মৃতিগুলি
ছোট দাণ্ডায় রঙিন ঝাণ্ডা তুলি',
মিছিল বাঁধিয়া মনে করে দরবার,
কেহ দেয় ব্যথা, কেহ দেয় ধিক্কার।
জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে ঘুমঘোরে ছিল এরা মোর মনে,
কোথায় নিভৃত আঁধার কোটর কোণে ;
দল বেঁধে করে তারা অভিযান আজ
'মোদেরে ভুলিলে চলিবে না' বলি' ভোলা মনে দেয় লাজ।

পল্লীসন্ধ্যা

স্বপন দেখে বসি তপন রাঙা পাটে
ফুরালো বেচা-কেনা গাঁয়ের ভাঙা হাটে,
বাথানে ফিরে ধেনু   বাজিছে সাথে বেণু
বাতাসে পথরেণু উড়িছে বাটে বাটে,
গাগরী ভরা শেষ দীঘির ঘাটে ঘাটে ॥
কলসী লয়ে কাঁখে ফিরিছে বধূ ঘরে,
চাউনি হ'তে তার মমতা-মধু ঝরে ।
কমল দল রুধি'   ঢুলিয়া পড়ে মুদি',
কুমুদী আঁখি মেলে তড়াগে থরে থরে ।
দেউটি ওঠে জ্ব'লে গাঁয়ের ঘরে ঘরে ॥
করিয়া সেঁচা শেষ কৃষাণ প্রান্তরে,
ধুইতে কাদামাটি পুকুরে স্নান করে ।
কৃষাণী চালাঘরে   অন্নে থালা ভরে ।
বাছুর ছাড়া পেয়ে অমৃত পান করে ।
বউলতলে বসি বাউল গান ধরে ॥
আহার ঠোঁটে পাখী তাহার নীড়ে ফিরে,
খাওয়াতে শাবকেরে জাগায় ধীরে ধীরে ।
মলিন কাঁথা পাতা   উঠানে বসে মাতা,
শিশুরা গায় গাথা তাহারে ঘিরে ঘিরে,
দুলায় চুলগুলি বাতাস ঝিরঝিরে ॥
বকম-কম কূজে কপোত অবিরল ।
নকল করে তাই শিশুরা অবিকল ।
দেউলে বাজে খোল,   খামারে বাজে ঢোল
'কবির গানে' মাতে সখের কবিদল,
ভাঙে দারু পিয়ে কণ্ঠে লভি বল ॥

ছাগল শিশুটিরে কে নাম ধরি ডাকে ?
তুলি সে লয় কোলে আদর করি তাকে।
শিয়াল আখ ঝাড়ে পহিলা ডাক ছাড়ে,
হাঁসেরা খোপে ফিরে ঘুমাতে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বিদায় দিবসের ঘোষিত শাঁখে শাঁখে ॥

গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপ

বড় এ-ঘরখানা কাহার ভাবি। দেখছি এঘরেই সবারি দাবি।
পথের পান্থ সে দণ্ড তরে, বৈঠে যায় এর পৈঠা 'পরে।
মায়ের পূজা হয় শরৎ এলে। গাঁয়ের নরনারী হেথায় মেলে।
সবাই অঞ্জলি হেথায় সঁপে। প্রবীণ প্রবীণারা মন্ত্র জপে।
হেথায় ভাগবত কথক পড়ে। শতেক লোকে এর বক্ষ ভরে।
গাঁয়ের পাঠশালা হেথায় বসে। ছেলেরা ঘুষে ঘুষে অঙ্ক কষে।
গাঁয়ের নাটশালা ইহাই সাঁজে, যাত্রামহরতে বেহালা বাজে।
কীর্তনিয়া দল এ গাঁয় এলে, এখানে বাসা লয় মাদুর মেলে।
দূরের বর যায় করতে বিয়ে বাজিয়ে ঢোলকাড়া এ গ্রাম দিয়ে,
এখানে হয় তার নান্দীমুখ। বইছে বসুধারা ইহার বুক।
সেবার পুড়ে গেল বাগ্দীপাড়া, পাইল ডেরা যত বাস্তুহারা।
বাউল দরবেশ মেলিয়া কাঁথা হেথায় বর্ষায় বাঁচায় মাথা।
পঞ্চমণ্ডল হেথায় মিলি, নালিশ শুনে করে সালিশ বিলি।
বিধান করে হেথা পঞ্চায়েৎ কারু-বা জরিমানা কারু-বা বেত।
কপোতকুল লভে কূজনসুখ। শূন্য নয় কভু ইহার বুক।
কাঠামো প্রতিমার যত্নে রাখে। দুয়ার নেই এর সবায় ডাকে।
এঘর এজমালি পথের ধারে, দেয় না আশ্রয় বল না কারে ?
চণ্ডামার কোলে সবারি ঠাঁই—চণ্ডীমণ্ডপ নাম যে তাই।

আষাঢ়ের কবি

চম্পাগন্ধে আমোদিত রবিকরোজ্জ্বল
বৈশাখের কবি মোর গুরুদেব। সঞ্চারি মঙ্গল
বৈশাখই তাঁহার সঙ্গী ফুলে ফলে ভরিয়া পসরা,
পথ তাঁর আলোছায়া আলিম্পনে ভরা।
পূর্ণকুম্ভ বৈশাখের কক্ষে শোভে, সে কুম্ভের জল
সারাপথ করিয়াছে ধূলিমুক্ত পবিত্র শীতল।
আমি আষাঢ়ের কবি। সারাটি জীবন
সে আষাঢ় ক'রে আছে আমারে বেষ্টন।
আষাঢ়ে দিয়াছি ভাষা। সেই ভাষা আর্তনাদবৎ
মুখরিত করিয়াছে জীবনের পথ।
মেঘস্তূপ-রন্ধ্রপথে মাঝে মাঝে রবিরশ্মি আসি
এ জীবন তুলেছে উদ্ভাসি'।
নবধারাপাতসিক্ত মৃত্তিকার গন্ধ সমীরণে
মাঝে মাঝে পাই মৃদু যূথীগন্ধ সনে।
আষাঢ় সারাটি পথ করেছে পিছল,
বাদল মাথার 'পরে নেচে নেচে বাজায় মাদল।
যে মেঘ করিল দৌত্য এ আষাঢ়ে বিরহী কবির
তারি মন্দ্র উদাত্ত গম্ভীর
আবিষ্ট করেছে মোর মন্দাক্রান্তা প্রাণপ্রবাহিনী,
ভালবাসি মেঘদূত, উদয়ন রাজার কাহিনী,
ভালবাসি ছায়াচ্ছন্ন মায়াচ্ছন্ন মেদুর ভারত।
ভালবাসি নীপগন্ধে ভরা অভিসারিকার পথ।
ভালবাসি ইন্দ্রচাপে বিষ্ণুর সে গোপবেশটিরে,
শঙ্করের রাশীভূত অট্টহাস্য হিমাদ্রির শিরে।

শ্মশানোৎসব

চৈত্রমাসে বর্ষে বর্ষে বঙ্গভূমে এসেছে মড়ক
তাহারই শ্মশানকৃত্য গাজন চড়ক।
ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল,
তাহারে ডুবায়ে দিতে বাজে ঢাক ঢোল।
বৎসরেরও মহাযাত্রা। সেও হয় শ্মশানের শব,
সে শবে ঘিরিয়া চলে বৎসরের অন্ত্যেষ্টি উৎসব।
মড়ার মাথায় যায় ভরিয়া শ্মশান,
চিতায় চিতায় জ্বলে বহ্নি লেলিহান।
শৃগাল কুকুর গৃধ্র চারিপাশে তুলে কলরোল,
তার সাথে আমাদের গাজনের বাজে ঢাকঢোল।
বৎসরান্তে শ্মশানের মহামহোৎসবে
আমরা প্রেতের সঙ্গে মহারঙ্গে মাতি যে তাণ্ডবে,
সন্ন্যাসীর বেশে মহাসন্ন্যাসীর সহ
মুণ্ডের কন্দুকক্রীড়া করি ভয়াবহ।
মোরা নীলকণ্ঠের পূজারী—
কণ্ঠে ধরিয়াছি বিষ পান করি করোটি উজাড়ি।
উড়াইয়া গেরুয়া-নিশান
সারা বছরের তপ্তশ্বাসে পূর্ণ করেছি বিষাণ।
মৃত্যুরে করিনি ভয় হরিয়াছি তার বিভীষিকা,
মেতেছি তাহার সাথে। শোক তা' ত মায়ামরীচিকা,
উৎসবে দেয়নি বাধা, কালবৈশাখীর
শুষ্ক পত্র সনে তারে উড়ায়েছে ঝঞ্ঝার সমীর।
খেয়েছি চড়কগাছে পিঠ ফুঁড়ি বেগে ঘুরপাক,
ডুবায়েছে আর্তনাদ পালখে মণ্ডিত যত ঢাক।

শ্মশান

শ্মশান তোমারে কত না আদরে গৃহ সংসারে বরণ করি ।
দিনে শতবার তোমাসনে দেখা, কোথা বিভীষিকা ? তোমা না ডরি ।
শুচিতারই তুমি সঞ্চার কর, তুমি যে অশুচি গিয়াছি ভুলি ।
দেবতাপূজারো অর্ঘ্যোপচার যোগায় তোমার কাঁথার ঝুলি ।
হরিকীর্তনে দিলে মৃদঙ্গ, বিষাণে ঘোষিছ বীরের জয়,
দূরিছ শঙ্খ-কঙ্কালমুখে মাভৈঃ নিনাদে দৈবভয় ।
কুঞ্চিত কেশে মোহনিয়া কর অভিনেত্রীর পলিত রূপ,
চামর-সমীরে দেবমন্দিরে বিলাও গন্ধ, জ্বালাও ধূপ,
কত না বিলাসবস্তু রচিল তব দান হয়ে সুচিক্কণ,
যোগীর আসন রচেছ অজিনে, রচেছ ভোগীর আস্তরণ ।
দুলাও শিশুর বুকে বাঘনখ, পরাও সতীর শ্রীকরে শাঁখা,
চিত্রশালার বিচিত্রতাও তোমার লোমশ ভুরুতে আঁকা ।
কীটের জীবন-তন্তুতে তুমি রচো কৌষেয় দুকূলখানি,
তাহার শোণিতে পেশল চরণ রাঙায় তোমার কুশলপাণি ।
গজদন্তের চারুপালঙ্কে রঙ্কুলোমজ শয্যা-সুখে—
রাজার দুলালী ঘুমায় অঘোরে, প্রাসাদে না তব স্নেহের বুকে ?
লক্ষ্মীর করে কড়ির ঝাঁপিটি পূর্ণ তোমার আশীর্বাদে ।
শ্যামের চূড়ায় ময়ূরপাখাটি তুমি গুঁজে দিলে মোহন ছাঁদে ।
বিলাসিনীদের কণ্ঠ জড়ায়ে ধরেছ প্রবাল-মুকুতাদামে—
তব কৌটার কস্তুরীরস জিয়ায় আবার দগ্ধ কামে ।
মাতা আমাদের অন্নপূর্ণা, পিতা যে মোদের শ্মশানচারী,
সংসার হতে পৃথক করিয়া কেমনে তোমারে ভাবিতে পারি ?
রুদ্র যেমন শিবরূপ ধরি মিলে এক দেহে গৌরীহর,
তোমার সঙ্গে সংসার মিলে তেমনি অর্ধনারীশ্বর ।

মুদ্দফরাস

নদীর শ্মশান-ঘাটে
কেহ আসে শুধু বাঁশে দোল খেয়ে, কেহ ফুলভরা খাটে।
মুদ্দফরাস পায় আশ্বাস, কি লভ্য হবে ভাবে,
কার কতটুকু পুড়িবে চিতায়, কি কি সে নিজেই পাবে।
হাহাকার করে জায়া, মাতা, পতি বুকে হানি করাঘাত,
তাহার হৃদয়ে হয়নাক রেখাপাত।
জন্ম মরণে জানে বিধাতার প্রতিদিনকার খেলা,
স্বার্থ বাঁচানো কাজে না করিয়া হেলা—
মুদ্দফরাস এরেই ধর্ম জানে।
চিতার অনলে সেক দেয় তার আঁতুড়ের সন্তানে।
চারিদিকে শুধু আর্তি দৈন্য, আধিব্যাধি, হতাহত,
তাই নিয়ে কারো পেশা বা জীবিকা, কারো ব্যবসা বা ব্রত।
করুণা, মমতা, ক্ষমার ক্ষমতা হরে ওরা নিশিদিন,
সবারি চিত্ত করিছে নিত্য কিণাঙ্ক-সুকঠিন।
সমরক্ষেত্রে মৃত সেনাদের সাথে যাহা কিছু রয়
জীবিতেরা তাই করি রাখে সঞ্চয়।
দানের সত্রে, ব্যাধিতাশ্রয়ে, শিবিরে ও সংসারে,
কারখানা-ঘরে, আতুরাশ্রমে, বন্দীর কারাগারে,
মুদ্দফরাসই আজি আদর্শ হৃদয়ের ব্যবহারে।
এ যুগে মানুষ তাই ত হরিতে পারে
ভিক্ষার চাল, শ্রমিকের রুজি, ক্ষুধিত মুখের গ্রাস,
ব্যাধিত মুখের ভেষজ-পথ্য, মৃতকল্পের শ্বাস।
যাহা কিছু থাকে অঙ্গে সঙ্গে গতাসু অঙ্গনার
করে ভাগাভাগি মুদ্দফরাসে প্রিয়জনে সবি তার।

ঘৃণা জুগুপ্সা লজ্জা মরণভয়
মুদ্দফরাস সকলি করেছে জয়।
শ্মশানেশ্বরে দেখেছ শ্মশানমাঝে?
মনে হয় যেন ওরি মাঝে চিতা-ভস্ম মেখে সে রাজে
রোগ শোক জরা মৃত্যু ছনিয়াময়,
হয় যোগী, নয় মুদ্দফরাস একটা হইতে হয়।

বিম্বফল

পল্লীবনের কোণে নগণ্য নিম্বতরুটি হেরি,
তাহারে ধন্য করেছে বন্য বিম্বলতাটি বেড়ি।
ছুলিছে তাহাতে অরুণবরণ পক্ক বিম্বভার,
নিম্ব কি বুঝে কি ধন অঙ্গে তার?
কত ব্রজগোপী, কত বৈদেহী, কত না বৈশালীর,
কত মালবী বা বৈদর্ভীর, কত না পাঞ্চালীর
বিম্বাধরের চুম্বনসুধারাশি
কত না অতীত প্রণয়মথিত হাসি
ঘনীভূত হয়ে বিম্বগুলিতে জাগে
উষার অরুণ রাগে!
দেখি হয় মোর মনে
বিম্বাধরারা খেলিতেছে যেন সেথা কোকনদ-বনে।
চঞ্চু আঘাত করে শুকপাখী মিটাতে কিসের ক্ষুধা?
ও কি বুঝিতেছে ওতে জমা আছে কত অধরের সুধা?
নব জন্ম কি লভি
শুকপাখী হয়ে এলো হোথা কোনো উজ্জয়িনীর কবি?

মাটি

ইটের পাঁজায় মোরা রই,
আমরা ইটের কীট, মাটির মানুষ আর নই।
মাটিতে পড়ে না পা যে মোরা দম্ভভরা,
ধরা আমাদের কাছে পোড়া-মাটি সরা।
পথে যবে হাঁটি
টার ম্যাকাডাম পাই পা'র তলে, পাইনাক মাটি।
ভুলে যাই মাটি ছাড়া জীবন না জাগে,
টবে গাছ পুতি তবু মাটি তায় লাগে।
মাটিতে হারায়ে মূল আমরা জীবন্ত নই আর।
আমরা হয়েছি যন্ত্র, কারখানা হয়েছে সংসার।
যে মাটি যোগায় খাদ্য করি শস্য ফলমূল দান,
তা যেন বাবুর্চিখানা, গৃহ হ'তে দূরে তার স্থান।
মাটির পরশ পাছে কোনখানে পাই
গোচর্মে দ্বিতীয় চর্ম-ব্যবধান রচিয়াছি তাই।
না পাইলে সে চর্মের বর্মযুগ দুর্বল দু'পায়
খাট হতে নামিবারও নাইক উপায়।
নানা যন্ত্রদানবের ঘাড়ে পিঠে চড়ি',
মৃচ্চরেরে তুচ্ছ গণি উচ্চশিরে বিচরণ করি।
আল্‌তায় রাঙা রেণু মা-লক্ষ্মীর কমল-চরণে
আর মিলিবে না শিরে যাত্রাপথে বিপত্তি-তরণে।
আজিও মাটিরই দান, ভুলে যাই, করি যে সম্ভোগ,
কবিতারও সাথে আজ নাই মাটি-মা-টির সংযোগ।
ভাবি তাই, শ্রীচরণকমলেষু শিরোনামা লিখে
শ্রীচরণপাদুকাসু লিখতে হ'বে কি জননীকে?

বসন্তের পাখী

বসন্ত ফুরায়ে যায় কি করি এখন ?
তাতিয়া মাতিয়া উঠে মলয় পবন।
মঞ্জরী পড়িছে গলি গুঞ্জরি ফিরে না অলি,
নাই বনে ফুলকলি, কে শোনে কূজন ?

জীবনে বসন্ত হায় ফিরিবে কি আর ?
কেমনে জীবন যাপি আশে আশে তার।
বসন্তের পাখী হেন আমারে করিলে কেন ?
চারণ করিলে কেন কুসুম-সভার ?

এর চেয়ে করিলে না কেন মোরে কাক,
সমান যাহার কাছে ফাগুন বৈশাখ ?
তোমারে স্মরণ ক'রে সবাই জাগিত ভোরে
সহসা ঘুমের ঘোরে শুনি মোর ডাক।

করিলে না কেন গৃহকপোত আমায় ?
বারো মাস কূজিতাম ঘরের সাণ্ডায়।
আমার মধুর গান মাতা'ত বধূর প্রাণ,
ঝরিয়া পড়িত ঘুম আমার ডানায়।

আমারে করিলে কেন বসন্তের পাখী ?
বসন্ত ক'দিন থাকে ? এ তোমার ফাঁকি।
আর যত ঋতু মোরে পর ভেবে যায় স'রে।
বসন্তই গেল যবে লও মোরে ডাকি।

শোক-সভা

শোক-সভা ? তারি তরে কবিতা লিখিতে হবে মোরে ?
কার জন্য এত শোক দল বেঁধে এত ঘটা ক'রে ?
জীবনেরে উপভোগ করেছে যে দীর্ঘকাল ধরি,
ধরিত্রীর সর্বভোগ্য হাস্যমুখে স্বর্ণপাত্র ভরি
আকণ্ঠ করেছে পান, আধিপত্য করেছে বিস্তার
সহস্রের প্রভু হ'য়ে, রেখে গেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
পুত্র-পৌত্রগণ লাগি, অনেকের জীবন-সম্বল
জুটায়েছে নিজ ঘরে, কত ছল কত যে কৌশল
কত যে চাতুরী-কলা তার লাগি করেছে আশ্রয়,
অনিষ্ট করার শক্তি ছিল বহু, করিয়াছে ভয়
তাই লোকে, তাহারেই শ্রদ্ধা বলি হইয়াছে ভুল,
একের সাধিল ইষ্ট বিঁধিয়া বহুর বক্ষে শূল।
কৃপা করিবার স্পর্ধা রাখিত যে সমগ্র ধরারে,
ধন-মান-পদ-গর্বে বিধাতার কথা অহঙ্কারে
ভুলেও ভাবেনি যেবা, শোক-সভা তারি লাগি হবে ?
কাহারা করিবে শোক ? যারা নিঃস্ব অকিঞ্চন ভবে,
লাঞ্ছিত বঞ্চিত যারা, জোটেনিক যাদের কপালে
এ বিশ্বের কোন ভোগ্য কোন তৃপ্তি হায় কোন কালে,
তারাই করিবে শোক ? ডাক দিলে ভৃত্যসম এসে
দাঁড়াইবে সভামঞ্চে কৃতাঞ্জলি অভিনেতৃবেশে ?
মোদের অনেক জ্বালা, বহু ক্লেশ, লাঞ্ছনা, বেদনা,
বাড়তি শোকের শক্তি অবশিষ্ট নাহি এক কণা।
সহস্র দুঃখের মাঝে সাধ ক'রে শোকের বিলাস
অভিনয় করিবার কোথা শক্তি, কোথা অবকাশ ?

দেহাত্মবাদ

মন্দিরই দেবতা হ'ল আজ
ভুলে যাই দেবতা যে তার মাঝে করিছে বিরাজ।
লক্ষ লক্ষ ভক্ত আসে মন্দিরে প্রণমি চলি যায়।
মুগ্ধ হয় বহিরঙ্গভরা চারু কারু-সুষমায়
ভিতরের পানে তারা ভুলেও না চায়।
দেশদেশান্তর হ'তে প্রত্নবিদ্ আসে,
যত্নভরে স্থান দেয় তারে ইতিহাসে,
বয়স নির্ণয় করে, তারা কেহ কেহ
মেপে জুখে তন্ন তন্ন দেখে তার দেহ।
রূপদক্ষ আসে শত শত
অনুসরি' শিল্পরীতি করে তারা নবসৃষ্টি কত।
প্রতিলিপি তার
গ্রন্থে গ্রন্থে পত্রে পত্রে ধরে রম্য মুদ্রিত আকার।
মন্দিরই দেবতা হ'ল আজ,
দেবতারে ভুলে গেছে আজিকার পূজারী সমাজ।

জীর্ণ দেবালয়—
চূড়ায় করেছে যার শিশু বট অশ্বত্থ আশ্রয়,
মূলগুলি ঝুলে পড়ে, ত্রিশূল জ্বলিছে তার শিরে,
ভক্ত হেরে তারই দেহে জটাধারী ত্রিশূল-পাণিরে
মন্দিরই গুরুত্ব পেয়ে নিজেই সাজিয়া ভগবান
দেবতার সাথে রচে ভক্তদের দূর ব্যবধান।
মন্দিরের চারিপাশে বসে যায় পণ্য হাট মেলা
আমোদ প্রমোদ খেলা দেবতারে করি অবহেলা।
বৃদ্ধ পূজারীর হাতে ত্রিপ্রহরে পেয়ে বিল্বদল,
মন্দিরের অন্ধকারে দেবতা ফেলিছে আঁখিজল।

মধু মুদি

বালক ছিলাম যবে থাকিতাম গ্রামে।
ছিল এক মুদি মধু সরকার নামে,
ছোট তার দোকানের ঘর।
আপনারে বলিত সে 'মধু সদাগর'।
সখের যাত্রার দলে সাজিত সে রাম, শিশুপাল,
শ্রীবৎস, অর্জুন, নল—কাঁধে ধনু, হাতে তরোয়াল।
তাহার বীরত্ব দেখি অভিনয়ে বিমুগ্ধ-বিভোর
হইত বিস্ময়ে চিত্ত বিস্ফারিত মোর।
এই মধু সরকারে দেখিয়াছি বসি খালি গায়
বেচিতেছে তেল নুন ধ'নে জিরে হলুদ ক্রেতায়।
তামাক কুটিয়া দা'এ চিটে গুড় দিয়া
মাখিতে দেখেছি তারে ছেঁড়া চটে দাওয়ায় বসিয়া।
তবু ভুলি নাই সে যে অসামান্য জন
গাঁয়ের সবার চেয়ে ছিল মোর শ্রদ্ধার ভাজন।
পরচুলা নাই শিরে, জরির জুতাও নাই পায়,
পাখীর পালখ গোঁজা তাজ তার নাইক মাথায়,
অঙ্গে রাজবেশ নাই, সঙ্গে তার নাই ধনুর্বাণ,
তাহাতে কি আসে যায়? শ্রদ্ধা মোর পেয়েছে সমান।
ফিরিয়াছি নিজ গাঁয় লেখাপড়া সারি—
সে মধুকে ভুলি নাই। গিয়া তার বাড়ী
দেখিয়াছি মধুর সে মূর্তি নাই, হইয়াছে বুড়ো,
শ্রদ্ধাভরে কাছে বসি বলিয়াছি,—"খুড়ো,

ভুলি নাই তোমার সে বীরবেশ-ধারী মূর্তিখানি,
কি আনন্দ দিতে তুমি না জানুক অন্যে, আমি জানি।"
তেজপাতা চিহ্ন দিয়া বুজাইয়া রামায়ণ তার
বলেছে সে—"তুলোনাক বাবাজী, সে সব কথা আর।
আমিই ত গড়িলাম সখের সে দল
গলাটা দরাজ ছিল, মনে স্ফূর্তি, গায়ে ছিল বল,
সখের সে দল নেই, থাকলেও ডাকত না কেউ
হনুমানও সাজবারে। এল গাঁয়ে থিয়েটারী ঢেউ।"
প্রথম গুণীর দেখা পাইলাম মধু সরকারে,
প্রথম রসজ্ঞ আমি হইলাম পাইয়া তাহারে।
ছোট গ্রাম, ছোট শিল্পী, আমি ছোট ছেলে,
অসঙ্গতি কিছু নেই, বর্ণে বর্ণে মেলে।
চৌষট্টি কলার ক্ষেত্র শতশত মধু সদাগরে
আজি আমি পূর্ণ দেখি, মধুচক্র যেন মধুকরে।
মরে নাই মোর মাঝে সেই শিশুমন—
বিস্ফারিত এবে শুধু, তাহাদেরে অসামান্য জন
জানি আমি। বনস্পতি তারা,
কেতাবী খেতাবী ধনী মদমত্ত পদমত্ত যারা
তাহারা এরণ্ডসম। কেহ তারা নয়ক আপন,
তাহাদের সাথে নাই হৃদয়ের যোগ বা বাঁধন।
মুদি মধু সরকারও অন্তরঙ্গ জন,
তাহাতেই সুরু মোর মুগ্ধতার অর্ঘ্য নিবেদন।
জীবনে প্রথম মোর রোমাঞ্চিয়া বিস্ময়-মোদন
মধুমাস-রসোৎসব মধু মুদি করিল বোধন।

কার্ত্তিক

উমার কুমার, তোমারে আমার নমস্কার,
হরগৌরীর প্রণয়ের তুমি দেবাবতার।
শিবেরে এড়ায়ে দেবতারা করে স্বর্গভোগ,
ভোগীদের সাথে যোগীশ্বরের রচিলে যোগ।
রুদ্রের রোষ-অনলে মদন নিধন লভে,
পুনঃ অনঙ্গ নবীন অঙ্গ লভিল কবে ?
অঙ্গই শুধু হইল দগ্ধ, সে ত অমর।
প্রতিশোধ নিতে জানিত চতুর পঞ্চশর।
পুরাণের ছেলেভুলানো কাহিনী আমি না মানি,
লভিল সে স্মর নব কলেবর তোমাতে জানি।
ত্রিভুবনে জিনি ভুবনেশ্বরে বিজয় করি,
উমার কোলে সে জনমিল নররূপটি ধরি।
ভবজিৎ ছাড়া দানবে জিনিবে কে আর ভাবি,
দেব-বাহিনীর সেনানীর পদে কাহার দাবি ?
চির তারুণ্য স্থির লাবণ্য হেরি তোমার,
চিনিতে নারিল তোমারে স্কন্দ, পুরাণকার ?
স্মরিয়া তোমার ভুবনবিজয়ী পরাক্রম
অসীম শৌর্য, গেল না তাহার মতিভ্রম ?
স্বর্গে ছিল না গজতুরগের অভাব কভু,
ময়ূর তোমার কেন বা বাহন হইল তবু ?
উমার কুমার, তোমারে আমার নমস্কার,
অনলদগ্ধ মদনেরই তুমি নবাবতার।

ফুলের দৌত্য

প্রতিবেশী বটে,
দেখাশুনা কথাবার্তা কখনো না ঘটে।
গায়ে গায়ে দুটি বাড়ী,—এত কাছে তবু কত পর,
আয়ের বৈষম্য রচে দুস্তর অন্তর।
কত ভাবে পাই নিত্য ব্যথা,
কভু ও-বাড়ীর কেহ কয়নিক দরদের কথা।
সেদিন গ্রীষ্মের রাতে খাই হাতপাখার বাতাস,
এলোমেলো কত ভাবি, করি বৃথা ঘুমের প্রয়াস,
তবু ঘুম নেই পোড়া চোখে।
পূবের জানালা দিয়ে ঝিরঝিরে বায়ু এসে ঢোকে।
হাস্নুহেনার গন্ধে তাহা ভরপূর
দরদে শীতল স্নিগ্ধ বড়ই মধুর।
ও-বাড়ীর আঙিনায় ফুটিয়াছে তারা রাশি রাশি
নিঃশব্দে পাঠায় গন্ধ মোরে ভালবাসি।
মানুষ যা করে নাই এত কাল, আজি অর্ধরাতে
মধুর সম্বন্ধখানি পাতাইল তারা মোর সাথে,
গোপনে হরিল তারা দুস্তর অন্তর,
তারপর হতে আর ও-বাড়ীরে ভাবিনাক পর।
কে আর মানুষ চায়? মানুষের কথা গেছি ভুলি,
তদবধি প্রতি রাতে পূবের জানালা রাখি খুলি।
ও-বাড়ীর সাথে চলে গন্ধে ছন্দে 'গুপুত পীরিতি',
বিদ্যাপতি গাহিয়াছে যার গুণগীতি।
মানুষের অহমিকা উপেক্ষার ভুল
শোধন করিয়া দেয় এমনি করিয়া বুঝি ফুল।

স্নেহের ঋণ

চলিয়াছি ট্রামে।
চড়কডাঙ্গার মোড়ে ট্রাম যবে থামে,
উঠিল গাড়ীতে বৃদ্ধ, হাতে নিয়ে ছাতি,
সঙ্গে দশ বছরের প্যাণ্ট-পরা নাতি।
কোথাও নাইক ঠাঁই। ছাত্র এক উঠিল দাঁড়ায়ে
বৃদ্ধে দেখি। নাতিরে বসায়ে সেই ঠাঁয়ে
বৃদ্ধ কিন্তু সারা পথ টলিতে টলিতে
দাঁড়াইয়া দাণ্ডা ধরি লাগিল চলিতে।

*　　　*　　　*

ব'সে ব'সে আমি ভাবিলাম,
বুঝিল কি অই নাতি দাদুর স্নেহের কোন দাম ?
সারা দিন ছুটাছুটি ক'রে যেবা খেলে
দাঁড়ায়ে সে কিছুক্ষণ যাইতে পারিত অবহেলে।
বুদ্ধি তার নয় পরিণত,
তারে অপরাধী করা হবে না সঙ্গত।

এই নাতি হবে যুবা একদিন সবল সুঠাম,
তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুশিক্ষিত, তখনই কি এ স্নেহের দাম
বুঝিবে সে ? শত শত হেন তুচ্ছ স্নেহ-নিদর্শন,
আজন্ম লভিল যাহা, করিবে কি কোনোটি স্মরণ ?
দেখিবে সে খতাইয়া দাদামহাশয়
কি রাখিল ব্যাঙ্কে, তার কি থাকিল বিষয়-আশয়।

তার চেয়ে শতগুণে যাহা মূল্যবান্
অজস্র অমৃতধারা বাৎসল্যের করালো যা' পান

নিজে রহি উপবাসী, স্মরিবে কি তাহা কোন দিন?
করিবে কি গণ্য কভু স্নেহের এ ঋণ?
বিষয়-আশয় টাকা কিছু না মিলিলে,
নাড়ীর বাঁধন তাও হয়ে যাবে ঢিলে।
তালের মতন যাহা টিপ ক'রে ভূমিতে না পড়ে
জীবনে অর্বুদসম জাগে না যা—তারে কেবা স্মরে?

ঘড়ি

দেওয়ালের ঘড়ি!
পেণ্ডুলাম চলে তব নিশিদিন টকটক করি।
প্রতিদিন ঠিক ভোর হ'লে
জাগাও ঘুমন্তে তুমি—ওঠ ওঠ ব'লে।
আফিসে বিলম্ব হয় পাছে,
বলো,—'তৈরী হও সবে যাবার সময় হইয়াছে।'
হবে যেতে ট্রেনে দূর দেশে—
বলো, 'ত্বরা যাত্রা কর ট্রেন ফেল করিবে কি শেষে?'
সম্মুখে তোমার রাতে রোগী রয় পড়ি,
ওষুধ খাওয়াতে হবে সেবিকারে ডেকে বলো, ঘড়ি।

এত তব জ্ঞান ঘড়ি, অত তুমি রাখিছ হিসাব,
নাই তব অবহিত বুদ্ধির অভাব।
এত তুমি সচেতন, সব কাজে দিতেছ নির্দেশ,
ভ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, ক্লেশে তুমি গণনাক ক্লেশ,
নিয়ন্ত্রণ করিতেছ সবার জীবন,
জীবন্ত তোমার চেয়ে কে আছে এমন?

কেবল হৃদয় নাই, নিয়মিত মোদেরি মতন
যদিও চলিছে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।
তোমারি সম্মুখে শুয়ে রোগী যবে মরে
আয়ু তার ব'লে দাও দণ্ডপলে অক্ষরে অক্ষরে।
হে নির্দয়, হায় তব নাইক হৃদয়—
কারো ব্যথা লয়ে তুমি করো না কালের অপচয়।
তোমারি গৃহের পরিজন
মরে যবে, ঘিরে তারে কাঁদে মাতা প্রিয়া পুত্রগণ,
তখনো দোলক-নৃত্য থামেনাক পলকেরও তরে,
করুণা কি মমতার ভরে।
একটিও দীর্ঘশ্বাস পড়ে না তোমার,
হয় না কাচের পরে এক বিন্দু নীহার সঞ্চার।
শুধু বলো ডেকে—
শ্মশানে লইয়া যাও, কি হইবে জড় দেহ রেখে।
প্রকৃতির সৃষ্ট নও, মানুষেরই সৃষ্ট তুমি, ঘড়ি।
মানব-হৃদয়ধর্ম দিতে সে পারে নি তোমা গড়ি।
মানুষের স্বাধীনতা হ'রে নিলে, এই হ'ল ফল,
মানুষ নিজের হাতে বানাইল পায়ের শিকল।
কলের মালিক বোঝে শুধু কাজ, বোঝে না হৃদয়,
কল তুমি, তোমাতেও সে ধারার হয় না ব্যত্যয়।
মনে হয় নিয়তির সৃষ্ট তোমা বলি,
পাওনি হৃদয় শুধু, পেয়েছ সকলি।
হৃদয়ের বিনিময় চলে যবে, তোমার ধমক
ভাবাবেশ-মুগ্ধদের ভাঙায় চমক।
তোমার নিজের ধর্ম শিখাতেছ রহি উদাসীন,
মানুষে হৃদয়হীন ঘরে ঘরে করি দিন দিন।

কীর্তন

মধুমতী-বক্ষে আমি চলিয়াছি আরোহি তরণী।
সন্ধ্যাকাল। ঘন ঘন শুনি শঙ্খনাদে আমন্ত্রণী
নীলাকাশে অকস্মাৎ জাগে কোটি তারা।
বায়ু বয় ঝিরি ঝিরি ধূলিধূমহারা।।
কূলে কূলে ভরা নদী গদ্‌গদ ছল ছল জলে
নৌকাখানি বৈঠা ভরে চলে।
দূর লোকালয় হ'তে শ্রীমন্দিরে আরতির পরে
মৃদঙ্গপ্রহত ধ্বনি কীর্তনের উঠিল অম্বরে,
বৈঠার তালে তালে মিশি জল-কলনাদ সনে
সেই ধ্বনি মধুবর্ষ করিল শ্রবণে।
দিগন্তে তরুর শ্রেণী জোনাকি-আলোকে বুঝিলাম।
কীর্তনের ধ্বনি বলে—অন্তরালে আছে ছোট গ্রাম।
কণ্ঠহারা গীত যেন এ মর্তের আর্ত নিবেদন,
কী মধুরই লেগেছিল, স্মৃতি তার শুচি করে মন।
তখন তরুণ আমি, আজ আমি জরায় অবল,
শিরে কেশ হয়েছে ধবল।
আজিকে নিকটে চলে নগরের উদ্দণ্ড কীর্তন
মত্ত গজসম করে প্রমথিত শ্রুতি-পদ্মবন।
এমনি পাষণ্ড আমি, তাহাতে হয় না ভাবাবেশ,
জাগে না এ প্রাণে ভক্তিলেশ।
গর্জনও সঙ্গীত হয় যে দূরত্বে তাই আজি খুঁজি,
পরিবেষ-মূল্য আর ব্যবধান কাম্য কেন বুঝি।
হায়, আমি আজো রোমান্টিক,
হইতে পারিনি আজো আধ্যাত্মিক অথবা সাত্ত্বিক

প্রভাতের স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখিনু,—পার হয়ে খেয়াঘাটে
পশরা বহিয়া আসিলাম বড় হাটে।
কপালে কপোলে দর দর ঝরে ঘাম,
সেথা বটতলে পশরাটি বিছালাম।
কেহ ত না ফিরে চায়,
মিনতি করিয়া ডাকিলাম ক'জনায়,
করি নাড়াচাড়া কহিল তাহারা—'এসব ঠুনকো, বাজে।
এই সব চীজ লাগবে না কোন কাজে।
সখের জিনিস সৌখিনদের ঘর সাজাবার তরে
এসবের ঠাঁই নাই আমাদের ঘরে।
আনো যদি গোল আলু কি পটোল, হাতা, বেড়ি, ঝাঁটা, হাঁড়ি,
তামাক, তেঁতুল, হলুদ, সুপারি—তা'হলে কিনতে পারি।'

'আধা দামে দেব, সিকি দামে দেব, বিনা দামে দেব, নাও।'
বলিলাম কত, কেউ শুনিল না তাও।
ভাবিতে লাগিনু ব'সে ব'সে ভাঙা হাটে
আবার ওগুলো বয়ে নিতে হবে সেই দূর পার ঘাটে।
ধবল-শ্মশ্রু একটি বৃদ্ধ মাথায় বুলায়ে হাত,
দরদী কণ্ঠে বলিলেন—'বাছা, কোরো না অশ্রুপাত।
স্বপনপশারী, এসব তোমার হাটের পণ্য নয়,
নিজের ঘরেই সাজায়ে রাখিতে হয়।
যার প্রয়োজন খোঁজ ক'রে ক'রে সেই যাবে তব দ্বারে,
বাড়ীতে ব'সেই পাবে একদিন তারে,
কেউ আসে ভালো, না-ই আসে তাও ভালো।
করিবে এগুলি জীবন তোমার ভবন তোমার আলো॥

হয়ত আসিবে একদিন দলে দলে,
তখন পশারী, রহিবে না ধরাতলে।
অন্য পণ্যে ভরাও পশরা উদরান্নের তরে,
নির্ভর আর কোরো না ইহার পরে।'
পদধূলি নিয়ে শুধানু—'আপনি কে বলুন, কোথা ধাম ?'
বলিলেন তিনি—চেন'ত আমারে, প্রতিদিনই কর নাম।'
চোখে জল মুছি মুখ পানে চেয়ে দেখি,
সামনে স্বয়ং মোরি গুরুদেব একি !
প্রণাম করিয়া মাথা তুলি দেখি হয়েছেন অগোচর।
ভেঙে গেল ঘুম, বাতায়নপথে দেখি পশে রবি-কর।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়

নগরে আমার কর্ণ পায় না বিশ্রাম ;
পথে ছুটে কত যান—ফায়ার ব্রিগেড, ট্রাক, ট্রাম।
শিঙা বাজাইয়া ধায় লরি, বাস, হাজার মোটর।
তারল্য লালিত্য নাই ইট কাঠে, সকলি কঠোর।
সর্ব বর্ণ দেখি এক শ্যামলতা ছাড়া।
ছুটে লক্ষ লক্ষ লোক পেয়ে যেন মহিষের তাড়া।
চিম্নিতে উঠিছে ধূম, পণ্যভরা দোকান হাজার,
সমগ্র শহরে যেন গ্রাসিয়াছে রাক্ষুসে বাজার।
দ্বন্দ্বে দ্বেষে রণক্ষেত্র বলি হয় ভ্রম,
হেথা মানুষের দেখি দুর্মতির দুর্গতি চরম।

এই পরিমণ্ডলের গণ্ডীপারে সেবি' মুক্ত বায়ু
শান্ত হয় উদ্বেজিত স্নায়ু।
দেখি সেথা চাষী চষে, বীজ বোনে, জেলে ফেলে জাল,
তাঁতী সেথা তাঁত বোনে, মাঝি ধরে হাল।
হাতে তারা কাজ করে সাথে তার মুখে গান গায় ;
মাতে তারা পর্বদিনে, রাতে তারা বাতি না জ্বালায়।
মাঠে গোঠে গোরু চরে, ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ফসল,
মা'র কোলে শিশুসম শাখা হ'তে ঝুলে পাকা ফল।
কলসী খেজুরগাছে, তালগাছে বাবু'য়ের বাসা ;
শুনি সেথা মক্ষীদের পক্ষীদের কল কণ্ঠে ভাষা।
চাল ফুঁড়ে উঠে ধূম, কবরী এলায় তায় ধরা।
কাল নয় ঘড়িধরা, নাই পথে হট্টগোল ত্বরা।
শ্রমিকের মত যেন কারখানা হতে মুক্তি পেয়ে
এখানে আমার চিত্ত উঠে গান গেয়ে।
যেন সে বিদেশ থেকে, মনে হয়, ফিরিল ভারতে,
কারাগার থেকে যেন মুক্ত হয়ে এলো রাজপথে।
গঞ্জ থেকে কুঞ্জে যেন, খাঁচা থেকে যুঁইএর মাচায়,
গদ্য হতে পদ্যে এসে ফিরিতে না চায়।
ঝি'র কোল থেকে যেন মা'র কোলে বাড়ায় সে হাত—
এই-ত স্বদেশ মোর, নগর-ত নকল বিলাত।
এরি পাঠশালে মোর বিদ্যা হ'ল সুরু
এরই গান গাহিবার দীক্ষা মোরে দিল কবিগুরু।
এরি ভাষা শিখালেন পিতা-পিতামহ—
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে জানি ভয়াবহ।

গানের বিদায়

অবসর গান শুনিবার
অফুরন্ত নয় কারো। কার নাই গৃহের সংসার ?
ক্ষুধাতৃষ্ণা, তারো আছে দাবি,
ধৈর্যেরও তো সীমা আছে। হাতের কাজের কথা ভাবি'
একে একে শ্রোতা ভাগে। গানের আসর ভেঙে যায়,
এপারে গানের পালা হ'ল মোর সায়।
কেউ আর দেয়নাক সাড়া
আমারে চায় নি কেহ, গানই মোর চেয়েছিল তারা।
চেয়ে দেখি ফেলি দীর্ঘশ্বাস
আরক্ত হইয়া গেছে পশ্চিম আকাশ,
চলি খেয়াঘাট-পথ ধরি
গোধন ফিরিছে গৃহে, সন্ধ্যাতারা জাগে শির'পরি।
বাধা পাই, হয় তাই দেরি,
মন্দিরে বাজিছে শুনি শঙ্খ, ঘণ্টা ভেরী।
ওপারে আমার গৃহ, মহামৌন যেখানে বিরাজে—
গানের কথাই নাই, হৃৎস্পন্দন তাও তো না বাজে।
বীণা সেথা মূক হয়ে রবে,
বৃথা এই বীণা কেন বয়ে মরি তবে।
জীবনে পারের কড়ি করি নি যোগাড়,
শুধুই গেয়েছি গান পাইনিক কোন পুরস্কার।
খেয়াঘাটে দেব যবে পাড়ি
চাইবে পারের কড়ি খেয়ার কাণ্ডারী,
বীণাখানি নিয়ে যাই সাথে,
দিব তার হাতে।

বাদল শেষে

দিন পাঁচ অকারণ বর্ষণের পর
হঠাৎ উঠেছে রোদ বড় মিঠা সোনালী সুন্দর।
রোদটুকু মেখে নিতে গায়
কেহ ছাতে, কেহ হাটে, কেহ পথে, কেহ মাঠে ধায়
কোন্ জ্যোতিষ্কের শোকে জানি না গগন
ছিল শোকবিলাপে মগন !
'পাখী সব করে রব', উঁকি দিয়ে কুলায়ে কুলায়ে
সত্যই ফিরেছে রোদ, দেখে নিল ঠোঁটটি বাড়ায়ে।
চমকিয়ে জেগে ওঠে খুলে চোখ লাল,
সজোরে গা-ঝাড়া দিয়ে ছুটে যায় কুকুরবিড়াল।
ফেরিওলা ছিল বন্দী আপন কুটীরে
চিবিয়ে শুক্‌না চানা চিঁড়ে,
ক্ষুধায় শাণিত স্বরে ধ্বনিত সে করে সারাপথ।
তন্দ্রিত পুরীর চোখে এই রোদ সুখস্বপ্নবৎ।
ভিখারী এ কয় দিন ভুলে ছিল তার বাঁধা বুলি,
বাহির হয়েছে পুন নিয়ে তার ঝুলি।
ভিজা চিঠি নিয়ে দ্বারে দেখা দিল ডাকের পিয়ন।
ছাদে উড়ে সারিসারি বাড়ী-বাড়ী শাড়ীর কেতন।
পাঁচ দিন একটানা রাত
বেলা তিনটায় আজ হ'ল কি প্রভাত ?
পীতপদ্মমধুসম এই রোদ বড় মিঠা লাগে।
মনে মোর যৌবনের সুখস্মৃতি জাগে,
দিনভ'র প্রিয়া মোর অভিমানে আঁখিজলে ভেসে
সহসা সে ফেলে যেন হেসে।

অভিনন্দিত

তোমরা কারা এ অভিনন্দনে গাও আজ মোর জয়,
তোমাদের সাথে নেইত আমার হৃদয়ের পরিচয়!
কই সে আর্য ঋত্বিকগণ,—দেখি না সন্নিকটে,
হোমভস্মের টিকা কে পরাবে প্রণত ললাটতটে?
শাঁখ কে বাজাবে? বিশালার বিশালাক্ষী বধূরা কই?
চন্দনমাখা শেফালির সাথে ছড়াবে বা কারা খই?
কোথা চীবরিণী স্থবিরা শ্রমণী, মহাথেরী, ভিক্ষুণী?
বুদ্ধের জয়মঙ্গলগাথা কাদের শ্রীমুখে শুনি?
কোথা পরিচিতা আভীর-বনিতা, ব্রজের রাখালগণ?
গাঁথি কদম্বমাল্য গ্রীবায় কে করে সমর্পণ?
কোথা তারা ঘাটে গাগরী ভরণে দিবাশেষে যায় যারা?
চূতশাখা দিয়ে পূর্ণ কলস হেথায় সাজাবে কারা?
কোথা তারা যারা তুলসীতলায় সাঁঝদীপখানি জ্বালে?
সে দীপের তাপ কমল-পাণিতে কারা বা ছোঁয়াবে ভালে?
কোথা বালিকারা শিউলি-তলায় খেলাপাতি যারা পাতে?
ভ'রে অঞ্জলি এনে চাঁপা-কলি কারা দেবে মোর হাতে?
ষষ্ঠীতলার জননীরা কই, আননি তাদের ডেকে?
ধান-দূর্বার আশিস কে দেবে নিছনির ডালি থেকে?
কোথা সে কৃষাণী? সে যদি না আসে র'য়ে যাবে তবে ত্রুটি,
পাকা ধানশীষে বেঁধে কে আনবে কাঁচা যবশীষ দুটি?
কোথায় বাল্যখেলার সাথীরা? তারা ত আসেনি ছুটে।
কারা বনফুল বৈঁচি আনবে বটের পর্ণপুটে?
সব চেয়ে মনে পড়ে কুড়ানীরে,—দেখা কেন নেই তার?
ভাদরে কুড়ানো পাকা তাল দেবে সাদরে কে উপহার?

মাধ্যাকর্ষণ

পাখী উড়ে যায় আকাশে ঊর্ধ্বে,—শাখীও উড়তে চায়,
মাটি টেনে রাখে, মর্মর রবে করে তাই হায় হায়।
জল উড়ে যায় উপরে বাষ্পাকারে,
তপন শুধুই হাতসানি দেয় তারে।
ওঠে অম্বরে বহ্নির শিখা ধূমময় রূপ ধ'রে—
অথবা খধূপে স্ফোরকের রূপে। মানুষ বিমানে চ'ড়ে
যত দূর পারে মেঘের ওপারে ধায়।
ঝরা পাতা সেও ধরা ছেড়ে ওঠে বৈশাখী ঝঞ্ঝায়।
এই উত্থানে 'উঠা' তো বলা না চলে,
সকলেই নেমে আসে পুন ধরাতলে।
অনিবার্য যে ধরণী মাতার টান,
পতনেরই তরে সকল সমুত্থান।
মানুষ তো ম'রে যায়,
জ্ঞানিগণ বলে, আত্মাটি তার ঊর্ধ্বের পানে ধায়।
হারায় তারে যে সে কোন আশায় আকাশেরই দিকে চায়?
তারায় তারায় বৃথা খুঁজে তায় আর করে হায় হায়।
আত্মা যদিই থাকে, আর যদি হয় পার্থিব ধন,
কেমনে এড়াবে এই ধরণীর নাড়ীর আকর্ষণ?

নিঃস্ব ভগবান

সব ঠাঁই ছেড়ে প্রভু করেছ শ্মশান সার।
সব ভূষা পায়ে ঠেলে পরেছ হাড়ের হার।
ঈশান, বিষাণ-রবে ঘর থেকে ডাক' সবে।
যে বিষয়ী ভজে তোমা হরেছ যে তার ভার॥

সবি তো ছাড়লে, আছে অধিকার কিসে প্রভু ?
জল ছাড়া কে কী পাবে তব জটা পিষে কভু ?
কী তোমার কাছে খুঁজি ? কী তোমার আছে পুঁজি ?
মূঢ় চায় ধনমান তব শুভাশিসে তবু।

লোকে হায় তাই চায় ছাড়লে যা হেলাভরে,
মায়ার পুতলি মাগে সংসার-খেলাঘরে।
ঐহিক অনুরাগে দৈহিক সুখ মাগে,
তারা ভাবে সবি যাবে ভবনদী-ভেলা 'পরে।

বিভূতি তোমার পুঁজি, চায় তারা চন্দন,
মুকতি না চেয়ে যাচে নব নব বন্ধন।
তুমি তো যা পার দিতে ক'জন তা পারে নিতে ?
চরম পরম তা যে ভব-ভয়-খণ্ডন ॥

অমৃত ক্ষণ

প্রথম যখন রাখলে তুমি আমার হাতে স্বিন্ন পাণি,
রৈল তাতে চিরাঙ্কিত সেই পাণিটির চিহ্নখানি।
হৃদ্‌গগনে জাগছে সে 'ক্ষণ' হয়ে আজো সন্ধ্যাতারা।
কত বছর মাস হারালো, সে ক্ষণ জাগে তন্দ্রাহারা।
প্রথম বোধন করল সে ক্ষণ ভাবাবেশের তন্ময়তা,
আজো নানান ছন্দে আমি গাইছি তারই জন্মকথা।
নূতন কিছু নেই পরশে জীর্ণ তনু-চিত্ত তব,
স্মৃতিতে সেই পাণির পরশ-মাণিক জাগে নিত্য নব।

উত্তরাধিকার

লোচনদাস ঘর ছাড়ার আগে যান নি রেখে জমিনদারি,
কৃষ্ণদাসও ঝামটপুরে যান নি রেখে গোলা বাড়ী।
গোবিন্দদাস যান নি রেখে চায়ের বাগান কি কারখানা,
দাশরথি কাশীরামও যান নি রেখে সোনা-দানা।
নরহরি যান নি রেখে ডিসের-গড়ে কয়লাখনি,
প্রেমধনের ধনী এঁরা, ন'ন ত' হেমধনের ধনী।
ছিল না যখ ষ্টক-শেয়ারে, ব্যাঙ্কে টাকা কাঁড়ি কাঁড়ি।
বিত্ত কী আর রেখে যাবে এঁদের উত্তরাধিকারী ?
এঁদের পুঁথির পাতায় পাতায় পেয়েছি যে চিন্তামণি,
তাই রেখে যাই নতুন ছাঁদে, জানি এ ধন চিরন্তনই।

চীনে করবী

চীনে করবীর ফুল।
তোরে দেখি মোর মাঝে মাঝে হয় ভুল।
কষিত কনক করি সমাহার
বিরচিল তোরে কোন মণিকার ?
কপোলের পরে কানন-রমার তুই কি সোনার দুল ?
তোরে দেখি মোর মাঝে মাঝে হয় ভুল।
পানের চষক শিল্পীর গড়া
তুই কি গগনে পীতমধুভরা
দেব উদ্দেশে নিবেদিত মধুপর্কের সমতুল ?
তোরে দেখি মোর মাঝে মাঝে হয় ভুল।
শ্যামার দেউলে রবির কিরণ
দীপরূপ বুঝি করিলি ধারণ।
আরতি করিয়া ঘুরিতেছে হেরি তাই কি শলভকুল ?

সূর্যের সন্তান

বাঙলার চাষী এরা, চারপাশে দশখানি গ্রাম
তা নিয়ে এদের ধরাধাম।
পৃথিবী যে কত বড় এদের হয় না অনুমান,
ভাঙ্গাগড়া চলে তায় এরা তার রাখে না সন্ধান।
হাট বসে গ্রাম-সীমানায়
সেথা গেলে পঞ্চগ্রামী পরিচয় পায়!
মেলা বসে নিত্যানন্দপুরে
চারি ক্রোশ দূরে।
সেথা গিয়ে হয় শুধু হুঁশ
অবাক বিস্ময়ে ভাবে, এ মুলুকে এতই মানুষ!
চারপাশে এর বেশি নেই আর জানার প্রয়াস,
ঊর্ধ্বলোকে খোলা শুধু অবারিত অনন্ত আকাশ।
সৌর এরা, এরা সব সূর্যের নন্দন,
তপনই এদের তাই একান্ত আপন।
তপনই এদেরে প্রাতে করস্পর্শে ডাক দিয়ে তোলে,
তারেই প্রণাম ক'রে মাঠে যায় চ'লে।
দিবা যবে আড়াই প্রহর,
সূর্য-পানে চেয়ে চেয়ে ভাবে এরা, যেতে হবে ঘর।
স্নান করি' সূর্যে নমি' গৃহে ফিরে আসে,
বলদে বিশ্রাম দেয়, তৃপ্ত হয় নিজেরা গোগ্রাসে।
সূর্য যবে ঢ'লে পড়ে পশ্চিমের অশ্বত্থের শিরে,
কোদাল বা কাস্তে হাতে মাঠে যায় ফিরে,
ঝিকিমিকি বেলা,
যখন পড়ন্ত রোদে পাখীগুলি বিলে করে খেলা,

সূর্যদেব অস্তে যবে নামে,
ব'লে যায়, চ'লে যাও মাঠ হ'তে ফিরে যাও গ্রামে।
সূর্যেরে প্রণমি' এরা আসে দ্রুত ফিরে
শ্রান্ত দেহে আপন কুটীরে।
শাণিত কোদাল কাস্তে নিড়ানীর 'পরে
তপনের রক্ত আভা ঝিকমিক করে।
বলদেরা পেট ভ'রে ঘাস-খড় খায়,
চাষীরা তাদের পিঠে কড়া-পড়া হাতটি বুলায়।
চিক্কণ পীবর অঙ্গে শিরশিরি ওঠে
পুলক তরঙ্গ তার রোমে রোমে নেচে নেচে ছোটে।

শীত আসে, নেই কিছু গায়ে জড়াবার,
তপনই হরণ করে চাষীদের জাড়।
ধান কাটে গান গেয়ে, রোদটুকু লাগে বড় মিঠে—
তপন বুলায় কর পরিশ্রান্ত পিঠে,
দিন ছোট, যতক্ষণ সূর্য থাকে মাথার উপরে
ততক্ষণ কাস্তে এরা গোঁজে না কোমরে।
ক্ষেত থেকে খেতে আর আসেনাকো গাঁয়,
কৃষাণী এদের ভাত গামছায় বেঁধে নিয়ে যায়।
যখন খরানি আসে, প্রচণ্ড তপন
বর্ষে বহ্নিজ্বালাময় প্রখর কিরণ,
হাসে চাষী আশাভরে চেয়ে তার পানে,
যত রোদ তত বৃষ্টি চাষী বেশ জানে।
মাঠে কাজ থাকেনাকো আর।
ছায়ায় বিশ্রাম করে যত দিন না আসে আষাঢ়।
খরানির রোদ পেয়ে কৃষাণী শুকায় ধান আর
ছোলা, মাষ, বড়ি, কুল-আমের আচার।

কুটীরের ছিটে-বেড়া দেওয়ালের পরে
ঘুঁটে দেয় ঘরের গোবরে।
মাঠে আর শস্য নেই, সারা মাঠ শূন্য করে ধুধু
বৈকালে আখের ক্ষেতে যায় চাষী একবার শুধু।
চাষীদের করিতে পোষণ
সূর্য করে সমুদ্র শোষণ,
বাষ্পজালে রচি' মেঘ পাঠিয়ে সে দেয় একে একে।
চাষীর হৃদয় নাচে শিখিসম তাই দেখে দেখে।
প্রথম যেদিন বৃষ্টি নামে,
চাষী নাচে ভিজে ভিজে সহজে না থামে।
জানে চাষী, প্রতি বিন্দু বারি
আর কারো নয়,—শুধু তারি।
প্রথম বর্ষণ হ'তে আশ্বিনের অন্তিম বর্ষণ
সকলি ত তারই তরে, তাতে আর কার প্রয়োজন ?
তা দিয়ে ফলায় সোনা মরকতে সারা মাঠজোড়া,
শুষ্ক মাঠ হয় শ্যাম, তার পরে গোরা।
সারা বর্ষা খাটে এরা, মৃদু হাসে মধ্যাহ্ন তপন।
মেঘের আড়ালে থেকে খর কর করি সংবরণ।
সোনালী কিরণে হাসে মাঠে মাঠে শরৎ তপন—
শ্যামল তরঙ্গে চাষী দেখে প্রাতে সোনার স্বপন।
তপনেই চিনে শুধু, রাখে না খবর দুনিয়ার,
তপনের সাথে এরা পেতেছে সংসার।
চাষীদের দান
নৌকায় বোঝাই হয়ে কোথা যায় রাখে না সন্ধান।
এরা সব সূর্যেরি সন্তান।

প্রকৃতি-দুলাল

বৈশাখের বেলা দুটা আকাশে অগ্নির জ্বালা ক্ষরে,
দুয়ার জানালা সব রুধিয়াছি দোতালার ঘরে
খুলি দিয়া বিজলীর পাখা।
পশ্চিমের জানালাটা খসখস-টাটি দিয়া ঢাকা।
জানালার নীচে আছে একটি বাগান
তার মাঝে ঘুরিতেছে ধনীর সন্তান
পাঁচ বছরের ছোট ছেলে একা একা।
জানালার ফাঁকে গেল দেখা।
দিবাস্বপ্নে অকস্মাৎ করি নিরীক্ষণ—
বৈভ্রাজ উদ্যানে যেন যক্ষের নন্দন।
দুয়ার জানালা রুদ্ধ প্রকাণ্ড বাড়ীর,
যেন সেথা সুপ্ত রয় রৌদ্রস্নাত নিশীথ গভীর।
ঘুমঘোরে অচেতন দারোয়ান, চাকর, ঠাকুর,
পোষা পাখী, বিড়াল, কুকুর।
শুধু অই ছোট শিশু ঘুমন্ত মায়েরে দিয়া ফাঁকি।
পলাইয়া এল হেথা খেলিতে একাকী।
পাতা ছিঁড়ে, ফুল তুলে, উপড়ায় ঘাস,
গাছে চড়িবারও তরে করে সে প্রয়াস।
ডাল ধরি ঝুল খায়, গাছেদের সঙ্গে কথা কয়,
চারা গাছে নাড়া দেয়, তাড়া দিয়া বুকে টানি লয়।
গাছতলে ঘাসের উপরি
দেয় গড়াগড়ি।
'একাকী' বলিনু বটে, একাকী সে নয়,
বেজি কাঠ-বিড়ালীরা কাছে আসে করে নাক' ভয়।

তাড়া দিলে তাহারা পালায়,
তাহাদেরে কাছে ডাকে বলি 'আয় আয়।'
ছুটি গিয়া গিরগিটি ধরে।
ফুল দিয়া পূজা করে একটা পাথরে।
পাখীগুলি করে কলরব
ধমকিয়া বলে 'থাম, মন্তর যে ভুলে যাব সব।'
দেখি তার হেন ছেলেখেলা
কৌতুকে ও কৌতূহলে কাটি গেল বেলা।
অতি সভ্য নাগরিক ধনীর সন্তান
আজো শিশু, তাই তার অকৃত্রিম অনাবিল প্রাণ।
চৌদিকে মানুষ দেখি নানারঙা জীবন্ত ফানুস.
ভুলিনু কেমন ছিল আসল মানুষ
প্রকৃতির অঙ্কছায়ে লালিত পালিত।
দেখিলাম সে মানুষে প্রকৃতির ইঙ্গিতে চালিত
পাঁচ বছরের এক শিশুর আকারে
অকস্মাৎ, দাঁড়াইয়া জানালার ধারে।
যে মানুষ ঘুমায় না সৌধ অঙ্কে পালঙ্কের স্নেহে
বৈশাখের খর রৌদ্রে শান্তি পায় প্রকৃতির গেহে ;
দেখিলাম সে মানুষে, লতাগুল্ম, তক্ষক, বেজিরে,
আপন বলিয়া জানে, বন্ধু যার রয় তৃণ-নীড়ে।
মানুষের সাথে প্রকৃতির
যে প্রীতি-সম্বন্ধ গূঢ় নিবিড় গভীর
পাইয়াছি 'ডরোথীর অগ্রজের' কবিকল্পনায়,
তাই চোখে মূর্ত রূপে ভায়।

রাধা-চন্দ্রাবলী

আয় বুকে আয় সজনী চন্দ্রাবলী,
দূরে রয়ে কেন করিস অশ্রুপাত ?
সব চেয়ে মোর তুই যে আপন হ'লি,
গলায় জড়ায়ে ধর তোর দুটি হাত।
চারি চক্ষুর সলিল মিশাই আয়,
গাগরীতে ভ'রে পাঠাব তা মথুরাতে।
নতুন রাজার অভিষেক হবে তায়,
মুড়ানো কেশের চামর পাঠাব সাথে।
বিরূপ থেকে ছিঃ কীরূপ দিয়েছি ব্যথা,
বুক ফাটে স্মরি সেই ম্লান মুখখানি।
শুনি নি হেলায় তার মধুমাখা কথা,
তাই চলে গেল ? সে তো নয় অভিমানী।
হয়তো আমরা দুটি ধাপ গায় গায়
এই ব্রজধামে তার লীলা-বেদিকার।
একটিতে বুঝি রাখি তার বাম পায়
ডান পা রাখিল আরটিতে পরে তার।
দুটি বুকে দুটি পায়ের চিহ্ন আঁকা,
আয় কাছে, আহা মিলায়ে তা দোঁহে হেরি
কোন' অনুলেপে পড়বে না তা তো ঢাকা,
ব্রজে যদি ফিরে চিনতে হবে না দেরি।
হয়তো আমরা পৃথক নইকো মোটে,
মায়াঘোরে ভাবি দোঁহে খণ্ডিতা ব'লে ;
একটি মৃণালে দুটি কি কমল ফোটে ?
দুইজনে পুন এক ক'রে গেল চ'লে।

সৃষ্টিমেধ যজ্ঞ

বুধ-শুক্র-গ্রহসম নির্জীবন নির্মানব হ'য়ে
ঘুরপাক খাক ধরা শুধু দগ্ধ শিলাপুঞ্জ ব'য়ে।
অসহায় মায়ামুগ্ধ মূঢ় জীব নিয়ে চিরদিন
ধাতার নিষ্ঠুর ক্রূর এ হৃদয়হীন
নিত্য নিত্য অনিত্যের লীলাচক্র হ'য়ে যাক শেষ,
থাকে না যেন এ হেন নিয়তির কৌতুকের লেশ।
বৈদান্তিক বলেছিল,—এই সৃষ্টি মায়ার সৃজন
শুক্তিতে রজতভ্রম, রজ্জুখণ্ডে সর্পের মতন,
জীর্ণগৃহে ঊর্ণনাভ-জাল-ও
এর চেয়ে সত্য বস্তু এর চেয়ে ভালো।
এইত চরম সত্য এই মর নরভূমিতলে
তবু নর এরে কেন রক্ষা ক'রে চলে ?
মায়াবাদী যারা হায় তারাও নির্বোধ ?
বলেনি ত মায়াসৃষ্টি ধ্বংস কর, সৃষ্টি কর রোধ।
শাক্যমুনি বলেছেন—মানবজীবন
জন্মে জন্মে শুধু দুঃখ-দহনের বহন-সহন,
নির্বাণই চরম কাম্য, লুপ্ত হতে চাও
দুশ্চর সাধনা তবে জন্মে জন্মে নিয়ত চালাও।
দশশীল সাধনায় চাইলেন তিনি
সাধনার ধারা হোক চির প্রবাহিণী।
পেয়ে বোধি সত্যের সন্ধান,
শক্তি তাঁর ছিল কই দিতে এই সৃষ্টিরে নির্বাণ ?

আজকে মানুষ আর নয় হীনবল
দানবিক তপস্যায় পেয়েছে সে আণবিক ফল,

রঙ্গমঞ্চ তাঁর
ভস্মে ভরা চূর্ণ করা তার কাছে সুসাধ্য ব্যাপার ।
পেয়েছে সে বাসবের বজ্র, আর রুদ্রের ত্রিশূল,
হবে কি এখনো তার ভুল ?
যদি থাকে পুনর্জন্ম তবে কেন জন্মজন্মান্তরে
দুঃখালয় অশাশ্বত এ ধরণী 'পরে
বারবার গতায়াত হ'তে দুঃখভাগী ?
দুঃসাধন কেনই বা লক্ষ যুগ মহামোক্ষ লাগি ?

এ যুগের মহাবুদ্ধ, আর্তকণ্ঠে মর্ত তোমা ডাকে
ভূভার হরণ ক'রে রক্ষা করো তাকে,
রেখনাক ধরাপৃষ্ঠে একটি মানুষ
দূর কর অভিশাপ জরামৃত্যু, ত্রিতাপকলুষ,
জাতিবৈর, রক্তারক্তি, আধিব্যাধি, শোক, অন্নাভাব,
করুক নিশ্চিহ্ন রূপে সবই ধ্বংস লাভ ।
মানুষ চায় না তুচ্ছ এই জীবজীবনের সুখ,
আঁধারে জোনাকি যেন, দর্পে বলো বিধাতা শুনুক,
দেখুক সে লক্ষ লক্ষ বৎসরের আয়োজন সব
নিশ্চিহ্ন করিতে পারে দুইদিনে একটি মানব ।
দেখুক সে—জীবসৃষ্টি ক'রে যায় যুগ যুগ ধ'রে
পারে না যে শান্তি দিতে, অন্ন দিতে তারে পেট ভ'রে,
কুণ্ঠিত হস্তের দান তার হেন মানুষ না চায়,
নিজেরে সংহার ক'রে পারে সে যে সংহারিতে তায় ।
মহারুদ্ররূপে তোমা আর্ত ধরা করিছে আহ্বান
দাও তারে চরম নির্বাণ ।
র'য়ে গেলে পশু পাখী, তরুলতা, জীবপঙ্ক-ক্লেদ,
জড় সনে জীবনের না হলে বিচ্ছেদ,

বৈজ্ঞানিক বলে,—
আবার জন্মাবে নর বিবর্তনফলে।
জীবনের চিহ্ন কিছু রেখনাকো কোন বীজরূপে,
বাদ যেন যায় নাকো কোন রন্ধ্র। ছিদ্র-গুহাকূপে
বিবরে লুকায়ে র'য়ে যেন তোমা না করে বঞ্চনা
জীবনের কোন সম্ভাবনা।
বাসনার প্রাণময় বীজ বা অঙ্কুর
কোথাও না থাকে যেন, ধ্বংস কর হে চণ্ড নিষ্ঠুর।
জন্মান্তর থাকে যদি, প্রেত যদি পুনর্জন্ম চায়,
যেন বিশ্বে বীজকোষ, ভ্রূণ নাহি পায়।
দিতে পার জরামৃত্যুবশ বিশ্বে তুমিই নির্বাণ
বিধ্বংসী বিমান থেকে শেষে নিজে ক'রে লম্ফদান,
সৃষ্টিমেধ মহাযজ্ঞে দিতে পূর্ণাহুতি।
রুদ্রে তুমি দিতে পার পৃথ্বীভরা শ্মশান-বিভূতি।
হে মহাযাজ্ঞিক এস তুমি,
স্থণ্ডিল তোমার হোক এই বিশ্বভূমি,
সহস্র খাণ্ডব-ভরা তৃণগুল্ম সমস্ত উদ্ভিদ্
হোক সেই যজ্ঞের সমিধ্।
অসংখ্য জীবের রক্ত মজ্জা বসা হোক যজ্ঞাহুতি,
স্বয়ম্ আদিত্য গা'ক শ্রুতি।
জ্বালো তুমি হেন যজ্ঞানল
যার ঊর্ধ্ব শিখাগুলি ভস্ম ক'রে এই ধরাতল
বিধাতার সিংহাসন দগ্ধ ক'রে দিক্।
এস তুমি হে মহাঋত্বিক।

তব প্রতীক্ষায়
কোটি কোটি আর্ত জীব জীবন গোঁয়ায়।

সংহারিকা শক্তি যার সঞ্চারিত প্রত্যেক অণুতে,
জিঘাংসা রোপিল যেবা জীবলোকে ক্ষুধিত তন্নতে
নয় কি তার এ মনোরথ।
প্রলয়ে বিলয় প'াক এ সৃষ্ট জগৎ ?
তাই যদি হয়
তাই হোক, বিলম্ব না সয় !
কবে মহামন্বন্তরে ধ্বংস পাবে এ বিশ্বসংসার
কত দিন র'বে জীব প্রতীক্ষায় তার ?
সর্ব দ্বন্দ্ব সর্ব দ্বেষ দুঃখ জ্বালা প'াক অবসান,
সর্ব সমস্যার হোক চির তরে পূর্ণ সমাধান।

ফুলের গন্ধে

মনে পড়ে শেফালীর গন্ধে
বাল্যের খেলাপাতি সখীদের সঙ্গে
মনে পড়ে বকুলের গন্ধে
প্রবাসের গৃহখানি উত্তর বঙ্গে।

মনে পড়ে মালতীর গন্ধে
চতুষ্পাঠীর সেই প্রাঙ্গণ-প্রান্ত,
যেখানে শকুন্তলা গ্রন্থে
হ'লাম স্বপ্নলোকে অভিনব পান্থ।

মনে পড়ে মহুয়ার গন্ধে
প্রিয়া সহ পালামৌয়ে জাগা সারা রাত্র
স্মরি চীনা করবীর গন্ধে
সেই বনপথখানি যবে আমি ছাত্র।

মনে পড়ে কমলের গন্ধে
মায়ের বদনখানি অশ্রুতে সিক্ত।
মনে পড়ে আউচের গন্ধে
সাঁঝের সে বনপথ বিজন বিবিক্ত।

মনে পড়ে কদমের গন্ধে
বৈরাগী আখড়ার ঝুলনের রাত্রি,
তারি মতো পুলকিত অঙ্গে
মনোরথে ব্রজপথে হই যবে যাত্রী।

মনে পড়ে চম্পকগন্ধে
বধূর আঙুলে সেই কম্পিত লজ্জা,
প্রথম কলিত মম হস্তে
ছায়ামণ্ডপে, কেশে চম্পকসজ্জা।

এমনি নানান ফুলগন্ধে
জাগে মনে যৌবন-কৈশোর-বাল্য।
যেন তার সুরভিত ছন্দে
স্মৃতি গ্রন্থন করে নব গীতিমাল্য।

অতীত জীবন নানা খণ্ডে
অংশিত হয়ে রয় ছড়ায়ে বহুত্র,
নানান ফুলের নানা গন্ধ
গাঁথিয়া রাখিল তারে হয়ে যোগসূত্র।

দুই কবি

"তুমি কি জান না কবি, ফুলে মধুগন্ধের বসতি
পতঙ্গ আহ্বান তরে করাইতে পরাগ-সঙ্গতি ?
কোথা পেলে প্রেমলীলা কুসুম-বধূর ?
অলি সে ত' তস্কর মধুর।
তুমি কি জান না কবি ভানু-তাপে উঠে বাষ্পরাশি
তাই ক্রমে জমে জমে মেঘরূপে ব্যোমে আসে ভাসি' ?
তাহার উদয়ে তব মন কেন উদাসী অমন ?
তার মাঝে হের কেন অতীতের বিস্মৃত স্বপন ?
সব চেয়ে এ বড় অদ্ভুত।
সে মেঘে করিতে চাও প্রেয়সীর বার্তাবহ দূত !
ভুলে গেলে তুমি কবি বিংশ শতাব্দীর
নহ সামসময়িক কালিদাস, মাঘ, ভারবির।"

নিঃশ্বসিয়া কহিলেন কবি
"জানি বন্ধু, তোমারি মতন জানি সবি।
আরো জানি, নারীদেহ অস্থিমজ্জামেদোরক্তময় ;
স্তন্যাধার, মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছু নয়।
লাবণ্যে লালিত্যে তবু সে তনুর পাইনাক সীমা।'
স্মরগরলের দহে মগ্ন রই। বর্ণিতে মহিমা
শ্রান্ত নই কোন দিন, তারই মাঝে দেখিতে পেলাম
ধর্ম, অর্থ, আর মোক্ষ, কাম।
একা আমি মুগ্ধ নই, তুমি কবি মুগ্ধ নও বুঝি ?
তোমার মতন মুগ্ধ কোন' কবি পাই না-তো খুঁজি।
তুমি জানো কাব্যলোকে প্রকৃতির সব লীলা মিছে
তবু কেন ছুটিতেছ মরুমায়া মরীচিকা পিছে ?

রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে শুধু উপাদান লভি,
মনের মাধুরী দিয়া গড়ি সবি তাই আমি কবি।
আরো জানি সবি মায়া স্বপ্নবৎ, চিত্তের বিভ্রম,
জানি না কী পূর্ণ সত্য, খণ্ড-সত্য নয়ত চরম।
যারা মায়ামুগ্ধ, মোর সংসারে যে তারাই আপন,
ঘনাইতে তাহাদের মোহন স্বপন,
উজলিতে তাহাদের ক্ষণবিম্বগুলি
আনন্দের বর্ণপাতে ধরি আমি মায়াময়ী তূলী।"

মধুরাম্ল রস

নববিবাহিত পুত্র মার কাছে এসে
অবিরত বধূর উদ্দেশে
কত না নালিশ করে ইনিয়ে বিনিয়ে,
কত অপরাধই মাতা করেছে যে তার বিয়ে দিয়ে!
বধূ বলে,—"ওমা, মাগো, এত কথা বানাতে ও পারে!
এত বড় মিথ্যাবাদী নেই মা সংসারে।"
জননী অবুঝ নয় মনে প্রাণে সবটুকু বোঝে
নজির প্রমাণ সাক্ষ্য কিছুই না খোঁজে।
জানে, মুগ্ধা নবোঢ়ার পদে পদে অপরাধই হয়,
রস-কলহেরই মাঝে প্রেমের চূড়ান্ত পরিচয়।
বধূরে টানিয়া কোলে বিধবা মা মৃদুমৃদু হাসে
উড়াইয়া দেয় সবি এক দীর্ঘশ্বাসে।
ত্রিশ বর্ষ আগেকার আপনার বধূকাল স্মরি
মধুরাম্ল রসে তার চিত্ত উঠে ভরি।

তবু

ভাদ্র এলো মেঘে ভরা ভাজিয়া তালের বড়া
দেয় মাতা ছেলেদের পাতে,
কাঁটালের বীচি ভাজা গরম টাটকা তাজা
দুচারিটি দেয় হাতে হাতে।
স্মরিয়া উমার কথা মা সহসা পেয়ে ব্যথা
দীর্ঘশ্বাস ফেলি ধীরে কয়—
"তালবড়া কোলে ব'সে খেতে ভাল বাসিত সে
উমা মোর কতদূরে রয়।"
হেসে উঠে ছেলে মেয়ে কয় মার পানে চেয়ে,
"বড় ঘরে দিয়েছ মা বিয়ে।
পায়স পোলাও খায় লুচিও না খেতে চায়
ভুলাবে কি তারে বড়া দিয়ে?
অরুচি হলো যা খেয়ে তুমি গরিবের মেয়ে
জীবনেও খাওনি তা কভু।"
কাঁচুমাচু মুখখানি তায় সরেনাক বাণী।
দুখিনী মা কয় শুধু—'তবু'—

*　　　*　　　*

কাঙালের ঘরে আর মেয়ে কি আসিবে তার?
দুখিনী মা ভাবে তাই বসি।
কোন দিন ফিরে এলে ডাল ভাত রেখে ঠেলে
জল খেয়ে রবে কি উপসী?
বিজলী চমকে মেঘে ঝড়ো হাওয়া বয় বেগে,
পাল তুলে তরী যায় ভেসে।
জানালার ফাঁকে চেয়ে তার সাথে যায় ধেয়ে
মার মন কোন দূর দেশে।

পুরাতন পত্র

পেয়ে নিত্য প্রতি পত্রে নীরস উত্তর
এ ক্লান্ত জীবন যবে হয় দুঃখে একান্ত কাতর
পুরানো চিঠির তাড়া খুলি
মাঝে মাঝে পড়ে দেখি ধুলা ঝাড়ি জীর্ণ লেখাগুলি
ভাঁজে ভাঁজে কত প্রীতি ভালবাসা ঝরে
অলিমুখে মধুসম কালির আঁখরে।
মনে হয় সেগুলিরে যেন তাজা গাওয়া-ঘিয়ে-ভাজা
মালদহী খাজা।
পত্রপুটে সেই চির-পরিচিত রস
আস্বাদিয়া চিত্ত হয় আবেশে অবশ।
নব্য কবি হ'লে আমি দিতাম উপমা
বহুবর্ষ ধ'রে পোতা দ্রাক্ষীসুরা যেন ছিল জমা।
একালে কাহারো হায় পত্রালাপে নেই অবসর,
শুনি তাই দ্রুত পদে পিষ্ট শুষ্ক পত্রের মর্মর।
দু'ছত্রের দায়-সারা চলে কারবার
মর্মের বার্তার দৌত্য কোন পত্র বহেনাক আর।
চলে গেছে লোকান্তরে চারুচন্দ্র, যতীন, মোহিত,
তৃপ্ত হ'ব পত্রালাপে কাহার সহিত?
ডাকচালাচালি নেই এ জগৎ হ'তে সে জগতে।
যা কিছু সংযোগ আজ কল্পরথে দূর ছায়াপথে।
একালের চিঠিগুলো তাড়াবাঁধা রয়েছে ওখানে,
শালপাতা-তাড়া যেন ময়রা-দোকানে।
সান্ত্বনার তরে পড়ি, থাকি যবে একা
পুরাতন পত্রগুলি শতপত্র-মধু দিয়ে লেখা।

নামহারাদের গান

লাখো লাখো ক্ষীণ তারা নামহীন গগনের চাঁদোয়াতে
ওরা—চাঁদহারা আঁধা রাতে
সবে মিলি দেয় যেই ক্ষীণ আলো আঁধারের সাথে যুঝে,
যারা পথহারা সে আলোয় তারা নেয় হারা পথ খুঁজে।

বনের মাঝারে হাজারে হাজারে নামহারা যত পাখী
জাগি—নীড়ে-নীড়ে উঠে ডাকি
আনন্দভরে একতান ধরে গায় নান্দীর গীতি,
নিশাশেষে প্রাতে তপনের তাতে জাগরণ হয় নিতি।

গিরি কান্তারে হাজারে হাজারে কত না কুসুম ফোটে
মোরা—নাম জানিনাক মোটে।
ধূপচন্দনে গন্ধিত করে পবন সন্ধ্যাপ্রাতে
নন্দিত হয় বন্দিত হয় চিরসুন্দর তাতে।

হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মরে বীরগণ রণে
রাখে—কে তাদের কথা মনে ?
জাতীয় বিপাকে স্বাধীনতা রাখে স্বদেশেরে করে ত্রাণ,
ব্যর্থ নয় সে নামহারাদের মর্ত্য জীবন দান।

দেশে শত শত নামহারা যত কবিকণ্ঠের গীতি
জানি—ডুবিবে তাদের স্মৃতি,
তারা মিলি সবে রাখিবে নীরবে গীতিসুর-ধুনী-ধারা।
অন্তিম খনে এ গীতি আমার সে ধারায় হবে হারা।

জোনাকি

বনের জোনাকি জান কি তোমায় কত আমি ভালবাসি ?
তোমার আলো যে তামসা নিশির মুখে মৃদু মৃদু হাসি।
ঝিল্লীমুখর অমাবস্যার রাতে
চেয়ে তোমা পানে উদাসী নয়ানে ব'সে থাকি আমি ছাতে
আকাশে তারারা দিব্য প্রভায় জ্বলে
ধেয়ানে মৌনী, কোন কথা নাহি বলে।
তুমি নিভে নিভে জ্বলো,
তুমি আঁধারের গোপন বার্তা দ্বিধাভরে বুঝি বলো।
তোমার আঁখরে গহনের বাণী ঝলকে গগন গায়,
বুঝি-বুঝি করি বুঝিতে না পারি পলকে তা মুছে যায়।
কোন সত্যের আভাসন দিয়া নিভা-জ্বলা কেবা জানে ?
এইটুকু জানি আলেয়ার মতো টান না ভুলের পানে।
তুমি রহস্যময়
তুমি কি শ্যামার সস্মিত মুখে আভাসিত বরাভয় ?
ঘরে জ্বলে বাতি আঁধার রাতির কাজের প্রখর আলো
তুমি অকাজের নিস্তাপ আলো তাই তোমা বাসি ভালো।
ব্যথার আঁধারে সারাটি জীবন ভরা এই দুনিয়ায়
তোমারি মতন ক্ষণিক দীপন সুখের স্ফুরণ তায়।
কবিতা আমার তোমারি ধর্ম পালে,
কাঁচ-পোকা-টিপ যেন তা সাঁঝের কালো বধূটির ভালে।
ভাস্করে পূজি ভাস্বর তার শাশ্বত তেজোরাশি,
তুমি যে ক্ষণিক মাণিকের আলো তাই তোমা ভালবাসি।

লেখার বিঘ্ন

লেখায় বসে না মন,
দেখি চেয়ে চেয়ে কাঠবিড়ালীটা গাছে ঘুরে অকারণ,
টিকটিকিগুলো দেওয়ালের গায়ে ঠিকঠিকই ওঠে নামে।
ঘুঘু ডেকে চলে ওধারের চালে কিছুতে সেটা না থামে।
পায়রাগুলোর বকম বকম চলিতেছে সারা খন।
লেখায় লাগে না মন।

সকাল বেলায় রুটির টুকরো মেজেয় ফেলিনু ছুঁড়ে,
সেটা একলাখ পিঁপড়ের ঝাঁক টেনে নিয়ে যায় দূরে।
পুকুরের পারে দেখি তালগাছে বাবুই বুনিছে বাসা।
গাছ হতে ছাদে ছানা বুকে বেঁধে বাঁদরী লাফায় খাসা
নানা রঙ মাখি মেঘগুলো দেখি করিতেছে বিচরণ।
লেখায় লাগে না মন।

একটা ভিখারী ভিখ মাগে পথে সবাই ফিরায় তায়।
হাম্বা ডাকিয়া ক্ষুধিত বাছুর চাহিতেছে তার মায়।
ছোট ছেলে কাঁদে, কোলে নিয়ে ছাদে মা তারে ভুলায় বৃথা,
বাউলিয়া সুরে গান গেয়ে দূরে কে খোঁজে মনের মিতা।
হাঁকে চুড়িউলী 'চুড়ি লিবে বলি', নেই কারো প্রয়োজন?
লেখায় বসে না মন।

বুড়ো বটগাছে ডাল ভ'রে আছে গোল গোল লাল ফলে,
বুড়ো ডোম খুড়ো দ্রুত ঝুড়ি ঝাঁকা বুনে চলে তার তলে
নীলাকাশে উড়ি ভাসিতেছে ঘুড়ি চিল মনে হয় তারে।
বাতাবি ফুলের গন্ধ আসিছে মোর জানালার ধারে।
কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে হঠাৎ এত কেন আয়োজন?
লেখায় বসে না মন।

গৃধ্র

প্রশস্তি পেয়েছে শুধু শুক, শিখী, কোকিল, চন্দনা।
হলো শ্রেয় তায় হেয়, প্রেয় শুধু লভিল বন্দনা।
ঠাঁই পেলে উপমায় সুন্দরীর শ্রুতিতে কেবল
গৃধ্র, তব অঙ্গে আমি দুলাইব, স্তুতির কুণ্ডল।
জঙ্গী বিমানের মত ব্যোমে তব ঘূর্ণ বিচরণ,
সেথা হতে কর মর্তে মার্তণ্ডের নিদেশ পালন।
মড়ক-নরক হ'তে নরলোকে কর পরিত্রাণ,
তোমার জঠর-স্বর্গে মৃত পায় অমৃত সন্ধান।
ময়ূর যে নীলকণ্ঠ ব্যক্ত তার বর্ণেই কেবল,
তুমিই ত' নীলকণ্ঠ, কণ্ঠে তব ধরার গরল।
জীবন্তে বধিয়া ক্রূর শ্যেনসম কর না পাতক,
লোকপাল, নও তুমি নরসম স্বজাতি-ঘাতক।
মানুষের অন্তরেও গৃধ্র আছে। তার আচরণ
তোমার মতন নয়, রক্তপায়ী শ্যেনেরই মতন।
কুরুক্ষেত্র বাধাইতে করে সে যে পক্ষের বেপন,
তাহাই ত' শকুনির অক্ষের ক্ষেপণ।
চঞ্চুতে মুষল বয় জ্ঞাতি-দ্বন্দ্বে করে তা নিক্ষেপ,
চূর্ণ হয়, চূর্ণে তার আত্মঘাতী বীর অবলেপ।
শবভারে অবসন্না আর্ত ধরা, হর' তুমি ভার
করি যত অসংকৃত মৃতকের চরম সংকার।

* * *

বসিয়া হুঙ্কার ছাড়ো অশ্বত্থের শাখাকূট 'পরি,
শুনি তাই গৃধ্রকূট পর্বতেরে স্মরি।
শ্মশান-বৈরাগ্য জাগে, মনে ভায় বুদ্ধের বদন,
মনে হয় রাজগৃহে তুমি বেণুবনের শ্রমণ।

ভারতলক্ষ্মী

আর্যঋষির হলের মুখে দীর্ণ করি ভূমি
ভারতলক্ষ্মী সীতার রূপে জন্ম নিলে তুমি।
বীরের ভোগ্যা হ'লে তুমি মা-বসুধার মত,
তোমার চরণতলে হ'লো উদ্ধত শির নত।
ঈর্ষাবতী তুর্করাণী তোমায় নির্বাসনে
পাঠিয়ে দিল। অজ্ঞাতবাস হলো তোমার বনে।
সিন্ধুপারের রক্ষোনৃপ করল হরণ হায়।
রেখে দিল অশোকবনে চেড়ীর পাহারায়।
অনেক দুঃখে হ'ল তোমার আজকে সমুদ্ধার,
তিনরঙা ঐ ধ্বজা উড়ে করছে তা প্রচার।
অবিবেচক প্রজার মুখের মিথ্যা অপবাদ
কল্পনাতে সৃষ্টি ক'রে অলীক অপরাধ,
আবার যদি বনবাসে পাঠায়ে দেয় তায়,
মাটির মেয়ে মাটির বুকে ফিরবে পুনরায়।

কালবৈশাখী

সহসা আস্‌ল কালবৈশাখী ভাঙে মড় মড়ি তরুর শাখা।
বহুদিন অনাবৃষ্টি গিয়েছে লঘু মেঘে আজ আকাশ ঢাকা।
চারিদিকে চলে তাণ্ডবলীলা তার মাঝে তবু জাগে দুরাশা।
চাল উড়ে যায়, ফল ঝ'রে যায়, উল্লাসে তবু নাচছে চাষা।
ধূলায় আঁধার হলো চারধার, ধ্বংসও ভালো যায় না দেখা।
মেঘে ত্রিবর্ণ পতাকার মত চপলা আঁকছে চপল রেখা।

বনবৃক্ষের পাখীর কুলায় সব গেল আজ কোথায় উড়ে।
বাসাহারা পাখী লাখে লাখে ঝড়ে ঘুরপাক খায় আকাশ জুড়ে।
বাসাও গিয়েছে, আশাও গিয়েছে এখন হয়েছে আকাশ সার,
গৃহবন্ধন-মুক্ত পেয়েছে স্বাদ যে চরম স্বাধীনতার।
ঝড় যাবে থামি, বর্ষণ নামি ঘুচাবে কি দেশে সব অভাব?
কুড়ায়ে কোঁচড়ে কাঁচা আম ভাবে আপাতত শিশু পরম লাভ।
জ্যৈষ্ঠের খরা আসে দেশ-ভরা শুকাতে শস্য তৃণ শ্যামল।
মরুভূমি সম হবে দেশ মম পাহাড়িয়া নদী হারাবে জল।
আবার তেমনি বাঁধতে কুলায় খড়কুটা খুঁজে পাবে কি পাখী?
ডাল-ভাঙা বটগাছে রাঙাফল তাদেরে কি পুন আনবে ডাকি?
আষাঢ়িয়া আশা মনে যারা পোষে তাদের হয়ত সইবে সবি।
নব বরষার মঙ্গল গান গাইতে তখন রবে না কবি।

ব্যথিত বিচার

মাঝখানে দর্ভাসন পাতা
চারিপাশে রাশি রাশি পরীক্ষার খাতা।
ঊনিশ শ' পঞ্চাশের খর রৌদ্রে কাঠমাটি ফাটে,
খাতার এ শৈলাবাসে মোর গ্রীষ্ম কাটে।
গৃহিণী বলেন নিত্য এ আপদ দূর হলে বাঁচি,
তোমারে পাঠায়ে দিই রাঁচি।
আমি ভাবি যত দিন ছাত্রদের অবদানগুলি
কাছে আছে তত দিন সংসারের সব জ্বালা ভুলি।
তাহাদের সঙ্গ-সুখ জীবন জুড়ায়
কৈশোরে ফিরায়ে নিয়ে যায় এই নিঃসঙ্গ বুড়ায়।

জীবনীশক্তিতে দীপ্ত তরুণের দল
নয় হেথা উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম, চঞ্চল,
নিঃশব্দেই সহে ক্লেশ স্তব্ধ প্রতীক্ষার
কৃতাঞ্জলি হয়ে তারা নত শিরে চাহিছে বিচার।
যত 'রাখালের' দল মোরে ঘেরি হয়েছে 'গোপাল',
খাতার পাতায় দেখি তাহাদের প্রণত কপাল।
যতটুকু সাধ্য তারা ততটুকু করি প্রাণপণ
মসীমাখা করপুটে নিঃশেষে করেছে নিবেদন,
শ্রান্ত অবসন্ন দেহ, ক্লান্ত শির, আঁখি ছলছল,
'বলিয়াছে এর বেশি নেই আর কিছুই সম্বল।'
রোগ শোক অর্ধাশন দারিদ্র্যের সাথে নিত্য যুঝি।
কত কষ্টে বাঁচাইয়া আনিয়াছে তাহাদের পুঁজি।
মনে পড়ে একদিন ভুলে ভরা মোর লেখা খাতা
সমান দশায় হেন বিচারের জন্য ছিল পাতা।
যে বিধান দিল মোরে বিশ্ববিদ্যালয়
তাহার নির্দেশ মোরে পালিতেই হয়।
প্রহ্লাদচরিত্র নাট্যে জল্লাদের করি অভিনয়।
আমার অস্থির চিত্তে স্বস্তির বিশ্রাম
তাহাদেরই তরে নাই, যারা ব্যর্থকাম।
তাদের লেখায় যত লাল দাগ পড়ে
লেখনীর সূচি-মুখ তত মোর বক্ষ ক্ষত করে।
নিষ্প্রভ করিয়া বহু সহস্রের সাহচর্য-সুখ,
জাগে মোর চারিপাশে তাহাদের মসীমাখা মুখ।
তিলে তিলে গ'লে যায় হৃদয়ের ননী,
সহস্র বক্ষের শুনি উৎকণ্ঠার দুরুদুরু ধ্বনি।

জন্মদিনে

(১৩৬৪)

স্মরি শুধু মোর জন্মদিনে
তাহাদেরই এ জীবন বন্দী আছে যাহাদের ঋণে।
স্বর্গত পিতারে স্মরি,—উদার হৃদয়
স্বল্পে তুষ্ট, ধর্মনিষ্ঠ, ত্যাগে হৃষ্ট, চিরস্নেহময়,
স্বর্গাদপি গরীয়সী মর্তভূমে আনিলেন যিনি।
আজি স্মরণীয়া মোর মৃতবৎসা জননী দুঃখিনী
কৃচ্ছ্র ব্রতে মোরে অঙ্কে করি যিনি লাভ
ভুলিলেন সকল অভাব।
স্মরি স্নেহমুগ্ধ তাঁর সচকিত নয়নসজল
উৎকণ্ঠা উদ্বেগে ত্রাসে, ঘটাহত স্রোতের কমল।
স্মরি সে 'এগুনী মায়ে' সূতিকা আগারে
মাকে জানিবার আগে জানিলাম চিনিলাম যারে।
স্মরি সেই চালাঘর যাহার আঁধারে
ভূমিস্পর্শ লভিলাম ঘন ঘোর নিশ্চন্দ্র আষাঢ়ে।
উদ্দেশে প্রণমি তারে, করি শঙ্খধ্বনি
ঘোষণা করিল যেবা ধরাধামে মোর আগমনী।
স্মরি সে বৈষ্ণবগৃহ পিতৃতীর্থধাম
তাহার তুলসীমঞ্চে শতশত জানাই প্রণাম।
আনিল ভাসায়ে মোরে যেই কুলধারা
গত শতাব্দীর প্রান্তে ; সে ধারারে প্রেরিলেন যাঁরা
সানু হতে সান্বন্তরে গঙ্গাধারা সম
সেই পিতৃগণ আজ গঙ্গাজলে তর্পণীয় মম।

স্মরি সেই গৃহপোষ্যা ধেনুটিরে, দিয়া স্তন্যসুধা
বঞ্চিয়া নিজের বৎসে ঘুচাল সে মোর শিশুক্ষুধা।
স্মরি মোর পল্লীপ্রকৃতিরে
এই দেহ তুষ্ট হ'ল, পুষ্ট হ'লো যার অন্নে, ক্ষীরে।
স্নেহের ছায়ায় রাখি পরাল সে মায়ার অঞ্জন
দ্বিজত্ব লভিল যাতে অনাবিষ্ট দৈহিক নয়ন,
রসাবেশে যার দৃষ্টি সৃষ্টিরে করিল মধুময়
নিত্যনবনবায়িত, সঞ্চারিল অগাধ বিস্ময়।
রাশিরাশি স্বপ্নবিম্ব ফুটাইল মনের দর্পণে
নব সৃষ্টি উপাদান হ'লো যারা আমার যৌবনে।
স্মরি তার বৃদ্ধ বট, মাঠ, ঘাট, মঠের প্রাঙ্গণ,
ফুলে ভরা হাঁসচরা দীঘিটির ধারে বাঁশবন।
স্মরি পল্লী জননীরে যার মুখবায়ু
জীবনী পাথেয় রূপে দিল শক্তি, দিল দীর্ঘ আয়ু।
ফুরাইয়া আসে এবে পথ
সব শেষে করি আজ মস্তক লুটায়ে দণ্ডবৎ
সেই বিশ্ববিধাতার পায়,
শ্রীধরের রূপে যিনি মোর গৃহে পূজিত শিলায়।

বুদ্ধের কৃষি

বৈশালী হতে রাজগৃহ পানে ফিরিছেন তথাগত
সঙ্গে তাঁহার শিষ্য সেবক শত।
নগরের কাছে আসি
দেখিলেন তিনি পুরোপকণ্ঠে এক ব্রাহ্মণ চাষী
নূতন ফসল পুঞ্জিত করি' ভবনের আঙিনাতে,
মেতেছে নৃত্য-ভোজনোৎসবে ভৃত্যগণের সাথে।
ভোজ্য দ্রব্য চলিয়াছে ভারে ভারে
বুদ্ধ আসিয়া ভিক্ষাপাত্র পাতিলেন তার দ্বারে।
বাহিরে আসিয়া বিপ্র ভরদ্বাজ
কহিল—"ভিক্ষু, হেথা ঠাঁই নাই, মিলিবে না কিছু আজ।
জমি চষি মোরা বীজ বুনি সময়েতে,
সারা বৎসর প্রাণপণে খাটি ক্ষেতে,
পাত করি মোরা দেহের ঘর্মজল,
শস্য পাকিলে উপভোগ করি পরিশ্রমের ফল।
তাতে তুমি ভাগ বসাইতে চাও, মোটে লজ্জিত নহ,
যারা শ্রম করে তাদের গলগ্রহ!
মোর উপদেশ শোনো,
গৃহে ফিরে গিয়ে চাষ করো, বীজ বোনো।"
ভরদ্বাজের এই উপদেশ শুনি',
কহিলেন প্রভু—"আমিও বন্ধু ভূমি চষি, বীজ বুনি;
'সৎকর্মের' বৃষ্টির ধারা উর্বরা করে ভুঁই।
আমি 'সম্যক দৃষ্টির' বীজ বুনে তার পরে রুই।
'শ্রদ্ধার' বৃষ-চালিত যে হাল, 'প্রজ্ঞা' যাহার ফাল,
তারি কর্ষণে, 'তৃষ্ণার' জঞ্জাল

দূর হ'য়ে যায়, ভূমি করে ফল দান,
এই ফল নির্বাণ।"
কহিল বিপ্র—"বিশ্বাস করি কা'কে ?
সব ভিক্ষুই শুষ্ক ইক্ষু, এই কথা ব'লে থাকে।
প্রমাণ কিছু কি আছে ?"
বলিলেন প্রভু—"প্রমাণ চাওত এস মোর পাছে পাছে।"
চলিলেন প্রভু পশিলেন পুরে লইয়া ভরদ্বাজে,
দেখিলেন সেথা প্রমোদোদ্যান মাঝে
জমিয়াছে যত পৌরগণের ভীড়,
হেরিতেছে তারা নৃত্যের লীলা প্রধানা নর্তকীর।
নর্তকী কুবলয়
হাবে ভাবে রূপে লাস্যে সবার হৃদয় করিছে জয়।
তথাগত তথা পশিলেন জনতায়,
মুগ্ধ জনতা চিনিতে নারিল তদ্‌গত লালসায়।
সবে রূপবতী নটী কুবলয় পানে
অতি লোভাতুর কামনাবিধুর দৃষ্টি প্রখর হানে।
নৃত্য করিয়া শেষ,
সংবরি কেশ, বিন্যাসি শ্লথ বেশ,
জনতারে ডাকি স্পর্ধিতা নারী কয়,
"মোর নাম কুবলয়,
রূপে গুণে আমি সব নাগরীরে করিয়াছি পরাজয়।
প্রাণ ভরি সবে কর উপভোগ মোর দর্শনসুখ,
এই পৃথিবীতে ভাগ্যবান যে,—সেই স্পর্শনসুখ
ক্বচিৎ কখনো পায়।
আছে কোন নারী মোর মত এত সুন্দরী বসুধায় ?"
জনতা হইতে কহিলেন তথাগত,
"স্পর্ধা কোরো না অত।

শোনো নির্বোধ নারী।
তোমার চেয়েও শতগুণ বেশি রূপসী দেখাতে পারি।"
জনতা উঠিল হাঁকি
"কপট ভিক্ষু, কোথা সেই নারী এক্ষণি আনো ডাকি।"

কহিলেন প্রভু—"মা আমার, তুমি আবার নৃত্য কর',
তার সাথে গান ধর'।"
অপূর্ব লীলাকৌশল রচি সে রূপসী কুবলয়
গাহিয়া নাচিয়া চলিল সবার হৃদয় করিয়া জয়।
একদৃষ্টিতে বুদ্ধ তাহার পানে
রহিলেন চাহি চোখ দুটি যেন অগ্নিবৃষ্টি হানে।
রূপসী নটীর চুলগুলি গেল পাকি
কুন্দদশন খসিয়া পড়িল, পাঁচটি রহিল বাকি।
ঝরিয়া পড়িল রূপ-লাবণ্য, নেত্র কোটরগত,
গণ্ডে জাগিল ক্ষত,
উন্নত কুচ লুলিত হইয়া পরশ করিল কটি,
অতি কুৎসিতা জরতী হইল নটী।
কোথা গেল সেই অনুপম কায়া? রহিল কেবল ছায়া।
সবি মায়া, সবি মায়া!
খসিয়া পড়িল সকল ভূষণ কৌষেয় কঞ্চুক,
খসিয়া পড়িল কটির চীনাংশুক
না মানি মেখলাবন্ধন তার। কুণ্ঠিত ক্ষোভে লাজে
বিবসনা হয়ে বসিয়া পড়িল পৌর সভার মাঝে।
ঘৃণায় জনতা নয়ন মুদিল, পলাইল কেহ কেহ।
কহিলেন প্রভু—"দর্পণে নিজ দেহ
দেখ একবার, সেই অনিত্য মায়ারূপ পরিহরি'
হয়েছ বৎসে, এবে কত সুন্দরী।"

লুণ্ঠিত বাসে কুণ্ঠিত তনু ঢাকি ;
করুণ কণ্ঠে কহিল—"হে প্রভু, জানিতে নাইক বাকি,
কে তুমি, আজিকে গর্ব করিলে চুর,
শ্রীচরণে ঠাঁই দিয়া কন্যার মোহমায়া কর দূর।
হে করুণাময়, তব করুণার অন্ত অবধি নাই
ডেকে নিলে তুমি এত সত্বর তাই।"
কহিলেন প্রভু—"বৎসে আমার, আর কোরো নাক দেরি,
চল মোর সাথে আজ হ'তে হ'লে থেরী।"

পাইয়া দারুণ লাজ,
বুদ্ধচরণে লুটিয়া পড়িয়া কহিল ভরদ্বাজ—
"বুঝিয়াছি কোন কৃষির কৃষক তুমি,
কী বীজ তোমার, কী যে হল-বৃষ, কী তোমার ক্ষেতভূমি !
আমার সুখের সংসার হ'তে তোমার সঙ্গ বড়,
তোমার কৃষির কৃষাণ আমারে কর।"

কহিলেন প্রভু—"সময় এখনো হয়নি, ভরদ্বাজ,
সময় হ'লেই ডেকে নেব ঠিকই, গৃহে ফিরে যাও আজ।"
পৌরগণের চিত্ত-চিতায় ভস্ম হইল মার,
করিল তাহারা সানন্দে হুঙ্কার
'জয় বুদ্ধের জয়
শাশ্বতকাল বুদ্ধ সত্য, দুদিনের কুবলয়।'

সৌন্দর্য-বিচার

বস্তুতে কি রহে রূপ ? সৌন্দর্য রহে কি নারীদেহে ?
সৌন্দর্য বসতি করে পুরুষের অন্তরের গেহে।
সে গেহের দুটি দ্বার—দুটি চোখ, আসিয়া বাহিরে
সে দ্বারে, আশ্রয় করে শ্রী-সৌন্দর্য নারীর শরীরে।
কে করিবে ইহার বিচার ?
দেশে দেশে কালে কালে পাত্রে পাত্রে আদর্শ ইহার
ভিন্ন ভিন্ন, নয় ধ্রুব তাহার আশ্রয়,
সে আশ্রয় অশাশ্বত মেদোমাংসময়।
আজি যাহা মুগ্ধ করে, কালি জীর্ণ জরায় পীড়ায়,
দুঃখে শোকে পেলবতা চিক্কণতা লালিত্য হারায়।
আছে বহু প্রসাধন, আভরণ সে অঙ্গে দুলাতে,
সূর্পণখা বিমোহিনী সাজি আসে লক্ষ্মণে ভুলাতে।
এর চেয়ে ইন্দ্রধনু ঢের রম্য শারদ আকাশে,
তাহাও ক্ষণিক বটে, কিন্তু তাহা ফিরে ফিরে আসে।
হায় প্রভু তথাগত দর্পহারী মহিষী ক্ষেমার,
নির্বাণ লভেছ তুমি দিবনাক দোহাই তোমার।
বৃদ্ধ জরাজীর্ণ তবু বিধাতার থাকিবার কথা—
মানবীর স্পর্ধা হেরি মানবের হেরি বাতুলতা
নিশ্চয় হাসেন তিনি। নারীদেহ সৃষ্টি বটে তাঁর,
নারীর সৌন্দর্য সে ত', পুরুষের সৃষ্টি কামনার।
'অর্ধেক মানবী নারী অর্ধেক কল্পনা'
রূপের বিচার তার রূপান্তরে অনঙ্গ-অর্চনা।
রূপমান যন্ত্র বুঝি আবিষ্কৃত হইয়াছে শেষে
আমন্ত্রণ চলিয়াছে তাই দেশে দেশে—

'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ' কে আছ উর্বশী
ধাতার মানসকন্যা অপূর্ব রূপসী,
লজ্জাহীনা সজ্জাহীনা অস্থিমজ্জামাংসমেদোহীনা
নহ দীনা, নহ ক্ষীণা, নহ অতিপীনা,
রূপের পরীক্ষা হবে, পাদ্য অর্ঘ্য লভিবে প্রচুর,
এস ত্বরা তুমি হবে 'জাহানের নূর'।

তবলার চাঁটি

দূর পল্লীগ্রাম হ'তে ভেসে এসে জনস্রোতে
কুটীর-কোটরে করে বাস।
ফুরায়ে এসেছে পুঁজি পেয়েছে সে কোথা বুঝি
কোন কাজকর্মের আশ্বাস।
জমিজমা ঘরবাড়ী সকলি এসেছে ছাড়ি
পুকুর বাগান আছে প'ড়ে,
তাদের ছেড়েছে মায়া সাধের তবলা বাঁয়া
শুধুই এনেছে সাথে ক'রে।
হারাধনে নেই লোভ বেচারা মিটায় ক্ষোভ
চামড়া পিটায়ে, ভুলে থাকে—
অবলা শিশুর কথা, তাদের অভাব ব্যথা
তবলার বোল দিয়ে ঢাকে।
কিছুই বোলো না ওরে থাকুক মোহের ঘোরে,
জানি তব কান ঝালাপালা,
চর্মে সে সান্ত্বনা খোঁজে, কর্মে তা পায়নি ও যে,
চাঁটিতে উড়ায় সব জ্বালা।

বিজ্ঞানের বল

এ বিশ্বের আদ্যাশক্তি সৃষ্টিকর্ম করি সমাপন
মানুষ, তোমার হাতে এ ধরারে করেছে অর্পণ।
পূর্ণ রূপে অধিকারি নতুন করিয়া তারে গড়ো,
অথবা বিজ্ঞানবলে বিধ্বংস করিবে, তাই করো।
ধরারে সর্ষপকণা ভাবি চিরদিন
মহাশক্তি রবে উদাসীন।
যতই বিস্তার করো বিজ্ঞানমহিমা
ইন্দ্রজালী বিজ্ঞানের ক্ষমতার আছে পরিসীমা।
ক্ষণজীবী পতঙ্গ মানুষ,
যতই উড়াও তুমি স্পুটনিকে খেলার ফানুস,
বিহিত সীমারই মাঝে তার লীলা চলে,
সীমার লঙ্ঘন কভু তারে নাহি বলে।
যে বুদ্ধিতে কর তুমি দুঃসাধ্য সাধন
তার বীজ মহাশক্তি তব দেহে করিল বপন।
এ অসীম ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহান্তর জিনিবার আশা
জেনো তারে বিজ্ঞানের বকাণ্ড-প্রত্যাশা।
জীবলোক সংহারিতে পারে তব বিজ্ঞানের বল,
সাধিতে মানসলোকে পারে সার্বজনীন মঙ্গল ?
বিশ্বজিৎ, তবু তুমি জীবনান্ত-সীমার অধীন,
বিজ্ঞান লঙ্ঘিতে সেই সীমা শক্তিহীন।
প্রকৃতিরে জিনিয়াছ, ধরণী তোমার ক্রীড়াভূমি,
মৃত্যুবিজয়ের কথা ভেবেছ কি তুমি ?
বিজ্ঞানের বলে নয় লভি বল অন্য সাধনার
এ মানুষই জিনি মৃত্যু রথী হয় সারথ্যে তাহার
যুগে যুগে, দেশে দেশে, গ্রহে গ্রহে অভিযান যার।

বুদ্ধদেব

শুনিয়াছি চিরলুপ্তি, স্বর্গ, মুক্তি, নরকের কথা,
হে সুগত, শুনাইলে তুমি শুধু আশার বারতা।
বুঝিলাম, না হইলে ধ্বংস কামনার,
জন্মপথে এ জগতে আসিতে হইবে বার বার।
আশ্বস্ত করিলে শাস্তা, মৃত্যু নেই মোর
ছিন্ন কভু হইবে না ধরণীর সাথে বাঁধা ডোর।
ভালবাসি যে ধরারে আসিব তো সেথা ফিরে ফিরে
পশু হই, পক্ষী হই, হই ব্যাধ পাতার কুটীরে।
দুঃখালয় অশাশ্বত জানি এই ধরা
জরা মৃত্যু পাপ তাপে ভরা
তবু তারে ভালবাসি। নাই মোর শীলের সাধনা,
'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব' বাড়িছে কামনা,
তোমারি লভিতে যাহা লাগে কোটি যোগিজন্ম, প্রভু,
জানি তাহা—সে নির্বাণ—এ ভোগীর লভ্য নয় কভু।
শুনাইলে আশারই সংবাদ
আয়ত্ত হইবে মোর বহু নব জীবনের স্বাদ।
জন্মধারা নাহি করে যদি কভু অবসান লাভ
অসংখ্য জন্মের মোর চিন্তা, চেষ্টা, স্বপ্ন, অনুভাব—
যত তুচ্ছ হোক তাহা পুঞ্জীভূত হইলে সকলি
অবজ্ঞাত হইবে না কভু তুচ্ছ বলি,
অঙ্গীভূত হয় যদি মানুষের জীবনধারায়
কামনার দণ্ড মোর পণ্ড ব্যর্থ হইবে কি তায় ?
আশ্বস্ত করিলে শাস্তা, তোমার নির্বাণ
তোমারি থাকুক প্রভু, চাইনাক আমি অবসান।

গীতগোবিন্দের কবি

বিলাসকলায় কেলি-কুতূহলী রসকমলের রবি,
পদ্মাবতীর চরণ-চারণ-চক্রবর্তী কবি,
দোলগোবিন্দ-পদারবিন্দে ভূষিত রঙের ফাগে,
কোমল কান্ত ষট্‌পদ তব গুঞ্জরে ছয় রাগে।
মেছুরাম্বরে সান্দ্র মেঘের ডম্বর যবে বাজে,
আজো হেরি তোমা তমালতরুর তমোনীলিমার মাঝে
পরশ তোমার লবঙ্গ-লতা-চুম্বিত সমীরণে,
হরষ তোমার বকুলে মোদিত কোকিল-কূজিত বনে।
তব নখাংশু হেরি মধুমাসে কিংশুক কলিকায়,
তব লীলা হেরি হিল্লোলময়া বল্লীর তনিমায়।
গোপীর চরণে রণিত নূপুরে তব খঞ্জনী বাজে,
নাচে শিখণ্ডিশিখামণ্ডলে কল্পনা নব সাজে।
মঞ্জুল ঘন বঞ্জুলবন কুঞ্জ-বিতান তলে
শয্যা তোমার সজ্জিত কবি শ্যামল শষ্পদলে।
হে আদি সাধক আদিম রসের, বাণীমন্দিরচূড়ে
তব অঙ্গের নামাবলীখানি জয়কেতু হয়ে উড়ে।
ছন্দ তোমার নাটমন্দিরে দধিমঙ্গলে নাচে,
শ্যামতনু আজো তোমার রচিত শৃঙ্গারবেশ যাচে।
গঙ্গা অজয় গাহি তব জয় প্রেমের বন্যা আনে,
গাহে এ বঙ্গভাষা জয় জয় কোটি মৃদঙ্গতানে।
তব রস সব রসেরে জিনেছে জয়দেব তুমি তাই,
কালের শাসনে তব পরাজয়, তব জরাভয় নাই।

পতিত-পাবন

এই মর্তলোকে ছিলে ক' দিনই বা ছুতারের ছেলে।
জানিনাক মহাজ্ঞান কোথা তুমি পেলে।
মানুষের শিক্ষাধামে করোনি ত' বিদ্যার অর্জন।
ছিলনাক বহু শ্রুত কিংবা প্রবচন।
জনারণ্যে বসিয়া পাহাড়ে
কি তরঙ্গ তুলে গেলে মানবজীবন-পারাবারে
বিনা ঝঞ্ঝা বাতে,
বিংশ শতাব্দীর বুকও আলোড়িত তাহার আঘাতে !
কোটি কোটি নরনারী বন্দে তোমা আজো সন্ধ্যা-প্রাতে

বালক ছিলাম যবে পড়িতাম মিশনারী স্কুলে
বাইবেল পাঠ্য ছিল, আজো তাহা যাই নাই ভুলে।
পড়িয়া তোমার সেই জীবনান্ত-কথা
পাইতাম বুকে মোর পেরেকের ব্যথা।
খোলা বাইবেল বুকে রহিয়া শয়ান
কত সন্ধ্যা তিতায়েছি অশ্রুজলে মোর উপাধান।
ক্ষোভে রোষে মর্ম মোর জ্বলিয়াছে দহ্যমান তুষে,
ইহুদী ফরিশীদের মনে মনে চড়ায়েছি ক্রুশে।
তখনও তোমারে আমি লই নাই মানি
ঈশ্বরের পুত্র বলি। নিতান্ত আপন জনই জানি
ব্যথা পাইলাম স্মরি ক্রুশক্লিষ্ট তব মুখখানি।

পরে চিনিয়াছি তোমা ঈশ্বরের বরপুত্র বলি
শোকাবেগ উঠে নাই আর তো উথলি।
যাদেরে ক্ষমিয়া গেলে আমিও তাদের আজ ক্ষমি।

শুধু ক্ষমা কেন বলি ? তাদেরে প্রণমি।
তাদের নিষ্ঠুরতম অপরাধও যাই আজ ভুলি,
অমৃতের উৎস তারা শলাকাগ্রে দিয়াছে যে খুলি।
রক্তপাত করিয়াছে তব বক্ষে হাতুড়ি আঘাত
রুদ্ধ করিয়াছে তাহা লক্ষ লক্ষ বক্ষে রক্তপাত।
অই রক্তটিকা পরি দেশে দেশে অগণ্য দানব
হে শরণ্য, হইয়াছে বরেণ্য মানব।
সেই রক্ত পরশিয়া যুগে যুগে সহস্র লেখনী
গ্রন্থের খনির বক্ষে বিথারিল লক্ষ স্পর্শমণি।
তব ক্রুশখানি
দেশে দেশে বহিয়াছে ক্ষমা, প্রেম, সাম্য, মৈত্রী-বাণী
তুলিয়াছে কত শত বামন বর্বরে
আরোহণী রূপে তাহা প্রাংশুলভ্য সভ্যতার স্তরে।
পতিত মানব জমি কত ছিল এই বিশ্ব ভরি
সোনা ফলাইল সেথা তব ক্রুশ হল-রূপ ধরি।
স্বর্গলোক আছে বলি করিনি বিশ্বাস
তব ক্ষমা দিল মর্তে স্বর্গেরই আভাস।
সভ্যতা-গর্বিত জাতি ভুলিয়াছে তোমা
মানুষ মারিতে তারা গড়িতেছে নিত্য নব বোমা।
পতিতপাবন, যেই মহাদেশে তব জন্মভূমি
সেথায় ফিরিয়া এসো, মোদের উপাস্য হও তুমি।
দ্বিতীয় নিতাইরূপে নিমাইয়ের পাশে
আসিয়া দাঁড়াও তুমি, রহিও না অপ্রাচ্য প্রবাসে।
শয়তান 'ম্যামনের' দান ওরা করুক সম্ভোগ,
আমাদেরি সাথে তব হৃদয়ের চিরন্তন যোগ।

কালিদাসের উদ্দেশে

রম্য দৃশ্যে গন্ধে গানে প্রকৃতি জাগায় প্রাণে বিচ্ছেদের ব্যথা,
করে মোরে জাতিস্মর স্মরায় জননান্তরসৌহৃদের কথা।
তুমি দিব্যধাম লভি ভুলিয়া কি গেলে কবি এই অভাজনে?
তব নানা ভূমিকাতে আমি যে ছিলাম সাথে পড়ে না কি মনে?

যবে তুমি রাজরথে চলিলে আশ্রম-পথে করিতে মৃগয়া,
রোধ করি রথগতি নিরীহমৃগের প্রতি সঞ্চারিনু দয়া।
বসন্তের রূপ ধরি অনঙ্গের তূণ ভরি সাজাইলে ফুলে,
আমি ছিনু অনুচর রক্তাশোক ইন্দীবর আনিলাম তুলে।

অজরূপ ধরি যবে স্বয়ংবর মহোৎসবে গেলে তুমি কবি,
আমি তব ছত্রধারী তাহা কি ভুলিতে পারি সে গৌরব লভি?
রামগিরি-চূড়াশিরে সিক্ত করি আঁখিনীরে প্রাণের আবেগ,
পাঠালে প্রিয়ার তরে কার করে মনে পড়ে? আমি সেই মেঘ

পাঠাইলে যে বারতা তাহার গহন ব্যথা জন্মে জন্মে বই।
হায় তব এই সখা স্বপ্নলোকে সে অলকা খুঁজে পেল কই?
আমার জীবন দলি কত যুগ গেল চলি, খুঁজিতেছি তাই
নয়নে বরষা নামে তুমি নিত্যকল্পধামে, কাহারে শুধাই?

দিলে যে পথের দিশা তাই ধরি দিবা নিশা চলি প্রাণপণে,
এ বিশ্বে সন্ধান বৃথা শাপান্তে মিলেছ মিতা সে প্রিয়ার সনে।
বহিতেছি আমি তবু সে বার্তা ভুলি নি কভু, মোর মুক্তি নাই,
বিশ্বের বিরহিগণে মন্দাক্রান্তা কলস্বনে আজো তা শুনাই।

কবিবন্ধু হর্ষবর্ধন

ধর্মাশোক আদর্শ সম্রাট
তাঁহার উদ্দেশে এই ধর্মভূমে লুটাই ললাট।
কালিদাস-বিরচিত কাব্যে যবে রসাস্বাদ করি
সম্রাট বিক্রমাদিত্যে বারবার ভক্তিভরে স্মরি।
দশশীলে আদিত্যস্বরূপ
ধর্মপ্রাণ বীর কবি ভারতের ভূপ,
ভুলিনি তোমার কথা শীলাদিত্য হে হর্ষবর্ধন,
তোমারেই জানি শুধু আপনার অন্তরঙ্গ জন।
ইতিহাসে তোমা সনে হ'লো যবে সাক্ষাৎ প্রথম
তখন-ত দুজনার একই বয়ঃক্রম।
সেই দিন হ'তে হলে মিতা
জানি না জননান্তরসৌহৃদের ফলে হলো কি তা।
তোমরা তিনটি ভাই বোন
নবতীর্থে পরিণত করি মোর মন
বলভদ্র, বাসুদেব, সুভদ্রার নররূপ ধরি
বিরাজিছ হৃদয়ের শ্রী-মন্দির উদ্ভাসিত করি।
পিতৃশোক, মাতৃশোক, বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত,
এলো ঘোর ভ্রাতৃশোক, ত্রিশোকের ত্রিশূল আঘাত
তোমার তরুণ বক্ষে। পতিহীনা স্নেহের ভগিনী
নিরুদ্দেশে গেল কোথা হইয়া যোগিনী।
মগ্ন করে কান্যকুব্জ, থানেশ্বর শোক-পারাবার
তীরে নীরে নরনারী করে হাহাকার।
কৃষ্ণচন্দ্রাতপতলে শিরে তপ্ত কিরীট ধরিলে
নিরুৎসব পুরে হ'ল অভিষেক অশ্রুর সলিলে।

সাজিল না গজ, বাজী, রথ, পথ, উড়িল না ধ্বজা।
বাজিল না তূরী ভেরী, নৃত্যগীতে মাতিল না প্রজা।
যে দক্ষিণ হস্ত দিয়া রাজপুত্র ভ্রাতৃহত্যা করে
পিতৃরাজ্য গ্রাসিবার তরে,
সে দক্ষিণ হস্ত দিয়া অন্নজল কর নি গ্রহণ
ভ্রাতৃবধ-প্রতিশোধ না করি সাধন।
রাজ্য পেলে, বাহু তা'ত রাজ্যশ্রী কোথায় ?
শত শত চৈত্য মঠে তীর্থপথে খুঁজিলে বৃথায়,
শেষে মত্ত গজরাজ সম
বিমথিলে বিন্ধ্যারণ্য নিজ প্রাণে হইয়া নির্মম।
সেই চিত্রখানি মোর মনে পড়ে মিতা,—
দাউ দাউ জ্বলিতেছে চিতা
আত্মাহুতি দিবে যবে সে ভিক্ষুণী ভগিনী তাহাতে
সহসা ছুটিয়া আসি তারে স্নেহে ধরিলে দুহাতে।
গঙ্গাযমুনার ধারা নিবাইল চিতার অনল
ঝরি চারি চক্ষু হ'তে, মহাতীর্থ হ'ল বিন্ধ্যাচল।
লভিয়া সে ভিক্ষুণীর কাষায় পরশ,
বুদ্ধের করুণা তব মানসেরে করিল সরস,
দ্বিজত্ব লভিলে তুমি নিজত্বের চরম বিকাশে
নবযুগ-সূত্রপাত হ'ল তায় ভারতেতিহাসে।

আর এক চিত্র স্মরি কনৌজের পথে
শোভাযাত্রা চলিয়াছে সুসজ্জিত অশ্বগজরথে
শত শত বাদ্যভাণ্ডে মুখরিত করিয়া নগরী
লক্ষ লক্ষ বৈজয়ন্তে পুরাকাশ বনায়িত করি।
চলিয়াছ সবশেষে নগ্নপদে করিয়া বহন
হিরণ্ময় বুদ্ধমূর্তি। অমাত্য রাজন্য অগণন

চলিয়াছে পাছে পাছে। তুলি জয়ধ্বনি
চলিয়াছে শতশত শ্রমণ-শ্রমণী।

আর এক চিত্র মোর, ধর্মরাজ, কল্পনেত্রে ভাসে।
মহামোক্ষপরিষদে বসাইয়া পাশে
চীনদেশাগত ভক্ত মান্য অতিথিরে,
শুনিতেছ দশশীল ধর্মব্যাখ্যা তুমি নতশিরে।
কোন ধর্মে নাহি তব দ্বেষ
সৌরে শৈবে বিষ্ণুভক্তে বৌদ্ধে জৈনে নাহিক বিশেষ।
সমন্বয় লভে সর্ব মত
তব দ্বন্দ্বাতীত চিত্তে লোকবন্ধু, সর্ব ধর্ম-পথ,
মহাসিন্ধু মাঝে যথা শত নদী-ধারা
হয়ে যায় সবি একাকারা।

প্রয়াগের বিশ্বজিৎ মহাসত্রে সেই চিত্র স্মরি
পঞ্চবর্ষে সঞ্চিত সে রাজকোষ সব শূন্য করি
বিলাইয়া শ্রীঅঙ্গের সর্ব আভরণ
কাষায় চীবরখানি স্নাতদেহে করিছ ধারণ,
ভিক্ষুণী সে ভগিনীর শ্রীহস্ত হইতে ভিক্ষা মাগি,
সুগতে স্মরণ করি নতশিরে, হে রাজবৈরাগী!

ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে মহারথে হে বীর সারথি,
জগতের আদর্শ ভূপতি।
হে রাজভিখারী বন্ধু, হে কবিসম্রাট্,
ভুলে যাই তব রাজ্যপাট।

তব ভারতেরই আমি দীন কবি বিংশ শতাব্দীর
কিছুই জানি না তব মহোদয়-শ্রীর,
জানি শুধু দূর হয় প্রাক্তন কলুষ
স্মরি তব অসামান্য অদ্বিতীয় পাবক পৌরুষ।
ইতিহাসে তুমি মোর মনের মানুষ।

বন্দী শাহ্‌জাহান

কোথা আজি সম্রাট্,
শাহী-সমারোহ ঘটা অহরহ কোথা নওরোজী হাট?
তোমার রচিত শুক্তি-খচিত মীনার স্বর্ণচূড়
করে উপহাস, শোকের বিলাস ব্যথা কি করে তা দূর?
আপন প্রাসাদে বন্দী রহিয়া হেরিতেছ ভাবাকুল।
আপন কীর্তি, তাহা কি তোমার নয়নে হানে না শূল?
কালের রথ কি থামে রাজভয়ে? নিঠুর চক্রতলে
হুজুর মজুর আমির ফকির সবারে পিষিয়া চলে।
রাজার প্রাসাদ দীনের কুটীর সমান দাগাই পায়,
গম্বুজে ব্যথা করে 'গমগম', মাঠে মাঠে 'হায় হায়'।
বাদ্‌শা তাহার বেগম হারায়, কৃষক কৃষাণী তার,
রাজা ও রায়তে আনে একঘাটে বুকফাটা হাহাকার।
গরীব কাঁদিলে গোরের মাটিই তিলে তিলে যায় টুটে,
বাদ্‌শা কাঁদিলে মণিমুক্তাতে তাজখানি গ'ড়ে উঠে।
প্রাণ কাঁদে পথে পথে,
ব্যথার শৈল ঢাকা পড়ে ধন-দৌলতে ইমারতে?

রবীন্দ্র-বরণ

আমাদের এই খেলার ঘরে, গুরু, তোমায় বরণ করি,
কুন্দকলির অঞ্জলি আজ সঁপি তোমার চরণ'পরি।
পূজোপচার পাইনি খুঁজি, গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজি,
তোমার দানেই ডুব্‌ল্ পুঁজি,—অর্ঘ্য-উপাদানের তরী।

প্রজাপতি, তোমার করেই মোদের মানসজীবন গড়া,
মোদের হৃদয়স্পন্দ-দোলা তোমার ছন্দ-পরম্পরা।
তোমার ধ্যানের রশ্মিপাতে, এ চিৎসরোজ ফুট্‌ল প্রাতে
তোমার সৃজন-মূর্ছনাতে মোদের ইহভুবন ভরা॥

নব শ্রীরূপ সঞ্চারিলে জীবলোকের জীবন ভরি,
নূতন ক'রে গড়্‌লে ভুবন পুন মনোলোভন করি'।
কুব্জা হলো অব্জবিভা, অহল্যা তার তুল্‌ল গ্রীবা,
উর্বশীরে মুক্তি দিলে বল্লীজীবন মোচন করি'।

কলির প্রাণে নবীন গন্ধ, অলির গানে ছন্দ নব
মেঘের মুখে মন্দ্র নবীন, অর্পিল আ-নন্দ তব।
অনীরিত অনেক বাণী, অঝঙ্কৃত অনেক গানই
শুনালে মূকজড়ের মুখে, সম্ভবিল অসম্ভব-ও॥

নূতন নূতন দ্বারবাতায়ন খুল্‌লে তুমি গগনগায়ে,
সনাতনী ব্রাহ্মী বাণী আবার শুনি গহন ছায়ে।
মর্মে পেলাম নবশ্রুতি, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি,
নূতন নূতন ইন্দ্রিয়দের ফুটালে এই মনের কায়ে।

অনাদৃত হীন হেয় যা নয়নে তাও লাগ্‌ল ভালো,
জীর্ণ কুঁড়ের ছিদ্রগুলোও ঝর্না হ'য়ে ঢাল্‌লো আলো।
ইন্দ্রধনুর কান্ত রাগে, তোমার তূলীর টান্‌টি জাগে,
তোমার চরণাঙ্ক লভি' তৃণাঙ্কুরও মন্ ভুলালো।

গহন নবরসের তব হ্রদেই অবগাহন লভি'
সান্ত্বনা পাই, সন্তরণে জুড়াই জ্বালার দাহন সবি।
সহন গুণে তাপ-বেদনা, গৃহে রয়েই তপ সাধনা,
বহন করাই আরাধনা শিখালে তা' তাপস কবি।

তোমার জ্ঞানের সিন্ধুবেলায় বালক মোরা বালুই খুঁড়ি,
ফেনিল-কেশর ঊর্মিকুলের সঙ্গে খেলি, কুড়াই নুড়ি।
হাটের বাটের লোকের ভিড়ে মন লাগে না, তোমায় ঘিরে,
কাজের শাসন উড়িয়ে দিয়ে গাই নাচি তাই বাজাই তুড়ি।

চিদ্‌ঘন মাধুর্যে অতুল, তোমার হাতের রাতুল তূলী,
কল্পরমা চুমেন স্নেহে নিত্য তোমার আঙুলগুলি।
বিশ্ববাণী হৃৎকমলে,— বিহার করেন কৌতূহলে,
'ভরত' 'নারদ' করেন প্রেমে তোমার সাথে কোলাকুলি।

আর্ত অভিশপ্ত দেশের ঘুমে আশার মূর্ত স্বপন,
তোমার বাণীর অন্তরালে সুপ্ত মোচন-মন্ত্র গোপন,
সকল পরাজয়ের মাঝে, তোমার বরাভয়টি রাজে,
ক্ষয়ের ভয়ের মরুর তলে জয়ের 'বীচন' করছ বপন।

আজ নিখিলে ওতপ্রোত তোমার মুখের মন্ত্র-বাণী
করছে সাগর-তরঙ্গেরা দিগ্‌বিদিকে কানাকানি।
বার্তা চলে সূর্যে সোমে,— উদ্‌ঘোষিত তূর্যে ব্যোমে,
পুলক জাগে রোমে রোমে ভক্ত ভূলোক যুক্ত-পাণি।

হিমাচলের শুভ্রশিরে উড়ছে তোমার জৈত্র কেতু,
গড়লে অপার পারাবারের এপার-ওপার মৈত্র-সেতু,
দীক্ষা দিয়ে প্রেমের বেদে, ঐক্য দিলে সকল ভেদে
মিলন-ত্রিদিব সৃষ্টি তোমার এই ভারতের মুক্তি-হেতু।

সার্বভৌম, কেবা তোমায় বন্দী করে গণ্ডীমাঝে ?
বিশ্বনরের রথের আগে তোমায় শুভশঙ্খ বাজে।
সিন্ধুকে কে বাঁধ্‌বে বাঁধে ? ইন্দুকে কে ধর্‌বে ফাঁদে ?
অতিমানব-চরিত তোমার বিশ্বাতীত ব্যঞ্জনা যে।

অগ্নিবীণা বাজাও কবি, মহাব্যোমের বজ্রাসনে—
'সুরের আঁগুন' ছড়িয়ে পড়ুক পশ্চিমের ঐ দিগঙ্গনে।
দগ্ধ করুক ঐহিকতার ধূম্র ধূসর বিশাল প্রসার,
ভস্ম হতে জাগাও পুন শাশ্বত সেই সত্যধনে।

রক্ত-জবার শাখার শাখায় ফুটাও স্থলকমলরাজি—
রোপণ কর রণাঙ্গনে শান্তি-রসাঙ্কুরটি আজি।
প্রেমের বৈজয়ন্তীতলে, জুটুক নিখিল মন্ত্রবলে,
অসি কেড়ে ধরাও বাঁশী, ঐকতানে উঠুক বাজি'।

মিলনগুরু, "এই ভারতের মহামানব-সাগরতীরে"—
উচ্চার' হে উচ্চরবে বিশ্ববেদের সূক্তটিরে।
ধর্মজাতি-নির্বিশেষে— মর্মে পশুক্ সর্বদেশে,
বিশ্বভারতীর দেউলে জুট্‌বে নিখিল নম্রশিরে।

কল্পলোকের হে দিবাকর, মোদের মাঝে তোমায় বরি,
ধন্য জীবন পুণ্য কিরণধারার আশিস্ মাথায় ধরি।
কর প্রাণের বন্ধ মোচন,— বিকচ কর অন্ধ লোচন,
প্রণাম করি, সহস্রকর, সহস্রবার প্রণাম করি।

---

*বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা উপলক্ষে রচিত ও পঠিত।

বিবেকানন্দ

এক পারে অনাচার, ব্যভিচার, ক্লীবতা, মূঢ়তা,
ধর্মের দোহাই দিয়া মহাপাপ, খলতা, ক্রূরতা,
শ্মশান-কুক্কুরসম অস্থিখণ্ড লইয়া কোন্দল,
ভেদাভেদ-দ্বন্দ্বদ্বেষে বিদলিত আত্মার মঙ্গল।
অন্যপারে রাজসিক সভ্যতার উদ্ধত হুঙ্কার,
স্রষ্টারেও তুচ্ছ গণে বৈজ্ঞানিক দর্প করি সার,
বিশ্বেরে বঞ্চিত করি', লেলিহান লোল লালসায়,
ইহেরে সর্বস্ব গণি আত্মসুখ-ভোগ শুধু চায়।
মাঝখানে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস বিসর্জিলে, বীর,
গর্জিয়া উঠিলে বজ্রে, নেত্রে তব নির্ঝরের নীর।
এই ভূ-সংসার হায়! এর মাঝে কোথা তব ঘর?
কোথায় জুড়াবে তব সে বিরাট ব্যথিত অন্তর?
দেখিলে দু'দিকে চাহি কোথাও ত নাই তব ঠাঁই,
সর্বত্যাগী হে বৈরাগী, তুমি মুক্ত সন্ন্যাসী কি তাই?

সন্ন্যাসী সাজিলে বটে, রহিলে না পর্বতে কাননে,
বসিলে না ধুনী জ্বালি বটতলে মৃগচর্মাসনে।
লইয়া মমতামুগ্ধ মৃগনেত্র গদ্‌গদ হৃদয়
কোন বনে যাবে তুমি? আত্মমুক্তি তব কাম্য নয়।
চারিদিকে অসহায় আর্ত জীব ডাকে ত্রাহি ত্রাহি,
'জল জল', 'বুক ফাটে', 'প্রাণ যায়,' 'দুটি অন্ন চাহি',
উঠে শুধু হাহাকার কোলাহল, ব্যর্থ আর্তনাদ,
কে শুনিবে? কে শোনাবে কৃপাসিক্ত অভয় সংবাদ?
তাহাদের বক্ষ পিষি বলোদ্ধত চালাইছে রথ,
তব দেশবাসিগণ ঘৃণাভরে ছেড়ে যায় পথ
নাসায় বসন চাপি। ডাকে তোমা নর-নারায়ণ।

ওই জনারণ্যে তুমি তপস্যায় করিলে গমন !
ব্যথার অবধি নাই,—দুঃখ-দৈন্য অনন্ত অপার,
হাহাকার করি চিত্ত খুঁজে কোথা এর প্রতিকার ?
লক্ষ আর্ত শয্যা মাগে, একখানি তোমার কম্বল,
কোথা অর্থ, কোথা পথ্য, কোথা শক্তি, সহায়, সম্বল ?
জনতা দাঁড়ায়ে দেখে স্তব্ধ অশ্রুসিন্ধুর বেলায়,
ভাসিতে লাগিলে একা সে অকূলে প্রেমের ভেলায় ।

গৈরিক-সম্বল যোগী, যত দুঃখ করিতে হরণ
পারনি, সকলি নিজে একে একে করিলে বরণ ।
পুঞ্জীভূত সে বেদনা মৃত্যুসম হইল জীবনে,
প্রাণপণে দিলে ডাক শ্রুতিহীন দেশবাসিগণে ।
টলিল সে আর্তনাদে বিধাতার উদাসী হৃদয়
মুক্তি তোমা দিল তাই,—হে সাধক, মৃত্যু তব নয় ।

জনগণমনোরাজ্যে আজো চলে তোমার সংগ্রাম,
সাধনা কি ব্যর্থ হবে ? পূরিবে না তব মনস্কাম ?
ভূমার সাধনাপথে ব্রহ্মজ্ঞের কোথা পরাজয় ?
তোমার আদর্শ মন্ত্র—শত রূপ করেছে আশ্রয়,
থামিবে না যাত্রাপথে । আগাইয়া আসে সফলতা
মধ্যপথে আলিঙ্গনে তাহাদের মিলিবার কথা ।

সভ্যতার সমারোহ মন্ত্রমুগ্ধ কেশরীর মত
জগদ্ধাত্রী মাতৃশক্তি-পদতলে হবে অবনত ।
আজ যারা মূঢ় দীন তমশ্ছন্ন, পতিত, লাঞ্ছিত,
জয়শ্রী লভিবে তারা মনুষ্যত্বে হইবে মণ্ডিত ।
যে দিন এ ক্লৈব্য, গ্লানি, ভীরুতার হইবে বিলয়,
স্বর্গেরও, ব্রহ্মেরও, জানিব সে তোমারি বিজয় ।

শেকস্‌পীয়ার

আভনের কলকণ্ঠ রাজহংস কবি
হইয়াছি ধন্য তব পাখার শীকরকণা লভি।
এ দেশ করিল জয় শ্রেষ্ঠিবেশে তোমার স্বজাতি
ছলবলকৌশলের ইন্দ্রজাল পাতি'।
রাজ্য গেল, হারালাম বাহ্য স্বাধীনতা,
মনের মুক্তির পথ মুক্ত করি ভুলালে সে ব্যথা।
পাণ্ডিত্যের কূট বুদ্ধি ছিল না তোমার
কল্পতরু, বিতরিলে সর্ব ফল কুসুমসম্ভার,
যা কিছু কল্পনা তব নিঃশেষে করিল আহরণ
মানবের গূঢ় মনোভূমিগর্ভে করি সঞ্চরণ।
চিরন্তন মহোৎসব তব সৃষ্টি রসানন্দময়,
মাতিল তাহাতে কত তরুণ হৃদয়।
জহুরী পণ্ডিত দল এলো তারপর
'নিকষে কষিতে সবি'। তাহাদের প্রখর নখর
তোমার সৃষ্টির গাত্র বিদারিয়া তথ্য নব নব
কত তত্ত্ব, কত ব্যাখ্যা, ছিল নাক যাহা স্বপ্নে তব,
বিদ্যার জাহির করি সব কিছু করিল বাহির ;
ধরিল উৎসবক্ষেত্র মেডিক্যাল ল্যাবরেটরির।
মনের ষ্টুডিও তব করি আবিষ্কার
দেখাইল তারা তব ধার-করা উপাদানভার।
তব নাটশালা
বেত্রপাণি জনার্দন পণ্ডিতের হলো পাঠশালা।
তাহারা চাহিয়াছিল পাণ্ডিত্যের যশ,
বিদ্যার মরুতে হায় উবে গেল সব কাব্যরস।
মানসসন্তান তব রঙ্গমঞ্চে যাদের নেহারি,
তারা বলে,—মূর্তিমান তত্ত্ব ওরা, নয় নরনারী।

কাড়ি নিল প্রস্পেরোর মন্ত্রপূত কুহকের কাঠি,
পরীদের পাখা দিল ছাঁটি,
তব সৃষ্টিমণ্ডলের রূপকথা-স্বপ্নের বলয়
ফুৎকারে উড়ায়ে তারা তব রাজ্য করিল বিজয়।
স্বপ্নভঙ্গে ব্যথা পায় তরুণ হৃদয়।
তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়
তব প্রিমরোজ পথে ছড়াইছে কণ্টক কঙ্কর।
সাহিত্য-আর্ডেন তব হলো হায় তত্ত্বের কন্দর।
হায় কবিকুলচন্দ্র, দিলে সুধা যেই পাত্র ভরি
তরুণতরুণীগণ দুই হাতে সেই পাত্র ধরি
ঔষধ বলিয়া হায় করে পান নিম্বের নির্যাস,
নিবারিতে ক্ষয়ব্যাধি-পরীক্ষার ত্রাস।
কবিকুলচন্দ্র ছিলে, ভাষ্যকার পণ্ডিতসমাজ
বানাইল তোমা 'কবিরাজ'।

রবার্ট ব্রাউনিঙের উদ্দেশে

জন্মিলে ঘটনাঘন যুগে তুমি হে কূটস্থ কবি,
যুগধর্মে জ্ঞানরাজ্যে উলটপালট যবে সবি—
অতীতের মনোরাজ্য বিজ্ঞান করিল আক্রমণ,
নব নব চিন্তাস্রোত টলাইল জাতীয় জীবন।
স্পর্শিল না চিত্ত তব, জানি তারে অনিত্য অসার,
শাশ্বতেরে উপজীব্য করেছিলে কাব্য-সাধনার।

সে-যুগের কবি টেনিসন,
দেশকালাতীত কবি, হে নির্লিপ্ত, তুমি চিরন্তন।
ভুলাতে চাহ নি তুমি শ্রুতিরম বিচিত্র ভঙ্গীতে,
গুরুভারে কর নাই লঘুভার সুলভ সঙ্গীতে।
সুন্দরের উপাসক, সে সুন্দর কোথা না বিরাজে ?
শুধু তারে পূজ নাই রূপে রসে প্রকৃতির মাঝে,
পূজিয়াছ তারে তুমি সত্যে শিবে মহান্ মানুষে,
জড়ে জীবে, নীতিধর্মে, শুভকর্মে, সতীত্বে, পৌরুষে,
সভ্যতার সাধনায়, সেবাত্যাগে, বৈরাগ্যে, সংসারে,
সহস্র অপূর্বরূপে মানুষের আত্মার প্রসারে।
যে প্রেমদেবতা দীপ্ত 'ভস্ম হতে বীরতনু' লভি,
তুমি তারই উপাসক। কুসুমধন্বার নহ কবি।

বিশ্বমানবের কবি, করিয়াছ তারই জয়গান,
আশ্বাস, সান্ত্বনা আশা তারে তুমি করিয়াছ দান।
আশাবাদী ঋষি কবি, মানবের হেরি অপূর্ণতা
হা হুতাশ কর নাই, ব্যথা পেয়ে দাও নাই ব্যথা।
ভাবো নাই মানবেরে ক্রীড়নক নিয়তির হাতে,
করিতে চাহ নি সন্ধি প্রকৃতির প্রবৃত্তির সাথে।
অক্ষমতা অসাফল্য জরামৃত্যু পীড়নের মাঝে
হেরিয়াছ বিধাতার বরাভয়-পাণিটি বিরাজে।
তোমার বিধাতা নয় বিশ্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম উদাসীন,
প্রেমের ঠাকুর তিনি, মানবের প্রেমের অধীন।
জীবন নশ্বর বটে, এ বিশ্বেই নয় তার শেষ,
তার অপূর্ণতা দেয় পূর্ণতারই অমোঘ উদ্দেশ।

সকল তিথির চন্দ্রে খণ্ডবৃত্ত কিসের ব্যঞ্জনা ?
পূর্ণিমারই পূর্ণবৃত্ত তারই কি তা করে না সূচনা ?
মরুর বালুর মাঝে হারাল যে নদী জলধারা
চিরদিন তরে তা কি হ'য়ে গেল শূন্যতায় হারা ?
একটি একটি ক'রে খোলে দল আত্মার কমল,
ক'দিনের এ জীবনে ক'টি খোলে ? সে যে শতদল।
জীবনের অসমাপ্ত ব্রত বলে—'কর কেন খেদ ?
অসমাপ্ত রব না তো, মৃত্যুতে পড়ে না মোর ছেদ।'
ভুলভ্রান্তিগুলি বলে—'আমাদের হবে না শোধন ?
ভুলেরা ভুলই থাকে চিরদিন, হয় কি এমন ?'
সমাধিতে দেহ পচে, পচে না তো জীবনের পাপ,
প্রায়শ্চিত্ত-লোকে তারে পরিশুদ্ধ করে অনুতাপ।
সব ক্ষতি পূরে নাকো, সব ক্ষত নয় নিরাময়
এ জীবনে। প্রতিকার নেই তার ? তাই কভু হয় ?
জীবনের যত দুঃখ গ্রীষ্ম তারা, আনে যে বরষা
দুঃখালয় অশাশ্বত ইহলোকে তাইত ভরসা।
অমঙ্গল জগতের মঙ্গলদীপের শুধু ছায়া,
ছায়াহীন আলোক তো সত্য নয়, অবাস্তব মায়া।
ছায়ালোক-সন্নিপাতে অপরূপ এ সৃষ্টির ছবি,
বৈরী যদি নাই থাকে কেবা হয় বিজয়গৌরবী ?
দুঃখ ক্লেশ আছে তাই আজও আছে মানবহৃদয়,
নতুবা মানুষ আজও পশুবৎ রহিত নিশ্চয়।
আশাবাদী ওগো ঋষি-কবি,
ধন্য মোরা তব কাব্যে চিরন্তনী এই বাণী লভি।

টেনিসনের প্রতি

কলেজের ছাত্র আমি, বয়স তখন খুবই কম,
মিতালি তোমার সাথে হইল প্রথম।
তুমি মোর মুকুলিত যৌবনের মিতা,
মুহ্যমান করেছিল রসাবেশে তোমার কবিতা।
তব গ্রন্থাবলী হাতে কত রাত্রিদিন
যাপিয়াছি আনন্দের হ্রদে যেন মীন।
বুঝিতে তোমার কাব্য খুঁজি নাই টীকা বা টিপ্পনী,
বিনা দাঁড়ে বিনা পালে ছুটেছিল মনের তরণী
তব সুরনদীনীরে কোথা কোন্ নিরুদ্দেশ পানে
সিন্ধুর কল্লোলময় সঙ্গীতের টানে।
যাহা কিছু বুঝি নাই, আমার কল্পনা
পূরণ করিত তাহা। নৃত্যলোল ছন্দের মূর্ছনা
অর্থাতীত অর্থ চিত্তে করিত সঞ্চার,
একই লেখা পড়িতাম তাই বার বার,
ঘষিতে ঘষিতে দারুচন্দনের সম
মোদিত করিত শুচিগন্ধে চিত্তে মম।
মূর্তিমতী রূপে তব কুহকিনী বাণী
নিয়ে যেত চিত্তে মোর দিয়ে হাতসানি
পরী-রাজ্যে, স্বপ্নলোকে উদ্ভাসিত মণির প্রদীপে,
কান্তারে লক্‌স্লি হলে, এনোকের জনহীন দ্বীপে,
নিয়ে যেত মধ্যযুগে নাইটেরা যুঝিত যখন,
ইউলিসিসের সাথে সাইরেন করিতে শ্রবণ।
তোমার দেশের রাই-যবে ভরা মাঠ,
বাসন্ত উৎসব মেলা, হিমানীতে ভরা পথঘাট,

বহু উৎসময়ী 'ইদা', গিরিনদী, নাটিঙের ঝোপ,
দরিদ্র কুটীরে পোষা কপোতের খোপ,
'মডের' উদ্যান, রাজা আর্থারের টেবিল বর্তুল,
মুখর সে ওকতরু, পদ্মভোজীদের উপকূল,
ভগ্ন দুর্গ, জীর্ণ মঠ, শস্ত্রে অস্ত্রে সুসজ্জিত হল,
সিন্ধুতীরে মেলা জাল, জলে-চলা ময়দার কল,
সবই যেন দেশকাল সীমারেখা করিয়া লঙ্ঘন,
হলো মোর অন্তরঙ্গ একান্ত আপন।
সব চিত্র প্রাণবন্ত হলো মোর মনে,
কত রাত্রি তাহাদেরে দেখেছি স্বপনে !

যে যুগের কবি তুমি এ দেশে সে যুগ সবে শুরু,
তাই তুমি হ'লে মোর গুরু।
শুনি নাকি তব দেশে নাই আর তোমার আদর,
এ কথা শুনিয়া মোর চিত্ত হয় ব্যথায় কাতর।
লরেন্স, পাউণ্ড আর স্পেণ্ডারের যুগে, মনে মনে
তরুণেরা হাসে, মোরে করুণার পাত্র বলি গণে।
পাইয়াছি কাব্যে তব নিত্য নব আনন্দের স্বাদ,
সহজে আনন্দ পাওয়া তাই নাকি বড় অপরাধ !
অবাক হইয়া স্মরি গুরুদেবে ঊর্ধ্বপানে চাই,
কোথা মোর ভুল হয় খুঁজিয়া না পাই।

হে যুগবল্লভ কবি, যুগন্ধর, হে রসপ্রমাতা
সর্ব সমস্যার তুমি ছিলে যে ব্যাখ্যাতা।
তাই বলি যুগাশ্রয়ী তোমার বারতা
হারায় নি আবেদনে বিশ্বজনীনতা।

হে কবি-বসন্ত, তব নিশ্বাসের বায়ু সুরভিত
মানবজীবনারণ্যে প্রতি শাখা করিল পুষ্পিত।
কাব্য নয় চিন্তাপুঞ্জ, কাব্য নয় আবেগ-উচ্ছ্বাস,
কাব্য চারু রসকলা।—তুমি তাই করিতে বিশ্বাস
জানিতে নগণ্য নয় কানে-প্রাণে গভীর সংযোগ,
গুম্ফনের পারিপাট্য পরিচ্ছন্ন বচনপ্রয়োগ।
বাণী-সুর পরিণয়ে তুমি প্রজাপতি,
তোমার উদ্দেশে কবি জানাই প্রণতি।

অস্বচ্ছ আবিলতায় রহস্যের মায়া সৃষ্টি করি
প্রবঞ্চিত কর নাই, এই কথা কেমনে পাশরি ?
কবিতার তত্ত্ব তথ্য যুগান্তরে হয় পুরাতন,
তার উপজীব্যে করে মূল্যহীন যুগবিবর্তন।
রসসরস্বতী ধরে যুগে যুগে নব বেশান্তর,
এক দেশ চিনে তারে হয়তো চিনে না দেশান্তর।
রসসুধা যে পাত্রেই যে আধারে করুক বিরাজ
করে কি উপেক্ষা তারে রসিকসমাজ ?
তব কাব্যে রসধারা তব যুগে পরিতৃপ্ত করি
দেশকালপাত্রসীমা উদ্বেলিয়া গিয়াছে উত্তরি।
কোন্ দেশ, কোন্ কাল, কোন্ পাত্র দেখিবে মাপিয়া
তারে নিজ মনগড়া মানদণ্ড দিয়া ?
তব সৃষ্টি উপাদান সে তো শুধু বৃন্ত আর দল,
গভীরে লভিবে অলি মধুপরিমল।

শেলীর প্রতি

মহাসিন্ধু ছাড়া কেবা তোমার সে বিরাট আত্মারে
বহিতে সহিতে বক্ষে ধরিতে বা পারে ?
বিলীন হইল তব আত্মা তাই শেষে তারই মাঝে
সে আত্মার মর্মবাণী ঊর্মির দুন্দুভিনাদে বাজে,
প্রতিহত তটে তটে দেশে দেশে দূরে, বহুদূরে—
নবনব রূপ ধরে নবনব সঙ্গীতের সুরে।
বাহিত হয় সে ধ্বনি অতলের শঙ্খের কুহরে
ধ্মাত তাহা বিশ্বে ঘরে ঘরে।
নিয়ে গেল তব সৃষ্টি নেপচুন বৈজয়ন্ত রথে
যুগে যুগে দেশে দেশে অনন্তের পথে।
ডুবিল তোমার পোত ; ডুবিবে না সৃষ্টি কোন কালে
মহাকাল-পারাবারে ভাসিবে তা, ঝঞ্ঝারও কোটালে।
বহ্নিঘন দেহ তব ঊর্মিকুল উৎক্ষেপিল কূলে,
সে বহ্নি নিভে নি জলে, বন্ধুরাও যায় নাই ভুলে।
যোগাইতে পারে কি তা সমাধির কীটের আহার ?
খুঁজে নাই তাই শবাধার।
বহ্নিতে অর্পিল তাহা সুরাসিক্ত হইল আহুতি,
বৈশ্বানর হতে তার বিশ্বনরে বিকীর্ণ বিভূতি।
সুন্দরের হে পূজারী, অসুন্দর অসহ্য তোমার,
পাছে, আধি জরা ব্যাধি করে অধিকার,
নিবেদিলে সে শঙ্কায় পূর্ণ দীপ্ত যৌবন সম্ভার
অনন্ত-যৌবন সিন্ধু আর বৈশ্বানরে উপহার।

কবি কীট্‌সের প্রতি

মাতা দিল বক্ষে তব কাল যক্ষ্মাবিষ
　　পিতা দিল দারিদ্র্য চরম।
শেলী দিল পাশে ঠাঁই, দিল শুভাশিস,
　　হাণ্ট দিল বন্ধুত্ব পরম।
হৃদয় সঁপিল ফ্যানি তব শীর্ণ হাতে,
　　চ্যাপম্যান হোমারের স্বাদ।
জোসেফ সেভার্ন দিল সেবা দুঃখরাতে,
　　ল্যাম্ব তোমা দিল সাধুবাদ।
স্বদেশ তোমারে দিল ব্যথা অনাদরে
　　লকহার্ট তীক্ষ্ণশর হানি।
জ্ঞানের সম্পদ দিল গ্রীস অকাতরে,
　　রোম দিল শেষ শয্যাখানি।
বিধাতা তোমারে দিল অতুল অজেয়
　　কবিশক্তি অসামান্যতম,
সেই সঙ্গে দিল স্বল্প আয়ুর পাথেয়
　　শরদভ্রে ইন্দ্রধনু সম।
প্রকৃতি তোমারে দিল তৃতীয় নয়ান
　　সত্যশিব সুন্দরে হেরিতে।
অসীম যাত্রায় কাল দিল তোমা স্থান
　　সনাতন সোনার তরীতে।
আমি বাঙ্গালার কবি দীন খ্যাতিহীন
　　তবু আমি সগোত্র তোমার,
কৃতজ্ঞ বিনত শিরে স্মরি তব ঋণ
　　প্রণিপাত দিনু লক্ষ বার।

গোপাল ভাঁড়

একদিকে ছিল তর্কে ষণ্ডা
পণ্ডিতদের বাদবিতণ্ডা ধ'রে কোন ছল ছুতো,
আর দিকে ছিল রঘু ভোঁসলার
লঘু করিবারে চৌথের ভার আলিবর্দির গুঁতো।

তার মাঝে পড়ি হায়রে রন্ধ্র-
গত শনি সেই কৃষ্ণচন্দ্র খেত যবে হিমসিম,
তুমিই গোপাল রসের ভাষ্যে
ভূপালের মুখ ভরিতে হাস্যে মধু হ'ত তা যা নিম।

জানিতে বিশ্বে তুরঙ্গাণ্ড,
অন্তরে ছিল রসের ভাণ্ড তাই তোমা বলে ভাঁড়।
পাঁকের মধ্যে তুমি যে পাঁকাল,
গোপাল তুমি যে হইলে রাখাল চরাইয়া যত ষাঁড়।

ফুটাইতে হাসি সব বিষমুখে
'ঝুটা সব হ্যায়' জানি কৌতুকে, ভুলে যেতে সব জ্বালা।
জমিয়া উঠিলে তোমার আসর
বন্ধ করিত কবিগুণাকর মালিনীমাসীর পালা।

ভঙ্গ এখন তোমার বঙ্গ
ভুলেছে রসিক সহিত রঙ্গ, রহিত হাসির প্রথা।
আছেন ত কত হোমরা চোমরা
দেখি তাঁহাদের বদন গোমড়া স্মরি যে তোমার কথা।

এণ্টোনি সাহেব

(কবির গান)

যারা সব—লুটল মোদের ধন,
তাদেরি—সঙ্গে এসে রঙ্গরসে লুটলে মোদের মন।
দরিয়ায়—যে হারমাদের দস্যুতাতে
বড় ভয়—ফ্যাসাদ ছিল যাতায়াতে
তুমি না—তাদের জাতের তাদের সাথের ফিরিঙ্গি একজন ?
গুটিয়ে—পোতের ধ্বজা ক্রুশের ধ্বজা
এসে এ—বাংলাদেশে লুটলে মজা
জানাচ্ছি—পাগলগোরা বগলবাজা তোমায় আলিঙ্গন।
এদেশের—হাটে নিমক বেচতে এসে
ছেড়ে তা—ব্যব্সা মধু-র ধরলে শেষে,
ত্বুবেলা—হ'তো তাতে পান্তাভাতে নিমক-ও-ব্যঞ্জন।
প'রে ভাই—মোদের মতো ধুতি জামা-ই
হলে যে—ঠাকুরো সিঙের বাপের জামাই,
শেষে ঐ—ময়রা ভোলার খোঁচায় রসের ছুটল প্রস্রবণ।
শ্রীমতী—সৌদামিনীর চরণ-চারণ
চাটুকার—চক্রবর্তী অধমতারণ,
অশুচি—ম্লেচ্ছ ছিলে উচ্চকুলের বনিলে ব্রাহ্মণ।
আলেকম—সেলাম তোমায় কবির নবাব
এদেশে—এখন আসল কবির অভাব,
কে দেবে—মুখের মতন উচিত জবাব ? তাইত আস্ফালন।
তোমারে—আজ যদি ভাই সঙ্গে পেতাম
তাহলে—চালিয়ে দিতাম গিজতাগিজাম
গোয়াতে—পাঁচশো ঢোলের পাঁচশো কাঁসির খেউড় আক্রমণ

শ্লেষের সুরে

(১)

সব শুঁয়োপোকা এবে প্রজাপতি, সব মধুকর বোলতা,
প্রজাপতিগণ সব মধু, লুটে পেয়ে ফুলবাগ খোলতা।
বোলতা বাগানে পায়নাক মধু, বোলতারে কেবা পুষছে ?
পেটের দায়ে সে ময়রাদোকানে মুড়কির গুড় শুষছে।

(প্রজাপতি ও বোলতা)

(২)

বাজারে গিয়ে কি দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে দেখনি ওজন,
ভারী যাতে নীচে নামে হাল্কা করে উপরে গমন !
সকল বাজারে লঘু উচ্চে উঠে, গুরু নামে নীচে,
ছনিয়ার এই রীতি চিরদিন, খেদ করা মিছে।
সবচেয়ে বেশি চলে যত মেকি এই ছনিয়াতে,
মেকি টাকা একদিনে ঘুরে ফিরে দশবিশ হাতে।
আসল টাকারে করি সকলেই বাক্স মাঝে বন্দী
মেকি আগে চালাবার সব ক্ষেত্রে ক'রে থাকে ফন্দী।

(মেকি ও হাল্কা)

(৩)

অঙ্গে ধরি তব নামাবলী
তব মন্ত্র জপ করে বঙ্গভূমি হয়ে কৃতাঞ্জলি।
স্মৃতিতর্পণের নামে করি সবে তর্জন গর্জন
জপে তার বিঘ্ন শুধু ঘটাইছে অতিভক্তগণ।
তব জন্মদিনে মোরা তব গ্রন্থে করি রসাস্বাদ,
লাউড স্পীকারে তারা ঘটাইছে প্রত্যহ প্রমাদ।

(রবীন্দ্র-জয়ন্তী)

(৪)

ঢেঁকি গেল, জাঁতা গেল, গেল ছুনী কোদাল লাঙল,
হ'রে নিল কল এসে সকল সম্বল।
এটা হ'ল কলি-যুগ এবে মোরা কলীর কিঙ্কর,
কলকব্জা মিস্ত্রীদের করুণায় একান্ত-নির্ভর।
আয়ু বায়ু অন্ন জল সবই আজ কলহস্তগত,
কর দিয়া কড়ি দিয়া রই তাই ভিখারীর মত।
আইনের বেড়াকলে তা ছাড়া আবদ্ধ দিন দিন।
আমরা স্বাধীন নামে, বেড়াজালে ঘেরা যেন মীন। (কলিযুগ)

(৫)

পরগৃহে ছিলি তুই, ভীত ক্ষুব্ধ, শাসন-সংযত
শীর্ণ, কিন্তু ছিলি সুস্থকায়।
নিজ গৃহে ফিরেছিস্, একি দশা, সর্ব অঙ্গে ক্ষত
ভনভন করে মাছি তায়। (স্বগৃহে)

(৬)

সাহিত্যরচনা শুধু সখ নয়, কর্ম জানি তাও।
তোমরা এ কর্মফল ভোগ কর, হাতে হাতে পাও।
আমরা এ কর্মফল করি সদা ব্রহ্মে সমর্পণ
স্মরণ করিয়া বাসুদেবের বচন।
তোমরা বলিবে ইহা 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ!'
জাননাতো বেদান্তের তত্ত্ব গুহ্যতম।
অনলে অনিলে কীটে মূষিকে মানবে,
ব্রহ্ম কোথা নেই এই ব্রহ্মময় ভবে?

(কথাসাহিত্য ও কবিতা)

(৭)

এ দেশ ছেড়ে গেলেন ভগবান,
দু'হাত তুলে তাই নাচে শয়তান।

চ'লে গেল পরলোকের ভয়
রইল শুধু বড়লোকের ভয়।
রইল কারাদণ্ড হাজত ফাইন
পুলিশ আদালতের হাতে আইন।
পোষক, শোষক রৈল ওকালৎ,
আইন ফাঁকি দেওয়ার শতেক পথ

(ভগবানের বিদায়ে)

(৮)

আকাশবিহারী চিল,
নিয়ে তোমার মাছের রাজ্য বিল।
সে মাছ তোমার চাই,
ধরিতে পার না, জেলের মাথার উপরে উড়িছ তাই।
দিনের তুপরে জেলে মাছ ধরে, ছোঁ দিয়ে তাহাই কাড়ো,
দেশের মাঝারে দেখিতেছি তোমা কত নানা রূপে আরো।
যত দইমারা নেপো আছে সারা দেশে
অভিনন্দন দেয় তোমাদের ঘটা ক'রে অবশেষে।

(চিল)

(৯)

হৃদয় স্বীকার করে, বুদ্ধি তারে করে সমর্থন,
মুখ বলে দলধর্ম ছাড়িব না উহার মায়াতে,
সরল গুণজ্ঞ চাহে যুক্তিতে তা করিতে খণ্ডন
ছল ক'রে যে ঘুমায় তারে হায় কে পারে জাগাতে ?
যাহা কিছু পুরাতন নিন্দনীয় তাই,—দল বলে,
দল শিখায়েছে ছল অসরল করেছে সরলে।

(দল ও ছল)

গানের সুরে

ভারতলক্ষ্মী

(মালিনী ছন্দে)

জয় জয় অয়ি মাতঃ, ভারতাদৃষ্ট-লক্ষ্মী।
নমি সুরনরবন্দ্যা নন্দিতা কল্পকুঞ্জে।
ঋষিমুনিগণনম্যা অর্চিতা অর্ঘ্যপুঞ্জে।
শুভ বর তব হস্তে দৃষ্টিতে দুগ্ধকুল্যা।
চরণ-নলিন-গন্ধে মুগ্ধ এ চিত্তমক্ষী॥

সুতগণ তব অঙ্কে তুষ্ট মা স্তন্য-অন্নে।
জনগণ ফলশস্যে পুষ্ট মা শিল্পপণ্যে।
কবিকুল-রবিগর্বে ভাস্বরী বিশ্বপূজ্যা।
নহ তুমি অসহায়া, চৌদিকে দক্ষ রক্ষী॥

শতশত মঠ-চৈত্যে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা।
রসবিগলিত চিত্তে ভারতী মুক্তকণ্ঠা।
কমলকুমুদমল্লীমালিকা দিব্য বক্ষে।
মুখরিত তরুবল্লী বন্দিছে লক্ষ পক্ষী॥

গ্রাম থেকে বিদায়

গাঁয়ের কাছে বিদায় নিতে ঘটল বড় দায়।
কাজল দীঘি কমল চোখে করুণ চাওয়া চায়।
বটতলাতে এলাম যবে হাজার পাখী কলরবে
বারণ করে, তাড়ন করে, কারণ কি শুধায়॥

শিউলি ফুলের গন্ধ বলে,—'যাত্রাতো নেই আজ,
নবান্ন কাল, বড় হলো অন্য সে কোন কাজ?
শিশিরে পথ পিছল করে শিয়ালকাঁটা আঁচল ধরে,
আ'লপথেরা ধানের শীষে জড়িয়ে ধরে পায়॥

ফুলের সদ্‌গতি

ফুল যে এত শুচি কোমল সুরভিসুন্দর,
ভাব্‌ল মানুষ, হবে ফুলের নতুন মধুকর।
মাথায় রাখে গালে বুলায়
মালায় গেঁথে গলায় দুলায়,
ভোগ্য ক'রে হয় কি ফুলের যোগ্য সমাদর ?

দেব্‌তারে তার পড়ল মনে, রূপ ছিল না তাঁর,
মূর্তি মাঝে হলেন সাকার ছিলেন নিরাকার।
গড়ি দেউল, সিংহাসনে
ফুল স'পিলে তাঁর চরণে,
শান্ত হ'লো দেবমানবের অশান্ত অন্তর।

স্বর্ণ হংস

সোনার মরাল এসেছিল একদা মোর আঙিনাতে,
মৃণাল-কন্দ তুলে এনে খেতে দিতাম কমলপাতে।
সে হাঁস হয়ে স্বর্ণখনি ভেবেছিলাম করবে ধনী,
সেবেছিলাম মালঞ্চে মোর আদর ক'রে আপন হাতে ॥

একটি ক'রে সোনার পালখ খসিয়ে নিতি দিত মোরে,
খাঁটি সোনাই বল্‌ত সবাই, রেখেছিলাম ঝাঁপি ভ'রে।
গর্বভরে সবেরি দাম খর্ব করে দেখেছিলাম,
ভেবেছিলাম চিতার 'পরে মঠ গড়াটা হবে তাতে ॥

সোনার মরাল উড়ে গেল কল্পলোকের অবসানে,
সোনার পালখ হাঁসের সাদা পালখ হয়ে শল্য হানে।
রেখে দিলাম মনের খেদে তুচ্ছ পালখ গুচ্ছ বেঁধে
তুলে দিও তোমরা এসব চিতায় আমার শবের সাথে ॥

হৈমন্তী ঊষা

ঊষা; তোমার আনন কেন শিশির-ছলছল' ?
জাগরণের অরুণরাগে নয়ন জ্বল জ্বল' ?
মুখে তোমার নেইক ভাষা মিটে নি বোন কোন্ পিপাসা ?
আমি তোমার দরদী সই আমায় বল' বল'।

বাসক-শয়ন সাজায়ে কি কুঞ্জবনে জাগি
শিউলি ফুলের মাল্য গেঁথে ছিলে বঁধুর লাগি ?
জ্বালি চাঁদের সুধায় বাতি কাটালে কি দীর্ঘ রাতি
উচ্চকিত কর্ণে বহি হৃদয় টলমল' ?

চপল বঁধু এলোনা হায় বিফল হ'ল নিশা,
ছিঁড়লে তনুর সকল ভূষা রইল বুকের তৃষা।
মধুপর্ক ফেললে ছুঁড়ে, তাই কি অত মধুপ ঘুরে ?
সেই ব্যথা কি সায়রে নীলকমল ঢলঢল' ?

হাঁক দিয়ে কাক, হান্‌ছে বুঝি বঁধুরে ধিক্কার,
হিমেল বায়ু জানায় ব্যথা তোমার প্রতীক্ষার।
উদাস নিরাভরণ রূপে উদিলে আজ চুপে চুপে,
তোমার ক্ষোভের ভৈরবী কি নদীর কলকল' ?

শেষ কথা

বহু কথা সখি বলিতে যে বাকী হয়নি বলা
কণ্ঠের বাণী হ'লো শুধু রাশি ফেনোচ্ছলা।
ভূমিকাটা তাও হ'ল নাক' সারা
পূর্বগগনে জ্বলে শুকতারা,
বচনে শুধুই রচনা করিনু কাব্যকলা ॥

গেল রাত কাটি আসল কথাটি হ'ল না বলা,
লইতে বিদায় ভারী হয়ে হায় আসে যে গলা।
জানি চাওনিক' বচন-মাধুরী,
বৃথাই করিনু রচনাচাতুরী,
ঘুমঘোরে সখি শুনিলে তাহা কি? সবি বিফলা?

বহু কথা সখি রয়ে গেল বাকি হ'লো না বলা।
ছেড়ে যেতে হবে হৃদয়ে বিঁধিছে বিষের ফলা।
ব'লে ফেলি তবে আসল কথাটি
ভেজাল নেইক' একেবারে খাঁটি;
'ভালবাসি তোমা এ ভালবাসায় নেইক' ছলা।'

দায় পড়েছে

গোপনে তুই করলি পিরীত, জানলি না তার কি শীল, কি রীত
আ ম'রে যাই বলতে হবে? দায় পড়েছে।
গেলি যে চোরকাঁটার বনে, বিঁধল কাঁটা তোর বসনে,
একএক ক'রে তুলতে হবে? দায় পড়েছে।

কাঁদিস্ আবার কচি খুকী লজ্জা হয় না অনামুখী,
তোর সাথে কি কাঁদতে হবে? দায় পড়েছে।
দেখি না হয় খুঁজে পেতে কোথায় গেল আঁধার রেতে,
তার পায়ে কি সাধতে হবে? দায় পড়েছে।

খুঁজে পেলে রাখাল চোরে আন্‌ব আমি নাকাল ক'রে
মিষ্টি কথা কইতে হবে? দায় পড়েছে।
না চেয়ে সে বঁধুর পানে আবার যদি বসিস্ মানে,
তাও কি মোদের সইতে হবে? দায় পড়েছে।

দিনে ও রাতে

আমি—দিনের মরু পার হ'য়ে যাই কিসের আশে আশে ?
রাতে—চিকুর ছায়ায় পড়তে বাঁধা কনক-লতার পাশে ;
ধূলায় মলায় ক্লিন্ন স্বেদে সারাদিনের দুঃখ খেদে,
ধৌত করে' ফেল্‌ব বলে' প্রেমের কলোল্লাসে।

দিনের—তাতের প্রহর জুড়ায় আমার রাতের মধু যামে,
প্রিয়ে—শ্রমের শিরে তোমার প্রেমের শান্তিধারা নামে।
বঞ্চনা ভুল দিবসভরা লাঞ্ছনা, লাজ, তপ্ত ত্বরা,
সবই উড়ে যায় যে দূরে সুরভি নিশ্বাসে।

রাতে—তোমার পরশ নতুন রসে প্রাণ না দিলে ভ'রে
খর—দিনের তাড়ন আলোর পীড়ন সই বা কেমন করে' ?
নিশার প্রবোধ পুরস্কারে শ্রমোৎসাহ উষায় বাড়ে,
রাতের চুমাই অধীর প্রাণের সকল ব্যাধি নাশে॥

যত—অরসিকের কোলাহলে এ কান ঝালাপালা,
রাতে—তোমার বাণীর সুধায় জুড়ায় তাহার ক্ষুধার জ্বালা।
দন্তরুচির আশায় আশায়, শ্রান্তি সহি রৌদ্রতৃষায়,
দিনের দাহন সহি মোহে গাহন অভিলাষে।

গোকুলের ডাক

গোকুল, তোমার বকুলতলা আজকে আমার মন টানে,
সংসারের এই কংসপুরী ছেড়ে যেতে বন পানে।
কর্ম হেথা ঘর্ম ঝরায় আর্ত করে মর্মপীড়ায়,
দশের যশের ফাঁস কাটিয়ে ছুটব রসের সন্ধানে।

রাত পোহালে এই সুমতি হয়তো আমার থাকবে না,
উদাস ক'রে বাঁশীর স্বরে কালতো কেউ আর ডাকবে না।
একটি ক্ষণের এই কামনা মুখে বহি মধুর কণা
ভ্রমর হয়ে কুঞ্জে তোমার অমর হয়ে থাক গানে॥

বিভূষিতা

একি রূপে প্রিয়ে দেখা দিলে নিয়ে ব্যবধান-সম্ভার,
সর্ব অঙ্গে ঝঙ্কার তোলে সোনালী অহঙ্কার।
পাড়ের ভ্রূকুটিভঙ্গে শাসন করিতেছে বারাণসিয়া বসন
হাঁকে যেন আজ ভাঙে নাক' ভাঁজ দেখিও খবরদার।

সজারু কাঁটার মতো বেশভূষা উদ্ধত হয়ে জাগে।
এড়ায়ে চলে সে মলিন দৃষ্টি পাছে মালিন্য লাগে॥
অধর কুপিত এত কি কারণ? পরশ করিতে করে সে বারণ,
যেন বড় ভয় শিথিল না হয় আঁটা কবরীর ভার।

সহসা সারিকা হয়ে ময়ূরিকা কেন দিলে আজ দেখা?
শুনিতে পাব না কণ্ঠে কাকলী? শুনিতে হবে কি কেকা?
ক্ষমা করো দেবি যদি অপরাধ হয়ে থাকে, ঘ'টে থাকে বা প্রমাদ,
দূর হতে তবে আজিকে নীরবে জানাই নমস্কার॥

এই ধরণীর পারে

এ লোক ছাড়ি যখন পাড়ি দেব লোকান্তরে,
আমার সবই রেখে যাব এই ধরণীর 'পরে।
দৃষ্টি আমার তারায় তারায়, অশ্রু, বৃষ্টিধারায় ধারায়
রেখে যাব হাস্য আমার শরৎ সরোবরে॥

গীতি আমার রেখে যাব নদীর কলস্বনে,
ভাষণ আমার শুনতে পাবে কূজনে গুঞ্জনে।
আষাঢ় মাসে মাটি ফুঁড়ে জাগবে আশা তৃণাঙ্কুরে,
স্মৃতি জেগে জ্বলবে মেঘে বিজলী অক্ষরে ॥

তমাল

তমাল তরু, তোমায় আমি প্রণাম করি
তুমি আছ আঁধার এ মোর জীবন ভরি'।
আঁধার বটে তমালশাখা, ময়ূর সেথায় মেলে পাখা,
চন্দ্রতারায় সে যে ভরায় মোর জীবনের বিভাবরী ॥

কুসুমসম ফুটে তাতে আমার মনের এই পিপাসা,
তমালবনে বংশী-করে করেন যিনি যাওয়া-আসা—
একদা কি এই জীবনে তাঁর মুরলী শুভক্ষণে
বাজবেনাক' সেই আঁধারে মন-রাধারে পাগল করি' ?

রসজ্ঞের উদ্দেশে

কবির বাণী গভীর হবে তোমার প্রাণে,
আনলে টেনে বাইরে যারে প্রেমের টানে।
গাহন তাতে করবে যত হবে সে রস গহন তত,
সবাই পাবে তোমার ভাবে নতুন মানে।

ছন্দোবাণীর রন্ধ্র মাঝে সংগোপনে
যা আছে সব পড়বে ধরা তোমার মনে।
দোঁহার প্রাণের দরদ যোগে সবই সবার লাগবে ভোগে,
মূর্ছনাতে মূর্তি পাবে ঐকতানে।

তরল সবি হবে গাঢ় স্পর্শে তব,
সরল যা তা হবে গূঢ় হর্ষে তব ।
ফাঁক যদি পাও গ্রন্থনাতে ভরবে সেথা ব্যঞ্জনাতে,
সারবে সুরে বাণীর ত্রুটি আমার গানে ॥

আমার লেখা

অনেক লেখাই ক্ষণিকজীবী সোনালী পতঙ্গ ।
আমার লেখা গঙ্গা ফড়িঙ্, সবুজ তাহার অঙ্গ
বাংলা মায়ের বর্ণ ক'রে চুরি
লতাপাতায় বেড়ায় উড়ি ঘুরি,
সহজে তায় পায় না ঢুঁড়ি শিকারী বিহঙ্গ ॥
লুকিয়ে রয় রঙ মিলায়ে সবুজ পাতার অঙ্গে,
মিতালি তার কুঞ্জলতার মঞ্জরীদের সঙ্গে ।
নগরপথে যায় না সে ত' উড়ে,
প্রখর আলোয় মরতে জ্বলে পুড়ে,
শেষের শয়ন দূর্বাবতীর মখ্‌মলী উৎসঙ্গ ॥



বাংলা সাহিত্যের খান কতক সেরা বই

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে
বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ
কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা
কবিতার প্রথম পর্যায়
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা ১ম খণ্ড
বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা ২য় খণ্ড
স্বপ্ন ও সত্য
গোপাল হালদার

বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস
বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

কাব্যশ্রী
কাব্যালোক
ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

রবি-পরিক্রমা
কাব্য-সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন
শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা
শ্রীঅশোক সেন

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ